পরলোকের কথা

১৭৩৩

Librarian
Krishna Public Library

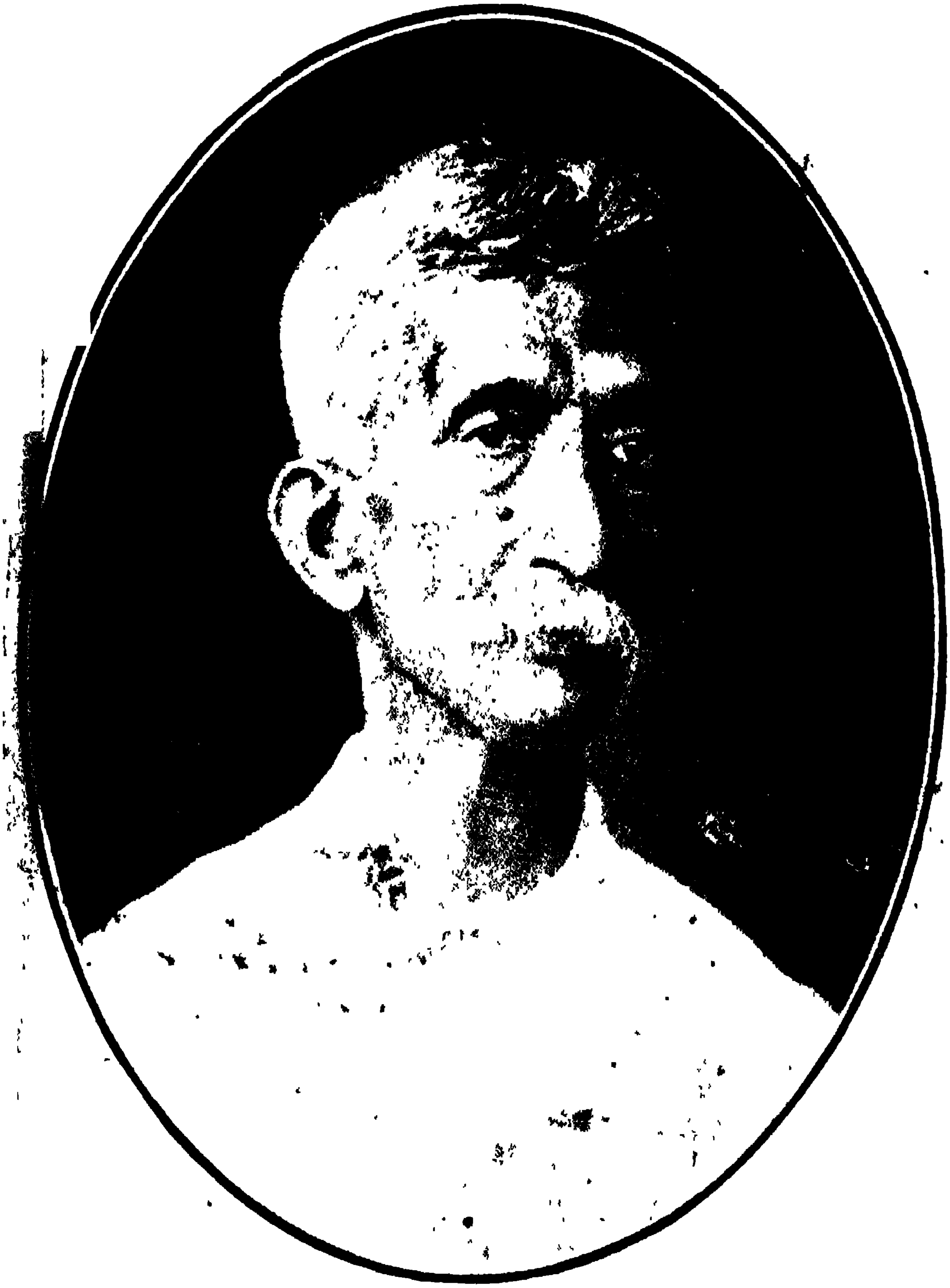

মৃণালকান্তি ঘোষ

জন্ম—৩০শে কার্ত্তিক ১২৬৭ সাল

গোলাপলাল ঘোষ

৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

১২ই আশ্বিন ১৩৩৯ সাল (ইং ২৮।৯।৩২)

অভিমত

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রণীত "পরলোকের কথা" মি যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছি। ইহলোক-সর্ব্বস্ব জড়বাদী আত্মার স্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মতে চৈতন্য মস্তিষ্কের স্পন্দন ; স্থূলদেহের বিনাশের সঙ্গেই সমস্ত ফুরাইয়া যায়। অতএব বাদীর কাছে survival of man—জীবের অমরত্ব ও অক্ষরত্ব জ কথা মাত্র। এই মত যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের দৃষ্টিতে ন্ত, শুধু তাই নহে,—এই মতের পোষণ করিলে আমাদের নৈতিক তুও শ্লথ হইয়া যায়।

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

মৃণালবাবুর লিখিত "পরলোকের কথা" যাঁহারা নিবিষ্ট মনে ঠ করিবেন, আমার বিশ্বাস তাঁহাদের জড়বাদ রক্ষা করা কঠিন ইবে। কারণ, গ্রন্থকার তাঁহাদে[illegible] বি[illegible]ত ঘোষ-পরিবারের মধ্যে [illegible] সকল প্রেত-তাত্ত্বিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এবং যাহার ধিকাংশ ব্যাপার তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এ গ্রন্থে তাহার ারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম যশোহরে তারপর লিকাতায় কিরূপে আধ্যাত্মিক চর্চ্চার সূচনা ও প্রচার হয়, এ গ্রন্থে তাহারও বেশ সুপাঠ্য বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে। অনেকে য়ত জানেন না ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকজন প্রখ্যাত প্রেত-তাত্ত্বিক (যথা, এগলিণ্টন, ডাক্তার পিবল্‌স্ প্রভৃতি) এই কলিকাতায় আগমন করিয়া কয়েকটী অদ্ভুত ঘটনা দেখাইয়া ছিলেন। স্বনামধন্য প্যারীচাঁদ মিত্র, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর,

দেশপূজ্য শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি ঐ সকল ঘটনার প্রত্যক্ষকারী। অতএব ঐ ঐ ঘটনা ভোজবাজী বলিয়া উড়াইয়া দিবার সম্ভাবনা নাই।

সেইজন্য আমার মনে হয় যে, মৃণালবাবুর গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। কারণ, জড়বাদ (যাহাকে আমি সর্ব্বনাশী মতবাদ বলিয়া বিবেচনা করি), পাশ্চাত্য দেশে প্রভাব হারাইলেও, পাশ্চাত্যের মন্ত্রশিষ্য অনেক শিক্ষিত প্রাচ্য এখনও জড়বাদকে সমাদর করেন। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ বিশেষ ভাবে পড়িতে অনুরোধ করি।

২৫।৩।১৯৩৩ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বিষয় সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা
ভূমিকা	...	...	/০
উৎসর্গ পত্র	...	...	১/০
প্রথম অধ্যায়—			
আমাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ	...	...	১
অমৃতময়ীর প্রথম পুত্রশোক	...	...	৩
আমাদের পারিবারিক চক্র	...	...	৭
মতিলালের আবেশাবস্থা	...	...	৯
হীরালালের আত্মার আবির্ভাব	...	...	১২
হেমন্তকুমারের আবিষ্টভাব	...	...	১৪
আমার মা-জননী	...	...	২০
বসন্তকুমারের মহাপ্রস্থান	...	...	২২
জেঠাইমা ও সেজকাকিমা	...	...	২৫
শিশিরকুমার ও ভুবনমোহিনী	...	...	২৬
দিব্যদৃষ্টি	...	...	৩১
শশীমুখী	..	...	৩১
নীরজনয়না	...	...	৩২
স্থিরসৌদামিনী	...	...	৩৬
স্থিরসৌদামিনী সপ্তম স্তরে	...	...	৩৮
সূক্ষ্মদেহের বহির্গমন	...	...	৪১

লীলাবতী ৪৩

হিলিং বা আরোগ্যকারী মিডিয়ম ৪৪

মহাত্মা শিশিরকুমার ৪৫

মতিলাল ৪৬

বিনোদীলালের দেহত্যাগ ৪৮

স্থিরসৌদামিনীর দিব্যদর্শন ৪৯

মুক্তাত্মা কর্ত্তৃক ব্যাধিমুক্তি ৫১

তড়িৎকান্তি বক্সি ৫১

পরোক্ষে মাতুলী প্রদান ৫৭

ডাঃ হেমচন্দ্র সেনের পত্র ৫৭

মেস্‌মেরাইজ করিয়া ব্যাধিমুক্তি ৬১

ডাঃ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের পত্র ৬১

আমি ও সরোজকান্তি ৬৯

পরলোকগত আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ ... ৭১

সরোজকান্তির পরলোকগমন ... ৭২

আমার আবেশ অবস্থা ৭৪

শিশিরকুমার ও কুমুদিনী ৭৮

মৃত্যুশয্যায় ছায়ামূর্ত্তি দর্শন ৭৯

সুহাসনয়নার আবেশাবস্থা ৮০

শ্রীভগবানে বিশ্বাস ৯০

শিশিরকুমার ও অমিয়কান্তি ৯০

রঞ্জনবিলাসের পত্র ৯৪

মৃতের প্রতিচ্ছবি ৯৯

পয়সকান্তির তৈলচিত্র ৯৯

স্বপ্নের সফলতা ১০৫
অমৃতময়ীর অদ্ভুত স্বপ্ন ১০৫
শিশিরকুমারের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ১০৬
ইচ্ছামৃত্যু ১০৯
মহাত্মা শিশিরকুমার ১০৯
পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন ১১১
পদ্মলোচন ঘোষ ১১২

দ্বিতীয় অধ্যায়—
যশোহরে আধ্যাত্মিক চর্চ্চা ১১৫
রাজকৃষ্ণ মিত্রের "শোকবিজয়" ১১৭

তৃতীয় অধ্যায়—
কলিকাতায় আধ্যাত্মিক চর্চ্চা ১২৮
পরলোকবাদী প্যারীচাঁদ মিত্র ১২৯
কলিকাতায় পারলৌকিকতত্ত্ব সভা ১৩২
মিডিয়ম নিত্যানিরঞ্জন ঘোষ ১৩৩
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা ১৪০
সুবিখ্যাত মিডিয়ম ডবলিউ এগ্লিণ্টন ... ১৪২
অলৌকিক ঘটনাবলী ১৪৩
কর্ণেল গর্ডনের গৃহে ১৪৩, ১৫৭
মিউজেন্স সাহেবের গৃহে ১৪৭, ১৫৫
দিননাথ মল্লিকের গৃহে ১৪৯
প্যারীচাঁদ মিত্রের গৃহে ১৫৩
বিবি চিথামের গৃহে ২৫৬

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে ১৫৮
মুহূর্ত্ত মধ্যে কলিকাতা ও লণ্ডনে পত্র পরিচালন ... ১৫৯
বিখ্যাত যাদুকর হ্যারী কেল্লার ১৬৪
হ্যারী কেল্লারের অভিমত ১৬৫
অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ ডাঃ পিবল্‌স্‌ ১৭১
প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে ডাঃ পিবল্‌সের অভিমত ... ১৭১
ডাঃ পিবল্‌স্‌ ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ... ১৭৬
কলিকাতা সাইকিকাল্‌ সোসাইটী ১৭৬
পীযূষকান্তি ও নীহারকান্তি ১৭৭
ডাঃ পিবল্‌স্‌ ও মহাত্মা শিশিরকুমার ... ১৭৮
কলিকাতা সাইকিকাল সোসাইটীর সম্পাদকের পত্র ... ১৮০
নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী ১৮০
ঠাকুর তরণীকান্ত সরস্বতী ১৯০
রায়সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী ১৯৪
পিশাচ দর্শন ১৯৫
পরলোক হইতে চিঠি ১৯৭
ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পুত্রশোক ২০০
আত্মার অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস কেন হইল ... ২১৫
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার "আশাপ্রদীপ" ... ২২৬
আমার হারাণো মেয়ে "জ্যোৎস্না" ২৩০

চতুর্থ অধ্যায়—

প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কারণ ২৩৬
রামশঙ্কর সেনের পরলোকে বিশ্বাস ২৩৮

মৃতাপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ	...	...	২৪৬
হাসপাতালে আত্মার আবির্ভাব	...	...	২৫৮
ডাক্তারের মৃতাপত্নী	...	...	২৭১
মৃতামাতার পুত্রস্নেহ	...	...	২৮২
ভ্রাতৃস্নেহে মৃতাভগিনীর আবির্ভাব	...	...	২৮৫
আমার হারাণো মা	..	...	২৭১
পীড়িতাবস্থায় পরলোক-দর্শন	...	...	২৯৭
বৈদ্যনাথের পিশাচ	...	...	৩০৭
প্রেতাত্মার সহিত তিন বৎসর	...	...	৩১৪
পরিশিষ্ট	...	...	৩৩৬
মৃতব্যক্তির সহিত আলাপ-পরিচয়ের উপায়		...	৩৩৬
চক্রে বসিবার নিয়মাবলী	...	...	৩৪৩

চিত্রসূচী

মৃণালকান্তি ঘোষ (গ্রন্থকার)	...	...	১৲
গোলাপলাল ঘোষ	...	...	১/০
শিশিরকুমার ঘোষ	...	...	১০
মতিলাল ঘোষ	...	...	১১
হেমন্তকুমার ঘোষ	...	..	১৮
পরিমলকান্তি ঘোষ	...	...	১৯
স্থিরসৌদামিনী	...	...	৪২
লীলাবতী	...	...	৪৩
তড়িৎকান্তি বক্সি	...	...	৫৪
বি[illegible]কান্তি ঘোষ			৫৫
কুমুদিনী	...	...	৯০
রঞ্জনবিলাসের পরলোকগতা স্ত্রী ও পুত্রগণ		...	৯১
পয়সকান্তি ঘোষ	...	...	৯৮
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	...	...	৯৯
দীনবন্ধু মিত্র	...	...	১১৪
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	...	.	১১৫
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	.	১১৫
রাজা দিগম্বর মিত্র	...	.	১২৮
প্যারীচাঁদ মিত্র	...	...	১২৯
কেশবচন্দ্র সেন	...	.....	১৩০

নরেন্দ্রনাথ সেন	...	...	১৬১
ডাঃ পিবল্‌স্	...	...	১৭০
মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	...	...	১৭১
পীযূষকান্তি ঘোষ	...	...	১৭৮
নীহারকান্তি ঘোষ	...	...	১৭৯
নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরি	...	...	১৯৪
তরণীকান্ত সরস্বতী	...	...	১৯৫
দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী	...	...	১৯৫
ভূপেন্দ্রনাথ বসু	...	...	২০২
গিরীন্দ্রনাথ বসু	...	...	২০৩
অমিয়া	...	...	২২৬
জ্যোৎস্না	...	...	২২৭
জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	...	২২৮
অশ্বিনীকুমার দত্ত	...	...	২২৯
অন্নপূর্ণা	...	..	৩৩০
অমিয়	...	...	৩৩১
লীলা	...	...	৩৩১

গ্রন্থকারের নিবেদন

দ্বিতীয় সংস্করণ

"পরলোকের কথা" প্রথমে যখন প্রেসে দিই তখন আমি একবারও ভাবি নাই যে, এই পুস্তকের এরূপ কাটতি হইবে। আমাদের পারিবারিক চক্রের প্রায় সত্তর বৎসরের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শোকসন্তপ্ত স্ত্রী-স্বামী, মাতা-পিতা, কিংবা আত্মীয়-স্বজন আমার "পরলোকের কথা" পাঠ করিয়া শান্তিলাভ করেন ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও, কার্য্যতঃ তাহা ঘটিবে বলিয়া আমি একবারও মনে করি নাই। ইহার প্রধান কারণ, এ পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনখানিই সাধারণের দ্বারা সেরূপ আগ্রহের সহিত গৃহীত হয় নাই।

বিগত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে "পরলোকের কথা" দপ্তরীর নিকট হইতে পাওয়া যায়, এবং সেই সময় অমৃতবাজার পত্রিকা ও আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হয়। বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিক্রয় আরম্ভ হয়, এবং আগষ্ট মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যেই সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যায়। তখনও এই পুস্তক পাঠ করিবার আকাঙ্ক্ষা লোকের কিছুমাত্র কমে নাই। প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার পর ভাবিয়াছিলাম, যদি কখন দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে পারি, তখন এই পুস্তকখানিতে আরও আবশ্যকীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট করিব। কিন্তু যেরূপ দ্রুতবেগে পুস্তকখানি

ফুরাইয়া গেল অথচ লোকের আগ্রহ সমভাবে রহিল, তাহাতে বাধ্য হইয়া বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাহির করিতে হইল। কাজেই মনের আশা মিটাইতে পারিলাম না।

এই পুস্তক বাহির হইবার পর হইতে পরলোক ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া বহু ব্যক্তি আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা এবং সুদূর মফঃস্বল হইতেও শোকসন্তপ্ত অনেক নর-নারী পরলোকগত নিজজনের সংবাদ পাইবার জন্য এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

একদিন সকালে আমি বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় আন্দাজ ত্রিশবৎসরের এক ভদ্রমহিলা একটী শিশুকন্যাসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুখখানি অত্যন্ত মলিন, দেখিলেই মনে হয় যে, হৃদয়ে দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে আমি ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।

তিনি বলিলেন,—"আট মাস পূর্ব্বে আমার সাত বৎসরের ছেলেটি মারা যায়। তারপর গত জ্যৈষ্ঠমাসে সর্ব্বগুণান্বিত স্বামীও চলিয়া গিয়াছেন। সঙ্গের এই শিশুকন্যাটীই এখন আমার একমাত্র সম্বল। অবশ্য শ্বশুরশাশুড়ী ও পিতামাতা বর্ত্তমান আছেন। শ্বশুর একজন খ্যাতনামা উকিল, এবং পিতা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। কিন্তু কোথাও মনের শান্তি পাইতেছি না। তাই আপনার "পরলোকের কথা" পড়িয়া, আমার স্বামী ও পুত্রের যে অস্তিত্ব আছে এবং তাহাদিগের সহিত আবার নিশ্চয় মিলিত হইব—এই বিশ্বাস কিসে হয়, জানিবার জন্য আপনার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি।"

আর একটী ভদ্রমহিলা তাঁহার তের বৎসরের একটী পুত্র হারাইয়া একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ আমার ১২ বৎসর ১০ মাসের একটী ছেলে আমাদের ছাড়িয়া,—ইহধাম ছাড়িয়া,—চলিয়া গিয়াছে। ছেলেটী প্রায় ৪ বৎসর যাবৎ অসুখে ভুগিতেছিল। প্রথমে টাইফয়েড, পরে রিউমেটিক ফিভার হয়। চিকিৎসার ত্রুটী করি নাই। শেষে হার্ট অ্যাফেক্ট করিল। চিকিৎসকদিগের পরামর্শমত বিশেষ সাবধানে বহু কষ্টে তুইটী বৎসর একরূপ বুকে করিয়া পালিয়াছিলাম। গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বৈকালে তাহার সামান্য জ্বর হয়। ৪দিন একভাবে কাটিয়া গেল। ২৭শে শনিবার বৈকালে জ্বর বেশী হ'ল। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সে বেশ কথাবার্ত্তা বলিয়াছে। আমার কোলে ৬ মাসের একটী শিশু, তাহাকে বেণু বলে ডাকে। গোপাল আমার বলিল,—"মা, তুমি বেণুকে নিয়া শু'তে যাও।" আমি যেই বেণুকে নিয়া শুয়েছি অমনি আমার ঘুম এসেছে। আর সারারাতের মধ্যে ঘুম ভাঙ্গেনি। সকালে ঘুম ভাঙ্গলেই উঠে দেখি বাবা আমাকে ফাকি দিয়ে চলে গিয়েছে। ১৩ বৎসর বুকে করে মানুষ করলাম, যাবার সময় একটু দেখ্‌লাম না। বাবার আমার কি হ'ল—কি করে প্রাণ গেল,—কিছু বুঝতে পারলাম না। হয়ত 'জল' 'জল' করে প্রাণ গিয়েছে। রবি আপনার "পরলোকের কথা" প'ড়ে শুনায়েছে। আমার গোপালের অস্তিত্ব কি আছে? আমি কি আমার গোপালকে আবার পাব? সে কি আবার আমাকে মা বলে ডাকবে? ক্ষুধা পেলে মাগো খাবার দাও বলে আবার কি দৌড়ে আসবে?" এইভাবে নানারূপ বিলাপ করে পত্র লিখিয়াছেন।

মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব ও পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে, এই হা হুতাশ ভাব যাইবে না। ভাল মিডিয়ম হইলে তিনি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিদান করিতে পারেন। আমাদের দেশে সেরূপ মিডিয়মের সংখ্যা অত্যন্ত কম যাঁহাদের সাহায্যে পরলোকগত আত্মার ঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। একটী বৃদ্ধারমণীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি যশোহর সেনহাটী নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। শুনিয়াছি, তিনি শোকসন্তপ্ত নরনারীর দগ্ধ-হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ইহাই ত হিন্দুরমণীর প্রধান গুণ। তবে এখন তিনি বৃদ্ধা, কাজেই তাঁহাকে ক্লেশ দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে।

১০ই আশ্বিন, ১৩৪০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

ভূমিকা

অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকায় "স্পিরিচুয়ালিজম্" বা আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা হইতেছে ; এই আলোচনার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পক্ষেই অনেক মান্যগণ্য সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন। এ সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকায় নানা ভাষায় বহুবিধ সাময়িক পত্র এবং সুবিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের লিখিত নানাবিধ তথ্যপূর্ণ বহুল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল আলোচনার ফলে মানবসমাজে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার আবিষ্কৃত হইতেছে। এ দেশেও বহুদিন হইতে এই আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় এখনও এদেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের চিত্ত এদিকে সেরূপভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

মানবসমাজ প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক-তত্ত্বই সর্ব্বপ্রধানরূপে গণ্য হওয়া উচিত। ভারতীয় আর্য্যগণ তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ প্রত্যক্ষভাবে আত্মতত্ত্বের যে সকল গবেষণা করিতেছেন—সেই সকল গবেষণা প্রকৃতপক্ষেই অদ্ভুত ও অভিনব। এই স্থূল জড়ীয় দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যে

মানুষের জীবন শেষ হয় না, মানুষের স্বকীয় আকার প্রকার মৃত্যুর পরেও যে অভিনব দেহে বর্ত্তমান থাকে, সেই দেহ যে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় এবং জড়দেহমুক্ত পরলোকগত ব্যক্তিবর্গের সহিত যে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত হইতে পারে, পাশ্চাত্য স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ প্রত্যক্ষভাবেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

সুতরাং এই বিষয়ের আলোচনা মানবসমাজের পক্ষে একান্ত হিতকর। আমেরিকার সুবিখ্যাত জজ এডমাণ্ডস্ অতি অল্পকথায় ইহা বিবৃত করিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—"মানুষের যত প্রকার দুঃখ আছে তন্মধ্যে মৃত্যুজনিত বিরহ-দুঃখই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের আলোচনায় জানা যায়, যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি তাহা এই স্থূল জড়দেহের নাশমাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক-দেহ অনেকাংশেই এই দেহের অনুরূপ, এবং উহার বিনাশ হয় না। উহা সহসা সকলের নয়নগোচর না হইলেও, বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত নরনারীগণের (Mediums) প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়; এমন কি, উহাদের সঙ্গে ব্যবহারিক ভাবে কথাবার্ত্তাদিরও আদান প্রদান হইয়া থাকে। সুতরাং এতদ্দ্বারা শোকসন্তপ্ত ও ভগ্ন হৃদয়ের শোকভার প্রকৃতপক্ষেই বিদূরিত হয়। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের এ দেহত্যাগের ভাবনা হয় না; সুতরাং মৃত্যুর বিভীষিকাও দূরীভূত হইয়া যায়। ইহাতে নাস্তিকের চিত্তেও আস্তিক্যের ভাব আনয়ন করে,—পাপপথগামী ব্যক্তিগণকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করে। ধার্ম্মিকব্যক্তিগণ এই জীবনের নানাবিধ দুঃখময় পরীক্ষার মধ্যেও পারলৌকিক সুখময় অবস্থার আশা পাইয়া প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকেন এবং সৎকর্ম্ম সম্পাদনে উৎসাহিত হন। এতদ্দ্বারায় মানুষ তাহার জীবনের গতি ও কর্ত্তব্যতার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হন,

এবং ভবিষ্য জীবনের সম্বন্ধে আর তাঁহাদের কোনপ্রকার অনিশ্চয়তাই থাকে না।"*

ফলতঃ জড়দেহাতিরিক্ত পৃথক্ জ্ঞানময়ী চেতনা-শক্তিতে বিশ্বাস উৎপন্ন না হইলে, পারলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকিলে, মানুষ কখনও প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হয় না। এতাদৃশ জ্ঞানবিবর্জ্জিত যদি কোন ধর্ম্ম থাকে, তাহা প্রকৃতপক্ষেই ভিত্তিহীন। পারলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূলভিত্তি। আধুনিক পাশ্চাত্য স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ যে সকল প্রত্যক্ষপ্রমাণে এই বিশ্বাস জন্মাইতেছেন তাহা প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পক্ষেই অতীব হিতকর। প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিতই ইহাদের চিন্তাধারার সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আছে। স্থূল জড়দেহ ত্যাগের পরেও মানুষের সেই আকার প্রকার ভাব ভঙ্গী তাহার আধ্যাত্মিক দেহে বর্ত্তমান থাকে। দেহত্যাগের পরেও মুক্তদেহী মানুষের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তার আদান প্রদান চলিতে পারে,—এই

* There is that which comforts the mourner and builds up the broken heart ; that which smooths the passage to the grave and robs death of its terrors ; that which enlightens the atheist and can not but reform the vicious ; that which cheers and encourages the virtuous amid all the trials and vicissitudes of life ; and that which demonstrates to man his duty and his destiny, bearing it no longer vague and uncertain.

উদ্ধৃত মন্তব্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত সূক্ষ্মদর্শী প্রতিভাবান্ Sir Arthur Conan Doyle লিখিয়াছেন—"The matter has never been better summed up than that.—The History of Spiritualism. Vol. I. P. 130.

হইতেছে স্পিরিচুয়ালিষ্টগণের মূলসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত,—হিন্দু বলুন, মুসলমান বলুন, পার্শী বলুন, আর খ্রীষ্টানই বলুন, সকল প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পক্ষেই,—এই জ্ঞান ও এই বিশ্বাস অতীব প্রয়োজনীয়। কেবল মাত্র জড়তত্ত্ববিশ্বাসী দেহাত্মবাদিগণের সিদ্ধান্তের সহিত ইহার সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নাই। আমাদের স্থূল জ্ঞানের অন্তরালেও যে সুবিশাল অন্তর্জগৎ নিত্য বর্ত্তমান—"স্পিরিচুয়ালিজম্" বা পরলোকতত্ত্ব দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

আধুনিক পরকালতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে পাশ্চাত্যদেশে বহুল সুশিক্ষিত দার্শনিক্ ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে আমাদের স্থূলজ্ঞানের অগোচর সূক্ষ্মজগতের কার্য্যাবলী যে প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে তাহার অনেক সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইঁহাদের আবিষ্কৃত প্রণালী ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে আমরা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়ার উপায় দেখিতে পাই না। সূক্ষ্মজগতের কার্য্যাবলী ও তাহার নিয়মসমূহ কেবল ঋষিগণের গ্রন্থে জানা যায়, কিন্তু পরলোকতত্ত্ববিদ্ আধুনিক পণ্ডিতগণ নানাবিধ আকারে তাহার প্রত্যক্ষপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন; আমরা চাক্ষুষও তাহা দেখিতে পাইতেছি। সাঙ্খ্যদর্শনে লিখিত আছে, আমাদের ভূতাত্মা ও সূক্ষ্মাত্মা, ভূত ও সূক্ষ্ম এই দুই দেহে বাস করেন। ইহার উপরেও সাঙ্খ্যদর্শনে 'কারণ-দেহ' নামে অতিসূক্ষ্মতম একপ্রকার অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় দেহের কথা উল্লিখিত আছে।

আমরা স্থূলজ্ঞানে. কেবল আমাদের এই স্থূলদেহের কথাই জানিতে পারি,—সূক্ষ্মদেহের কথা কিছুই জানিতে পারি না। কিন্তু সূক্ষ্মশক্তিতত্ত্বও অধুনা পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্পষ্টতঃই স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা স্পষ্টতঃই বলিতেছেন, আমাদের

পরিজ্ঞাত স্থূলশক্তিতত্ত্বের উপরেও এই শক্তিসমূহের সূক্ষ্মভিত্তি আছে। সেই সূক্ষ্মশক্তি হইতেই এই স্থূলজগতের শক্তিসমূহ প্রকটিত হয়, এবং তাহাই জড়বিজ্ঞানের শক্তিতত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠান। বহুবৎসর পূর্ব্বে টেইট্ সাহেব প্রভৃতি মনীষাসম্পন্ন জড়বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সূক্ষ্ম-শক্তি সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ব্বক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থে আমরা পরলোকতত্ত্বের আভাষ পাই; সেই গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া আমরা শ্রীভগবানের সূক্ষ্ম চিন্ময়ী শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভের সন্ধান পাই।

প্রফেসর টেইট্ (Tait) এবং ব্যালফোর ষ্টিউয়ার্ট (Balfour Stewart) উভয়ে "Unseen Universe" অর্থাৎ "অদৃশ্য বিশ্ব" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন; তাহাব একস্থানে তাঁহারা লিখিয়াছেন, মানুষের মস্তিষ্কের অন্তর্গত ধূসরবর্ণ পদার্থ বিশেষ (gray matter of brain substance) হইতে মানসিক চিন্তাধারা বাহিরে ইথারপদার্থে প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং ইথারের তরঙ্গে তরঙ্গে খুব সম্ভবত উহারা সুদূর অতীন্দ্রিয় জগতে ধাবিত হয়। এমন কি, আমাদের প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান গ্রহ নক্ষত্র হইতেও এই তরঙ্গ আরও অধিকদূরে প্রধাবিত হয়; ফলতঃ এইরূপ প্রণালী ভিন্ন মানসিক চিন্তা ও ধ্যানধারণা ভগবৎ-রাজ্যের সন্ধান সহজে পাইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান দেহ সীমায় সীমায় আবদ্ধ। ইহা দ্বারা আমরা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি না। টেইট্ সাহেব এবং অন্যান্য আধুনিক জড়বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যে ইথার (ether) পদার্থের কথা বলেন,—এই ইথারের যে স্বরূপ কি, এ পর্য্যন্ত তাহা ভালরূপে কেহ বলিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিকগণ এই মাত্র আভাষ দিয়াছেন যে, আমাদের ভূবায়ু (atmosphere) হইতেও ইহা আরও অধিকতর সূক্ষ্ম। আমরা এই

ইথার ও বায়ুরাশির মধ্যে বাস করিয়া থাকি। সূর্য্যের কিরণ ও শব্দাদি এই ইথার-তরঙ্গের মধ্যে দিয়া আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়।

সাঙ্খ্যদর্শন যে সূক্ষ্মদেহের কথা বলিয়াছেন, থিওসফিষ্টগণ বলেন উহা ইথারিক দেহ (etheric body)। এই সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়াশক্তি অত্যন্ত অদ্ভুত। আমাদের এই স্থূলদেহে যে সকল যন্ত্র আছে এই সূক্ষ্মদেহেও সেই সকল যন্ত্রাদি আছে, কিন্তু উহাদের বিশিষ্টতা এই যে, উহারা স্থূল আবরণের বাধা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। আমাদের প্রাকৃত দেহের চক্ষু আবৃত করিয়া দিলেও সূক্ষ্মদেহের চক্ষু দর্শনের কার্য্য সম্পাদন করে; অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও এইরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা এই প্রাকৃত দেহে সূক্ষ্মদেহের শক্তির প্রভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেব চক্ষু আবৃত করিয়া দিলেও দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্যে কোন ব্যঘাত ঘটে না। এই সূক্ষ্মদেহ মেদ মজ্জা অস্থি মাংস প্রভৃতিতে গঠিত নহে; উহা সূক্ষ্মপদার্থবিশেষে নির্ম্মিত; তাহা হইলেও উহার আকার স্থূলদেহের আকার সদৃশ। এই দেহধারী পরলোকগত ব্যক্তিগণ যখন ইহজগতের মানবগণের নিকট উপস্থিত হন, তখন তাঁহাদিগের আকার দেখিয়াই পূর্ব্বজন্মের সেই ব্যক্তি বলিয়া অনায়াসেই জানা যায়। উহারা চক্ষুর সাহায্য ভিন্ন দূরের বস্তু—প্রাচীরাদির অপর পার্শ্বস্থ বস্তু—সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পান। প্রাচীরাদির আবরণ তাঁহাদের দর্শনের কোন ব্যাঘাত জন্মায় না। ভারতীয় যোগিগণ যোগ সাধনায় এই শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। দূরদর্শন দূরশ্রবণ প্রভৃতির কথা পুরাণাদির ও যোগাদির গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥

গুণেষসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ॥
অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণ দর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়-প্রবেশনম্॥
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহক্রীড়ানুদর্শনম্।
যথা সঙ্কল্প-সংসিদ্ধিরাজ্ঞাঽপ্রতিহতা গতিঃ।
ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বু-বিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ॥"

দেহের অণিমা (অণুবৎ হওয়া), মহিমা (বৃহদায়তন হওয়া), লঘিমা (পাতলা হওয়া), প্রাপ্তি (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্তি), প্রাকাম্য (শ্রুত পারলৌকিক ও দৃষ্ট দর্শনযোগ্য পদার্থসমূহের একান্ত দুরধিগম্য দুষ্প্রাপ্যবিষয়েও ভোগদর্শনাদি-সমর্থতা), ঈশিতা (শক্তি-প্রেরণসামর্থ্য), বশিতা (ভোগ্যবস্তু থাকা সত্ত্বেও ভোগ-নিবৃত্তি ও কাম্যপ্রাপ্তি। সাধারণতঃ ইহাই প্রধান অষ্টসিদ্ধি। এতদ্ব্যতীত গুণহেতু সিদ্ধিও অনেকগুলি আছে। অনূর্ম্মিমত্ত্ব (ক্ষুৎপিপাসারাহিত্য), দূরদর্শন (clairvoyance), দূরশ্রবণ (clairaudience), মনোজব (মনের ন্যায় দ্রুতগতিতে যথেচ্ছ গমন), পরকায়-প্রবেশ (obsession) স্বচ্ছন্দ মৃত্যু, দেবগণসহ ক্রীড়ানুদর্শন, সঙ্কল্পসিদ্ধি, অপ্রতিহতা গতি, ত্রিকালজ্ঞত্ব, অদ্বন্দ্ব (শীতউষ্ণতাদির অনভিভবত্ব অর্থাৎ শীতগ্রীষ্মে ক্লেশ বোধ না করা), পরচিত্তাদির অভিজ্ঞতা (পরের মনের কথা জানা), অগ্নি সূর্য্য জল ও বিষাদির ক্রিয়া-সংরোধ ইত্যাদি। ইহার অনেক ব্যাপারই আধুনিক পরলোকপ্রাপ্তি-সিদ্ধ ব্যক্তিগণ মিডিয়মের সাহায্যে জনসাধারণ সমক্ষে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ অতীন্দ্রিয়—তাঁহার শক্তিও অতীন্দ্রিয়, তাঁহার ধামও

অতীন্দ্রিয়। স্পিরিচুয়ালিজম্ জড়শক্তি তুচ্ছ করিয়া জড়শক্তি-বিজ্ঞানের ক্ষুদ্রতা প্রদর্শিত করিয়া অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান চাক্ষুষভাবে দেখাইয়া আমাদিগকে ভগবৎরাজ্যের অভিমুখে লইয়া যাইতে প্রয়াসী। ইঁহাদের কার্য্যপ্রণালী প্রকৃতপক্ষেই শ্রীমদ্‌ভাগবতাদির অনুমোদিত জ্ঞানভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশের একান্ত অনুকূল। সুতরাং এই বিষয়ের আলোচনা গবেষণা ও অনুশীলন ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেরই অত্যাবশ্যক।

ইহা কোন সাম্প্রদায়িকতায় আবদ্ধ নহে। হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষেই ইহার অনুশীলন অতীব প্রয়োজনীয়। দেহাতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় অলৌকিক শক্তিবিশেষের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে আত্মতত্ত্ব পরলোকতত্ত্ব এমন কি ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছুমাত্র জ্ঞানলাভ হয় না। আধুনিক স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ যেরূপভাবে এ সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে নাস্তিক্যবাদ নিঃসন্দেহে দূরীভূত হইবে। উপরন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বারা পারলৌকিক বিশ্বাস সহজেই জনসাধারণের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইবে। প্রকৃত কথা বলিতে কি, স্পিরিচুয়ালিষ্টগণের প্রথায় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পারলৌকিক চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেও, যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসজ্জনগণের পক্ষে ইহা ধর্ম্মবিশ্বাসের পরম সহায় হইবে।

বহু প্রাচীন সময়েও ভারতবর্ষে নাস্তিক সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না; মাধবাচার্য্যকৃত "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" গ্রন্থে প্রত্যক্ষবাদী "চার্ব্বাক" সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহারা দেহাতিরিক্ত পৃথক্‌চৈতন্য স্বীকার করেন না, পারলৌকিক আত্মার অস্তিত্ব ইহারা মানেন না, ভগবৎ-অস্তিত্বের কথা ত দূরের কথা। "নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ", "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং

কুতঃ” ইত্যাদি অভিমত প্রচার করিয়া ইহারা বেদের এবং বৈদিকাচারের মূলনীতির উচ্ছেদ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইহারা পরলোক স্বীকার করেন না, এই নিমিত্ত ইহাদের অপর নাম "লোকায়তিক"—অর্থাৎ ইহলোকের সুখশান্তিই ইহাদের জীবনের লক্ষ্য। "বৃহস্পতিসূত্র"—নামে নাস্তিক-মত-প্রতিপাদক একখানি গ্রন্থের নামও শুনা যায়। ইহজীবনের সুখই ইহাদের পরমলক্ষ্য। ইহাদের অভিমত এই যে, জড়দেহ হইতেই চেতনার উৎপত্তি হয়, তদতিরিক্ত পৃথক্‌চৈতন্য নাই; যেমন গুড় ও তণ্ডুলের পৃথকভাবে কোন মাদকতা নাই, কিন্তু উহাদের রাসায়নিক সংযোগে মাদকতাশক্তির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পৃথিবী জল তেজ বায়ু প্রভৃতি অচেতন হইলেও উহারা মিলিত হইয়া যে দেহের উৎপত্তি হয় তাহাতে জীবনীশক্তি জন্মে। এই ভৌতিকদেহই আত্মা, ইহা ছাড়া কোন আধ্যাত্মিক বা সূক্ষ্মদেহ নাই। বলা বাহুল্য ই উরোপের বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক নাস্তিকগণ অধুনা এই জড়বাদের প্রাদুর্ভাবের দিনেও ইহা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিপ্রদর্শন করিতে পারেন নাই।*

*পাঠকগণের কৌতুহল প্রশমনের জন্য চার্ব্বাকদর্শনের কয়েকটি প্রধান প্রধান কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে॥
কিম্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।
তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়মেব বিনশ্যতি॥"
"অহং স্থূলঃ কৃশোহস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদি-যোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ॥
মম দেহোহয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী॥"
"ন স্বর্গো নাপবর্গোবা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।

এই materialism বা নাস্তিক্যবাদে জনসমাজের ধর্ম্মভাব ও সুনীতির মূল উচ্ছিন্ন করিয়া মানবসমাজকে জঘন্য স্বার্থপরতাময় পশুভাবে পরিণত করিয়া দেয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই নাস্তিক্যবাদ উন্মুলনের জন্য নৈয়ায়িকগণ মীমাংসকগণ ও বেদান্তবিদ্‌গণ নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। নানা প্রকার যুক্তি তর্ক দ্বারা জনসমাজকে এই নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনসমাজস্থ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে নাস্তিক্যবাদের প্রভাব তখনও গোপনে গোপনে বর্ত্তমান ছিল, এখনও কার্য্যতঃ প্রায় সেইরূপই রহিয়াছে। জনসমাজ মৌখিকভাবে যতই ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করুন না কেন, কিন্তু পরলোকে বিশ্বাস ও দেহাতিরিক্ত পৃথক্ শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মায় বিশ্বাস বড সহজ কথা নহে। প্রত্যক্ষের নিকট অনুমান উপমান ও শব্দ-প্রমাণ সহজেই দুর্ব্বল, কেবল যুক্তি তর্ক বা শাস্ত্রকথা দ্বারায় লোকের চিত্তে পরলোকের বিশ্বাস সহজে জন্মে না। আমাদের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে, দুষ্ট কার্য্যের জন্য পরলোকে দুঃখ পাইতে হইবে; কেবল স্থূলদেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জীবনের ভাল মন্দ সকল কার্য্য শেষ হইল, দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল, আর উহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের সকল কার্য্য

নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিঃ পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা ॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে ॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎতৃপ্তিকারণম্
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং কার্য্যং পাথেয়-কল্পনম্ ॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ॥

শেষ হইয়া পড়িল, আমাদের অশিষ্ট কার্য্যের জন্য কোনরূপ দুষ্কৃতি-ভোগ করিতে হইবে না,—এইরূপ বিশ্বাসের প্রাদুর্ভাবে সকল সুনীতির মূল স্বভাবতঃই উন্মূলিত হইয়া উঠে। ধর্ম্মবিশ্বাসজনিত শান্তিলাভের কথা ত অতি দূরের কথা।

অধুনা ইউরোপেও খ্রীষ্টানধর্ম্মের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকতার কীট প্রবেশ করিয়া উহাকে জীর্ণশীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কেবল প্রাণ-হীন নিয়মে এবং গীর্জ্জার বাহ্যাড়ম্বরে খ্রীষ্টধর্ম্ম আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণ আত্মার অস্তিত্ব পরলোক এবং ভগবৎ-অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছেন। অতীন্দ্রিয় ও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে বিশ্বাসের উদ্ভব এক প্রকার অস্বাভাবিক ও অসম্ভবও বটে। এই নিমিত্ত মানবজাতির উদ্ধার-কল্পে পরলোক ও সূক্ষ্মদেহের প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলা গবেষণা এবং বিবিধাকারে

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেব বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহ-সমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যাদ্বিদ্যাতে ক্বচিৎ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নস্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতম্॥"

ইহাই হইতেছে প্রাচীন নাস্তিক্যবাদ এবং ইহাই আধুনিক "materialism" বা জড়ত্ববাদের সারতাৎপর্য্য।

তৎপ্রদর্শনের দ্বারা স্পিরিচুয়ালিজম্ বা পরলোক-চর্চ্চা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষে মহোপকার সাধন করিতেছে। যদি বলেন, প্রাচীন ধর্ম্মসমূহ কি এই আধ্যাত্মিক অবনতি হইতে সমাজ-রক্ষা সাধনে পর্য্যাপ্ত নহে? তদুত্তরে মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বলেন, সে সকল এখন আর তেমন কার্য্যকর হইতেছে না। প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি দিন দিন কেবলই প্রাণহীন কথায় (formal) ও অসার সামাজিকতায় জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। যথার্থ ধর্ম্মের প্রাণের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই, কেবল বাহিরে অসার লোক-দেখানো মামুলী প্রথা পালনেই উহাদের কর্ত্তব্য নিঃশেষিত হইতেছে।

প্রকৃত বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। জনসমাজ এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে কেবল বেদ বেদান্ত তন্ত্র মন্ত্র পুরাণ কোরাণ ও বাইবেলের কথায় ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইতে রাজী নহেন। এখন চাই—প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান। স্পিরিচুয়ালিজম্ আমাদিগকে তাহাই প্রদান করিতেছে। মৃত্যুর পরেও আমাদের এই জীবন বর্ত্তমান থাকে, এই জগতের পরেও বহুল অদৃশ্য জগৎ রহিয়াছে, স্পিরিচুয়ালিজম্ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। ইহার ফলে খাঁটি বৈজ্ঞানিক ধারায় ধর্ম্মবিজ্ঞান গঠিত করিবার সুবিধা হইতেছে, এবং নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন মতবাদিতার মধ্যে যথার্থ ধর্ম্মের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। *

* "It is this which spiritualism supplies. It founds our belief in life after death and in the existence of invisible worlds, not upon ancient tradition or upon vague intuitions but upon proved facts, so that a science

এ সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা পাশ্চাত্যদেশজাত বলিয়া এদেশবাসিগণের অবজ্ঞা বা অনাদর করিবার কোন হেতু নাই। কেন না, যাহা সত্য তাহা সর্ব্বদাই সত্য এবং সর্ব্বত্রই সত্য নিত্য ও শাশ্বত। সত্য গ্রহণ ও সেই সত্যের সম্মান ও সমাদর করা ভারতীয় আর্য্যগণের জীবনের মহাব্রত। বেদ বেদান্ত ও পুরাণাদি সর্ব্বত্রই এই সত্যের সম্মাননায় বিভূষিত হইয়াছে। সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণ-কার গ্রন্থারম্ভেই মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—"সত্যং পরং ধীমহি।" উপনিষদে বহুস্থলে এই মহাসত্য পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে।

যদিও ভারতবর্ষে এই স্পিরিচুয়ালিজম্ তত্ত্ব আলোচনার তরঙ্গ এখনও সম্যকরূপে অনুভূত হইতেছে না, কিন্তু ইহা অতীব সত্য যে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বেদবেদান্তপুরাণাদিতে রামায়ণে মহাভারতে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে, এমন কি তথাকথিত শিক্ষিত লোকগণ যাহা কুসংস্কার বলিয়া নাসিকা সঙ্কোচন করেন, তাদৃশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশাল বিপুল জনসাধারণের হৃদয়েও এই স্পিরিচুয়ালিজমের মহাসত্য সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

জড়বাদের এই মহা দুর্দ্দিনে, রাজনীতির এই মহা কোলাহলে—এই ভারতবর্ষে এক্ষণে এই পরলোক-বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রকৃত সুসময় আসিয়াছে। ইহা ভিন্ন এই মহাবিক্ষুব্ধ মহাবিক্ষিপ্ত অশান্তিদগ্ধ নরনারীগণের চিত্তে ধর্ম্মবিশ্বাস, ভগবদ্ভক্তি ও জীবে দয়া বা প্রীতি আনয়নের সবিশেষ উপায় দৃষ্ট হয় না। আমরা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মহামনীষাসম্পন্ন

---

of religion may be built up, and may give a sure pathway amid the quagmire of the creeds."—'The History of Spiritualism' by Sir Arthur Conan Doyle, Vol. II, page 247.

সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভগবৎ-বিশ্বাসী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া এবং পারলৌকিক বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টা, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিময়ী গবেষণা ও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আশান্বিত হইতেছি। পারলৌকিক-চর্চ্চা-বিষয়ক সাহিত্যে ইউরোপ আমেরিকা পরিপ্লাবিত হইতেছে। এদেশে এতৎ সম্বন্ধে বঙ্গভাষায়ও দুইএকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত না হইয়াছে এমন নহে, কিন্তু তাহা নাম মাত্র; আবশ্যকতার সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় The Hindu Spiritual Magazine নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পরেও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা ও পুত্র-পরিজনের দ্বারা কিয়দ্দিবস এই পত্রিকাখানি যোগ্যতার সহিত পরিচালিত ও প্রকাশিত হইতেছিল। এখন অনেকদিন হইল উহার পরিচালন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অপরন্তু উহা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে এই তথ্য প্রচারের নিমিত্ত উহার উপযোগিতা সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত হয় নাই।

অধুনা তদীয় পরমস্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র সুযোগ্য সুলেখক শ্রীমৎ মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি লিখিয়া সমাজের বহু কল্যাণ সাধন করিলেন। ইনি একদিকে যেমন অতি সুমধুব সুলেখক ও ভগবদ্ভক্ত, অপরদিকে তেমনিই এ বিষয়ে নিজ জীবনে সম্যকরূপে অভিজ্ঞ। ইঁহার লিপিকৌশল স্বভাবতঃই চিত্তাকর্ষক, ভাষা সুমার্জ্জিত অথচ অতীব সরল কোমল ও সুমধুর। এই গ্রন্থের প্রায় সকল ঘটনাই ইঁহার নিজের ও পরিচিত জনগণের অভিজ্ঞতা হইতে বিবৃত। নিজে যাহা জানিয়াছেন, প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা প্রকৃত সত্য বলিয়া যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে

বিবৃত করিয়াছেন। ইহা পাঠে সুশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত নরনারীমাত্রই বহুল উপকার প্রাপ্ত হইবেন। এমন কি, অশিক্ষিত নরনারীগণও ইহা শ্রবণে আনন্দলাভের সঙ্গে সঙ্গে মহোপকৃত হইবেন, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ; অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীরসিকমোহন দেবশর্ম্মা
(বিদ্যাভূষণ)

উৎসর্গ-পত্র

শ্রীল গোলাপলাল ঘোষ-মহোদয়

শ্রীকরকমলেষু—

ছোটকাকা,

কত শত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-নিরানন্দের মধ্য দিয়া, কত রকম আপদ-বিপদ, বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া,—প্রীতি-ভালবাসার ডোরে পরস্পরকে বান্ধিয়া,—এক-মন এক-প্রাণ লইয়া,—আমরা সুদীর্ঘ বাহাত্তর বৎসর কাটাইলাম; এখন তুমি আমাকে ফেলিয়া অকস্মাৎ স্বধামে চলিয়া গেলে!

আমি জানিতাম তুমি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া, নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত ভাবে আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া যাইতেছ, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে স্বধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ; কিন্তু এত শীঘ্র যে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তাই, তোমার অদর্শনে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি।

তুমি গোলকের বস্তু গোলকে গিয়াছ, সে জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু আমরা মর-জগতের মলিন-জীব, নিঃস্বার্থভাবে প্রিয়জনকে ভালবাসিবার মত মনের জোর আমাদের নাই। সেই জন্য তোমার বিরহে সর্ব্বদা একটা অভাব অনুভব করিতেছি।

বহুকাল হইতে আমাদের পরিবার-মধ্যে পারলৌকিক-তত্ত্বের চর্চ্চা

চলিয়া আসিতেছে। শৈশবে আমাদের পারিবারিক-চক্র দেখিয়াছি। তখন সেখানে পরলোকগত নিজজনের আত্মার আবির্ভাব হইলে, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা ও কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া, আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। তখন মনে হইত, তাঁহারা যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে অবস্থান করেন, এবং মধ্যে-মধ্যে আমাদের সংবাদ লইতে, কিংবা নিজেদের দুঃখ-কষ্ট জানাইতে চক্রে আসিয়া থাকেন।

ক্রমে বড় হইয়া নিজেরা যখন চক্রে যোগদান করিয়াছি, তখন অনেক অলৌকিক ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া, এবং সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

শৈশবে স্বপ্নরাজ্য বলিয়া যাহা ধারণা ছিল, বড় হইয়া বুঝিয়াছি তাহা স্বপ্নরাজ্য নহে, বাস্তব-জগৎ,—বাস্তব হইলেও চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। এই জগৎ নানা স্তরে বিভক্ত। মানবাত্মা আপনাপন কর্ম্মফলানুসারে এই জগতের স্তর-বিশেষে অবস্থান করেন। সেখানে থাকিয়া ক্রমে আত্মোন্নতি লাভ করিয়া ও সেই সঙ্গে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দেহ প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে উন্নীত হইয়া থাকেন।

নিজজন দূরদেশে গমন করিলে, যেমন ডাকঘরের বা তারবার্ত্তার সাহায্যে তাহার সংবাদ পাওয়া যায়, সেইরূপ চক্রের সাহায্যে পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ পাওয়া এখন অনেকটা সহজসাধ্য হইয়াছে। বিজ্ঞানের বলে যেমন দূরস্থিত ব্যক্তির সহিত টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলিতে এবং তাহার কণ্ঠ-স্বর শুনিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ মিডিয়মের সাহায্যে পারলৌকিক আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারি এবং তাহার কণ্ঠ-স্বর পর্য্যন্ত শুনিয়া থাকি। আবার চক্ষু বুজিয়া কখনও কখনও তাহার সূক্ষ্মদেহ দেখিবার ক্ষমতাও

অর্জ্জন করি। সুতরাং পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের বিরহে শোক করিবার বিশেষ কোন কারণ থাকিতে পারে না।

আমার পিতামহী তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র হীরালালের শোকে অভিভূত হইয়া যখন আপন জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময় শুনিলেন যে মৃতব্যক্তির সহিত নাকি কথাবার্ত্তা বলা যায়। এই সংবাদ শুনিয়া কেবল যে তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল তাহা নহে,—ইহার কয়েক দিন পরে চক্রে বসিয়া, শ্রীভগবানের কৃপায় প্রকৃতই তিনি সেই প্রিয়তম পুত্রের সন্ধান পাইলেন।

সেইদিন হইতে প্রত্যহই পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, তাহার কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া, তাহার নিকট হইতে পূর্ব্বের মত ভক্তি ও ভালবাসার নিদর্শন পাইয়া, তিনি শোক ভুলিয়া গেলেন। তখন প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল, কতক্ষণে সন্ধ্যা হইবে, কতক্ষণে চক্রে বসিয়া পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবেন।

ফুলকাকা হীরালালের ইহলোক পরিত্যাগের পর হইতে এপর্য্যন্ত আমাদের অনেকগুলি আত্মীয়-স্বজন পরলোকগমন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায়, একমাত্র চক্রের সাহায্যে, আমরা তাঁহাদের বিরহ-জনিত নিদারুণ শোকভার লাঘব করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রিয়জনের বিরহ-ব্যথিত-ব্যাকুল-হৃদয়ে যখন আমরা শ্রীভগবানের নাম-গান করিয়াছি, তখনই পরলোকবাসী নিজজনেরা আসিয়া অন্তরীক্ষে আমাদের সহিত কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিয়াছেন। ইহা আমরা যে কেবল হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি তাহা নহে, দিব্যদৃষ্টিতেও দেখিতে পাইয়াছি। এতদ্ভিন্ন ‘হরিদাস’ প্রভৃতি উচ্চস্তরের পবিত্র আত্মারাও আসিয়া মধ্যে-মধ্যে এরূপ অপার্থিব আনন্দের ঢেউ উঠাইয়াছেন যে, সেই তরঙ্গে পড়িয়া আমরাও আত্মহারা হইয়া গিয়াছি।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি শোক পাইয়া তোমায়-আমায় একদিন বসিয়া কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতেছিলাম; এমন সময় দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলাম, পরলোকগত নিজজনেরা সেখানে আসিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহাদের সেই নৃত্য দেখিয়া আমরা আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আবিষ্ট অবস্থায় আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহাদের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলাম। আবিষ্ট-ভাব ভাঙ্গিয়া গেলে তুমি বলিয়াছিলে,—"ঠাকুর নরোত্তমের মহোৎসবে মহাপ্রভুর সাঙ্গপাঙ্গসহ নৃত্য করিবার কথা যাহা গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, তাহা যে কবির কল্পনা নহে, এখন তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।"

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের ন্যায় মলিন-জীবের পক্ষে প্রিয়জনের বিরহজনিত-শোকভার আপাত-দৃষ্টিতে ক্লেশকর হইলেও, ইহা অপেক্ষা শ্রীভগবানের কৃপা ও করুণা আর অধিক কিছুই হইতে পারে না। স্বর্ণ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইতে-হইতে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়া লোকচক্ষুতে ক্রমে অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে, আমাদের অন্তরাত্মাও সেইরূপ শোকানলে দগ্ধ হইয়া যতই নির্ম্মল হইতে থাকে, ততই আমরা করুণাময়ের অসীম কৃপালাভে সমর্থ হই, এবং তখনই সম্যকরূপে বুঝিতে পারি, তিনি আমাদের কিরূপ বন্ধু, কত নিজজন। এই শোক আমাদের হৃদয় যেরূপ উন্নত, পবিত্র, নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মল করিতে পারে, সাধন-ভজনের দ্বারাও সকল সময় সেরূপ হয় না।

ঠাকুরমাতার গোলক-গমনের পর হইতে তুমিই ছিলে আমাদের চক্রে বসিবার প্রধান উদ্যোগী। তোমারই প্রচেষ্টায় চক্রে বসিয়া, একদিকে যেমন শ্রীভগবানের সুমধুর নাম-গানে হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ পরলোকগত নিজজনদিগের সহিত আলাপ-

আলোচনা করিয়া ও অনেক অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া ধন্য হইয়াছি।

তুমি এখন ইহ-জগতের শোকদুঃখের বাহিরে যাইয়া পরলোকবাসী প্রিয়জনদিগের সহিত মিলিত হইয়াছ। দেখিও যেন সেখানকার সেই বিমল-আনন্দে বিভোর হইয়া, এই পার্থিব-জগতস্থ নিজজনদিগের কথা একেবারে ভুলিয়া না যাও। এখানে থাকিতে পরলোকের সংবাদ জানিবার জন্য তুমি কত উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত হইতে। কাজেই ওখানকার সংবাদ জানিবার জন্য আমরা যে কিরূপ ব্যাকুল তা বেশ বুঝিতে পারিতেছ। এখন আমাদের নিতান্ত অনুরোধ, ঐ সকল পরলোকের সংবাদ জানাইয়া আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার চেষ্টা করিবে।

'পরলোকের কথা' লিখিতেছি শুনিয়া একদিন তুমি কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে; আবেশভরে বলিয়াছিলে,—"কত শত নরনারী প্রিয়বস্তু হারাইয়া শোকে অভিভূত হইয়া দিবানিশি হা-হুতাশ করিতেছেন। তোমার 'পরলোকের কথা' পাঠ করিয়া যদি তাঁহারা দগ্ধ-হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও শান্তিলাভ করিতে পারেন, তদপেক্ষা অধিক কল্যাণকর কার্য্য আর কি হইতে পারে?"

ছোটকাকা, তোমার শ্রীমুখের সেই মধুর বাণী আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। তোমার সেই শুভ-ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি; জানি না, কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি। তবে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, শ্রীভগবানের কৃপায় ও তোমার আশীর্ব্বাদে, যদি কোন শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি কিছুমাত্রও শান্তি লাভ করেন, তবে আপনাকে পরম ভাগ্যবান মনে করিব।

ইচ্ছা ছিল গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া তোমার শ্রীকরকমলে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব। কিন্তু তাহা হইল না,—তুমি ততদিন অপেক্ষা

করিতে পারিলে না, তাহার পূর্ব্বেই এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলে। আজ তোমার এই ধরাধামে আগমনের শুভমাসের শুভদিন; এই শুভতারিখে তোমার পবিত্র আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম। (১)

বাগবাজার, কলিকাতা।
১৭ই পৌষ, ১৩৩৯।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

---

(১) ১২৬৬ সালের ১৭ পৌষ গোলাপবাবুর জন্ম-তারিখ

পরলোকের কথা

প্রথম অধ্যায়

আমাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ

সে আজ প্রায় ৭৫ বৎসরের কথা। তখন আমরা আমাদের পল্লী-ভবন পলুয়া-মাগুরায় (আধুনিক অমৃতবাজারে) বাস করি। সে সময় সকল বিষয়েই আমাদের সুখের অবস্থা। আমার প্রপিতামহ পদ্মলোচন ঘোষ জীবিত। তাঁহার তিন পুত্র ও চারি কন্যা বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠপুত্র হরিনারায়ণ যশোহরে ওকালতি করেন; উপার্জ্জনও বেশ হয়। বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারমাসে তের পার্ব্বণ হইয়া থাকে। গ্রামে অনেকেরই অবস্থা বেশ সচ্ছল। অনেকেই নীলকুঠিতে, জমিদার-সরকারে বা সরকারী আদালতে চাকুরী করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করেন; কিছু গাতি-জমা ও খাস-খামার প্রায় সকলেরই আছে। কাজেই মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের অভাব অনেকেরই অনুভব করিতে হয় না। ঘোষেদের বাড়ীতে নিত্যই উৎসব, নিত্যই একশত পাতা পড়ে। আমার পিতামহ হরিনারায়ণ প্রত্যেক শনিবারে কাছারীর পর পাল্কী করিয়া বাড়ী আসেন। গান-বাজনায়, দাবা-পাশা খেলায়, গল্প-গুজবে, আমোদ-আহ্লাদে বেশ সময় কাটিয়া যায়।

পদ্মলোচন্ ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাত্‌নি, আত্মীয়-স্বজন লইয়া বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ

বিনামেঘে বজ্রপাত হইল,—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরিনারায়ণ সামান্য কয়েক দিনের অসুখে, ৫৪ বৎসর বয়সে, মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিবারের মধ্যে ও গ্রামে একটা ঘোর বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল।

আমার পিতামহী অমৃতময়ী নয় বৎসর বয়সে শ্বশুরালয়ে আসিয়া সংসার করিতে আরম্ভ করেন। আটটি পুত্র, তিনটি কন্যা, তিনটি পুত্রবধূ ও দুই তিনটি পৌত্র-দৌহিত্র রাখিয়া হরিনারায়ণ গোলোকগত হইলেন। আমার পিতামহী এ পর্য্যন্ত শোক-দুঃখের মুখ দেখেন নাই,—এই তাঁহার প্রথম শোক। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বগুণান্বিত স্বামীকে হারাইয়া তিনি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মাতৃভক্ত সন্তানেরা জননীর শোকভার লাঘব করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার পঞ্চম পুত্র হীরালাল ছিলেন মাতৃগতপ্রাণ। মাতাঠাকুরাণীর শোকসন্তপ্ত অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি দিবানিশি মাতার কাছে থাকিয়া,—একরূপ আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া,—নানা প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হীরালালের হৃদয় ছিল অতিশয় কোমল। জীবের দুঃখ-কষ্ট দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন, তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু সকল সময় আপন ইচ্ছানুসারে তাহাদের সাহায্য করিতে পারিতেন না। সেই জন্য কখনও কখনও আবেগ ভরে বলিতেন,—"জীবের দুঃখ দূর করিতে যদি নাই পারিলাম, তবে বাঁচিয়া ফল কি?" তাঁহার মনের এই অবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; শেষে এই জ্বালাময় জগতে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া, একদিন তিনি উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিলেন।

অমৃতময়ীর প্রথম পুত্র-শোক

১২৬৯ সালের পৌষ মাসে আমার পিতামহ হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয় পরলোক-গমন করেন। ইহার আড়াই বৎসর পরে, অর্থাৎ ১২৭২ সালের শ্রাবণ মাসে, হীরালাল আঠারো বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমার তাঁহার সম্পাদিত "হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন" নামক মাসিক পত্রে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—আমরা আট ভাই ছিলাম, এবং পরস্পরে প্রগাঢ় প্রীতি ও ভালবাসার ডোরে আবদ্ধ ছিলাম। এই সময় হঠাৎ আমাদের এক ভ্রাতার মৃত্যু হইল। ইহাতে আমাদের পরিবারের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। আমরা ভাবিলাম, এই জন্যই কি শ্রীভগবান্ মানব-হৃদয়ে এত ভালবাসা দিয়াছেন! আর, এই জন্যই কি তিনি আমাদিগকে জীবনীশক্তি দিয়া এই ধরাধামে আনিয়াছেন! ফলকথা, শৈশব হইতেই আমরা ধর্ম্মের ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম; ইহার ফলে, আমাদের স্রষ্টার অস্তিত্ব ও সহৃদয়তা সম্বন্ধে আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কাজেই, পরিবার মধ্যে এইরূপ একটী দুর্ঘটনা হওয়ায়, আমরা হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলাম। তখন মনে হইল, যদি আমাদের স্রষ্টা আমাদিগকে জীবন দান করিয়া শেষে একেবারে ধ্বংশের দিকে লইয়া যান, যদি তিনি মানব-হৃদয়ে ভালবাসা প্রদান করিয়া, শেষে বিষম-বিরহ বেদনা সহ্য করিতে বাধ্য করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর আর কেহ নাই। প্রকৃতই কোন মনুষ্যই,—অসুরের ন্যায় নিতান্ত নির্দ্দয়-নিষ্ঠুর না হইলে,—মাতৃক্রোড় হইতে দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তান ছিনাইয়া লইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ কার্য্য শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই করিতেছেন! তবে কি আমাদের

স্রষ্টা তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্য অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়? সুতরাং মৃত্যুর পরে যদি আমাদের অস্তিত্ব থাকে এবং পরলোকগত নিজজনের সহিত পুনর্মিলন হয় তো উত্তম, নচেৎ এই মরজগতে থাকিবার সার্থকতা কি? এবং তাহা হইলে এই দারুণ কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকলের একসঙ্গে ইহজীবন শেষ করা ভিন্ন আর উপায় নাই। আমাদের পরিবারস্থ সকলের মনের ভাব তখন এইরূপই হইয়াছিল। আর, দিবানিশির সঙ্গী প্রিয়তম পুত্রকে হারাইয়া সন্তানবৎসলা জননীর শোকবেগ এত অধিক বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র বসন্তকুমারকে বলিলেন, "বাবা, আমার হীরালাল যখন তাহার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে, তখন আমার এই ছার প্রাণ রাখিব না,—হীরালাল যে পথে গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।

বসন্তকুমার বলিলেন,—মা, নিজজন দূরদেশে যাইয়া বহুকাল বাস করিলে, তাহার জন্য আমরা শোক করি না কেন? তাহার এক মাত্র কারণ, তাহার সহিত আমাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সেইরূপ যদি আমরা জানিতে পারি, মৃত্যুর পর আবার আমাদের নিশ্চয় মিলন হইবে, তাহা হইলে শোক করিব কেন? আর সেরূপ অকাট্য প্রমাণ যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তুমি একা কেন, আমরা সকলেই, হীরালালের পথ অনুসরণ করিব। (১)

(১ মহাত্মা শিশিরকুমার তাঁহার সম্পাদিত 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগেজিন' নামক মাসিক পত্রে লিখিয়াছেন,—"We were eight brothers and devotedly loved one another. One of our brothers suddenly died, and this had a tremendous effect upon

ফল কথা, বসন্তকুমার ও তাঁহার ভ্রাতারা শুনিয়াছিলেন যে, আমেরিকায় এক অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার সহিত আলাপ-পরিচয় করা যায়। তাঁহারা আরও শুনিয়াছিলেন, কি প্রকারে এই কথাবার্ত্তা বলিতে পারা যায় তাহার প্রক্রিয়াদি বিস্তারিত ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল তথ্য অবগত হইবার জন্য আবশ্যক হইলে আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইবেন স্থির করিয়া, শিশিরকুমার কলিকাতায় গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর তৎকালীন সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি শিশিরকুমারের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন যে, এই সকল বিষয় জানিবার জন্য আমেরিকা বা অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন নাই, চেষ্টা করিলে এখানে বসিয়াই সফলকাম হইতে পারা যাইবে। তিনি শিশিরকুমারকে

---

the entire family. Was it for this that God implanted love in the human breast? Was it for this that He gave life? The fact was, we were trained under religious principles, and had a strong faith in the existence and goodness of our Creator. Our faith in God received a rude shock when the incident happened. If God gave life and love to man and then destined man for annihilation, if He implanted love in the human breast and destined man to suffer the severe pangs of bereavement, He must be the most cruel Being in existence. Surely a man, unless he were a monster, would never snatch a child from the bosom of its mother. This God was doing constantly; was God more cruel

লাইব্রেরীর সভ্য করিয়া লইয়া, তাঁহাকে আধ্যাত্মিক-বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকাদি পড়িতে দিলেন। কি প্রকারে চক্রে বসিতে হয়, কি প্রকারে মুক্তাত্মাকে আহ্বান করিতে হয়, কি প্রকারে মেস্‌মেরাইজ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয় শিশিরবাবু এই সকল গ্রন্থপাঠে অবগত হইলেন। প্যারীচাঁদবাবু পূর্ব্ব হইতে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার নিকটও শিশিরবাবু এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিলেন। (১) শেষে তিনি গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

---

than His creation, man? If there was survival and reunion after death it was all right, otherwise what was the use of living at all? Let the entire family put an end to their lives once for all, and put an end to their misery. Thus the entire family felt in the anguish of their soul."

(১) বিগত ১৯১৬ সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের ৩০শ বার্ষিক শোকসভায় মতিলাল ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"For some domestic affection my late lamented brother, Sisir Babu, thought of starting for America to learn the modern art of occultism direct from the spiritualists there. He met Peary Chand Babu in the Calcutta Public Library to consult with him. Peary Babu gave him some verbal instructions as how to form circles etc. and some books to read and advised him that it is not necessary for any person to go anywhere but we can succeed if we practise here.

আমাদের পারিবারিক চক্র

গৃহে ফিরিয়া শিশিরবাবু চক্রে (সারকেলে) বসিবার আয়োজন করিলেন। একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে চক্রে বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই ঘরে একটি গোল-টেবিলের চারি পার্শ্বে বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল, মাতা ও ভগিনীদের সহ পরস্পর হস্তস্পর্শ করিয়া বসিলেন। অপর কেহ ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে, এইজন্য বসিবার পূর্ব্বে কপাট বন্ধ করা হইল।

দারুণ শোক পাইয়া তাঁহাদের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চক্রের ফলাফলের উপর তাঁহাদের পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ্য, এমন কি, জীবন-মরণ পর্য্যন্ত নির্ভর করিতেছিল। পরলোক ও আত্মার অস্তিত্ব যদি সপ্রমাণ হয়, উত্তম, নচেৎ তাঁহারা সকলেই জীবন বিসর্জ্জন দিবেন, ইহাই ছিল তাঁহাদের সঙ্কল্প। মনের এই সংকল্প লইয়া তাঁহারা কাতরকণ্ঠে এক মনে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা তখন ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন; তাই তাঁহারা প্রথমে নিম্নলিখিত প্রার্থনা-সঙ্গীতটী গাহিলেন—

টোড়ি-ভৈরবী—আড়ঠেকা।

কোথাহে, কোথাহে, কোথা নাথ দয়াময়!
কত আর দুঃখার্ণবে ভাসিবহে নিরাশ্রয়।
কবে পাব তব চরণ,
বিষাদে দহে জীবন,
হৃদি কাঁদে অনুক্ষণ,
নাহি হেরে হে তোমায়॥

তৎপরে, তাঁহাদের হারানিধিকে উদ্দেশ করিয়া গাহিলেন -

কাফি—আড়াঠেকা।

আহা কে আনিয়া দিবে তারে;
হারায়ে জীবন-রতনে, জীবনে কি কাজ আমার।
ঐহিকের সুখ যত, জানি তা'—কাজ নাই সে সুখে, সে ধনে,
হারায়ে জীবন-রতনে, জীবনে কি কাজ আমার॥

কিছুক্ষণ পরে শিশিরবাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"এখানে যদি কোন আত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে কোন রকমে তাহা আমাদের অবগত করুন।

এই কথা বলিবামাত্র ঘরের মেঝের উপর একটা টোক্কার শব্দ হইল। শব্দ শুনিয়া সকলে চম্‌কিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই সকলের মনে হইল,—এই শব্দ কে করিল? বাহির হইতে কেহ করিতে পারে না, কারণ কপাট বন্ধ। আবার যাঁহারা চক্রে বসিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কাহার ঐ শব্দ করা সম্ভবপর নহে; কারণ যে স্থানে শব্দ হইল তাহা টেবিল হইতে দূরে ছিল এবং তখন সকলে পরস্পরের হস্ত স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিলেন। বিশেষতঃ সে সময় তাঁহাদের যেরূপ মনের অবস্থা, তাহাতে কোনরূপ তঞ্চকতা করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহাদের হইতে পারে না। তবে কোন অদৃশ্য-শক্তির প্রভাবে এই শব্দ হইল নাকি?—এই প্রশ্ন সকলের মনেই উদিত হইল।

পরদিবস যথা সময়ে ও যথা নিয়মে তাঁহারা পুনরায় চক্রে বসিলেন। প্রথমে গাহিতে লাগিলেন,—

খাম্বাজ—আড়া।

আমার আর কেহ নাই।
তোমারে হৃদয়ে রেখে এ প্রাণ জুড়াই॥

তোমা বিনা সব শূন্য,
এ সংসার অরণ্য,
কে আছে আর তোমা ভিন্ন,
কার পানে চাই ॥

তারপর আর একটি গাহিলেন, যথা—

এ প্রাণ ধরি, আমি বল্‌তে নারি,
যে দুঃখেতে, তোমা, নাথ!
মন প্রাণ, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন,
কেমনে তোমা বিনা ধরি এ জীবন, নাথ!
বল্‌ব কি আর, আমি বল্‌তে নারি,
আমার ঘুচাও দুঃখ দয়া করি, নাথ!

সে দিন 'চক্রে' উল্লেখযোগ্য কিছুই হইল না। কিন্তু তাঁহারা হতাশ হইলেন না;—শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া নিরস্ত হইবেন না, ইহাই ছিল তাঁহাদের দৃঢ়সঙ্কল্প।

মতিলালের আবেশাবস্থা

দুই দিবস চক্রে বসিয়া কোন ফল না হওয়ায় তাঁহারা কতকটা ভগ্নোৎসাহ হইলেন বটে, কিন্তু তবুও তৃতীয় দিবস তাঁহারা সন্ধ্যার পরেই আবার চক্রে বসিলেন। তৎপরে মনঃসংযম করিয়া আকুল-কণ্ঠে এই গীতটি গাহিতে লাগিলেন—

প্রভু দয়াল! সাধু মুখে আমি শুনেছি।
অকুল পাথারে পড়ে ডাক্‌তেছি ॥

আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও কেশে ধরি,
আমি আশা করি চেয়ে রয়েছি।
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়াল ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি।
তুমি করিয়ে অধম-তারণ, নাম ধর পতিত-পাবন,
অধম জন হ'তে তাহা জেনেছি ॥
করিতে পতিত উদ্ধার, প্রকাশ হয়েছ এবার।
মোর সমান পতিত প্রভু কোথা পাবে আর ॥
প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা এম্নি কি হয়,
আমি ভবার্ণবে ডুবে রয়েছি ॥

তারপর হারানিধিকে চক্রে পাইবার জন্য প্রাণ উগাড়িয়া গাহিলেন,—

কোথা হারালাম আমি অতি যতনের ধন।
যার লাগি দিবানিশি করিগো রোদন ॥
ভেবেছিলাম হেথা আসি লভিব সে ধন।
নাহি কি আমার হবে সে আশা পূরণ ॥
তাই বলি কৃপা করি অনাথ-শরণ।
আনিয়ে মিলায়ে দাও হারাণো রতন ॥

এই সময় মতিলাল সজোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং তাঁহার হস্তদ্বয় অল্প-অল্প কাঁপিতে লাগিল।

তখন মতিলালের বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার শরীরে একটা অবসাদের ভাব আসিতেছে, এবং মনের মধ্যে কি একরূপ আবেগের সঞ্চার হইতেছে। ক্রমে তাঁহার হস্তদ্বয় সজোরে কাঁপিতে লাগিল, এবং মনে হইতে লাগিল যেন কোন অদৃশ্য-শক্তি তাঁহার দেহ ও মন অধিকার

শিশিরকুমার ঘোষ

৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

১৭ই পৌষ ১৩১৭ সাল (ইং ১০।১।১১)

[পৃঃ—১০

মতিলাল ঘোষ

৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

১৯শে ভাদ্র ১৩২৯ সাল। ইং ৫।৯।২২

করিয়া ফেলিতেছে; এমন কি, তখন তাঁহার কিছু ভাবিবার বা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতেছে। ক্রমে তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস গাঢ় হইয়া আসিল এবং হস্তদ্বয় অধিক বেগের সহিত বিক্ষোভিত হইতে হইতে ক্রমে তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। শেষে তাঁহার মনের আবেগ এত প্রবল হইল যে, তিনি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন শিশিরবাবু বলিলেন,—সম্ভবতঃ মতির উপর কোন আত্মার ভর হইয়াছে; কারণ পুস্তকে আছে যে, আবেশ অবস্থায় মিডিয়মের অবস্থা ঐরূপ হইয়া থাকে। ইহাই বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে?

তখন মতিলালের ভাব দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইতেছে না। ইহার ফলে, তাঁহার মনের উদ্বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। কাহারও উপর আত্মার ভর হইলে, আবিষ্ট ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা হয়, পুস্তকে লেখা থাকিলেও তাহা এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহই চাক্ষুষ দেখেন নাই। কাজেই তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া সকলে ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া, তাঁহার চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া ও পাখার বাতাস করিয়া ক্রমে তাঁহাকে সহজ অবস্থায় আনা হইল।

মতিলাল সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আবেশ অবস্থায় তিনি কিরূপ বোধ করিতেছিলেন?

তিনি বলিলেন,—প্রথমে আমার দেহে একটা অবসাদের ভাব আসিতে লাগিল। ক্রমে হৃদয়ের মধ্যে আবেগের সঞ্চার অনুভব করিতে

লাগিলাম। তারপর দেহ ও মনের উপর আমার আধিপত্য ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল,—কোন কিছু করিবার, এমন কি ভাবিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও রহিল না। তখন বোধ হইল, কোন অদৃশ্য-শক্তি যেন আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া করুণ-কণ্ঠে কাঁদিতেছে। সেই কান্না শুনিয়া আমিও স্থির থাকিতে পারিলাম না—কাঁদিতে লাগিলাম। শেষে মনে হইতে লাগিল,—সেই অদৃশ্য-শক্তি যেন কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না। এইজন্য মনের আবেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং শেষে চেতনা একরূপ লোপ পাইল। তখন আমার নিজের স্বাধীন ভাব কিছুমাত্র রহিল না।

প্রশ্ন। কি কথা বলিবার চেষ্টা হইতেছিল, তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছিলে?

উত্তর। না, তা' কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

হীরালালের আত্মার আবির্ভাব

চতুর্থ দিবস নিয়মিতভাবে চক্রে বসিয়া ২।৩টী প্রার্থনা-সঙ্গীত গাহিবার পরেই মতিলালের দক্ষিণহস্ত অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। এই কয়েক দিনের অভিজ্ঞতার ফলে বুঝা গেল, তাঁহার উপর কোন আত্মার ভর হইয়াছে এবং তিনি যেন কিছু লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন। তখন তাঁহার কম্পিত-হস্তে পেন্সিল দিবামাত্র হাত সজোরে নড়িতে লাগিল, এবং কাগজের উপর হিজিবিজি কাটা হইতে লাগিল। ক্রমে অস্পষ্টভাবে হীরালালের নাম লেখা হইল। হীরালালের নাম দেখিয়া সকলেরই শোকবেগ উথলিয়া উঠিল,—তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এই সময় মতিলালের হাত আরও জোরের সহিত কাঁপিতে থাকায়, হাত হইতে পেন্সিল পড়িয়া গেল এবং ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন তাঁহার সম্পূর্ণ আবিষ্ট অবস্থা। সেই অবস্থায় তিনি মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিলেন এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে মা—মা—আমি—আমি—হীরালাল বলিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহার তখন চক্ষু মুদ্রিত, অৰ্দ্ধ-চেতনাবস্থা; সেই অবস্থায় তিনি হীরালালের কণ্ঠের স্বরে, সেইরূপ হাবভাব সহকারে, যখন বলিলেন,—মা! আমি হীরালাল, তখন সকলেরই মনে হইল, হীরালালই কথা বলিতেছেন। **তবে তো হীরালাল আছেন**!—এই কথা মনে হইবামাত্র সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। সেই আবেশাবস্থায় মতিলাল যখন সকলের চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন, তখন—তাঁহাদের হারাণো ধন আবার পাইয়াছেন, তাঁহার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই, তিনিই তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছেন,—মনে এই ধারণা হওয়ায়, তাঁহাদিগের শোকবেগ প্রথমে বৃদ্ধি পাইলেও ক্রমে উহা কমিয়া আসিল, এবং তখন তাঁহারা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া যেন প্রাণ পাইলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনের এই ভাব স্থায়ী হইল না। কারণ চক্র হইতে উঠিয়া যখন তাঁহারা এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন সন্দেহ আসিয়া তাঁহাদের মন জুড়িয়া বসিল। তখন তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহারা যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহা কি প্রকৃত, না তাহাদের মনের বিকার মাত্র? ইহাই হইল শ্রীভগবানের এক প্রহেলিকা। ফল কথা, যাঁহারা পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আবার পাইব, এই ধারণা যাঁহার মনে বদ্ধমূল হয়, তাঁহাকে পার্থিব শোকদুঃখ অভিভূত করিতে পারে না,—তিনি একরূপ সিদ্ধপুরুষ হইয়া যান। এই

সৌভাগ্য সকলে লাভ করিতে পারিলে, ইহজগত স্বর্গে পরিণত হইত। তবে সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হয় না। ইউরোপ ও আমেরিকায় সাধনা করিয়াই লোকেরা এতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

মিডিয়ম কতকটা সুস্থির হইলে, হীরালালকে উদ্দেশ করিয়া পরলোক সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল এবং মিডিয়মের হাত দিয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তর লেখা হইল। হীরালাল লিখিলেন,—আমি বাবার কাছে আছি। পৃথিবী হইতে এই স্থান সহস্র গুণে উত্তম। এখানে এখনও শ্রীভগবানের কিংবা যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন এরূপ কোন ভাগ্যবান্ পবিত্র পারলৌকিক-মূর্ত্তির দর্শন পাই নাই। এখানে এরূপ প্রেতাত্মাও আছে, যাহারা এই চিন্ময়-জগতে আসিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় পশুবৎ আচরণ করিতেছে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না।

হেমন্তকুমারের আবিষ্ট ভাব

এই ভাবে চক্রে বসা প্রত্যহই চলিতে লাগিল। ক্রমে আমার পিতা হেমন্তবাবু মিডিয়ম হইলেন। মতিবাবুর উপর আত্মার আবির্ভাব হইলে তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িতেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ হস্তদ্বয় প্রবলবেগে স্পন্দিত হইত,—তিনি দারুণ কষ্ট প্রকাশ করিতেন, আবার অনেক সময় একেবারে অচেতন হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইত।

কিন্তু হেমন্তবাবুর উপর আত্মার আবির্ভাব হইলে সেরূপ কিছুই প্রকাশ পাইত না; তিনি যে কোন আত্মা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাও তাঁহার হাবভাব দেখিয়া বুঝা যাইত না; তিনি ধীর ও স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেন,—কেবলমাত্র তাঁহার দক্ষিণ-হস্তখানি মৃদুমৃদু

কাঁপিত। তখন তিনি পেন্সিল লইয়া কাগজের উপর অনর্গল লিখিয়া যাইতেন। অনেক সময় এরূপ দ্রুতগতিতে লিখিতেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে দিস্তা দিস্তা কাগজ লেখা হইয়া যাইত।

হেমন্তকুমার যখন অনর্গল অথচ স্থিরভাবে লিখিয়া যাইতেন, তখন তাঁহার ভাব দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিতেন না যে, কোন আত্মা তাঁহার উপর ভর করিয়া লেখাইতেছেন। অবশ্য তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত, ধর্ম্মপ্রাণ ও শোকসন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনরূপ তঞ্চকতা করা যে আদৌ সম্ভবপর নহে তাহা বলাই বাহুল্য। তবুও তাঁহাকে সেই অবস্থায় ঐরূপভাবে লিখিতে দেখিলে, উহা যে কোন আত্মা কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে,—তাহা হঠাৎ কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু ক্রমে পরলোক ও আত্মা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতেরা যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলেন, এবং ইহার কয়েক বৎসর পরে সুবিখ্যাত ষ্টেড সাহেবের হস্ত আশ্রয় করিয়া মিস্ জুলিয়াসের আত্মা যখন অনেক পারলৌকিক ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন এই স্বৈরলিপি (Automatic writing) অবিশ্বাস করিবার আর কোন কারণ রহিল না।

হেমন্তকুমারের মিডিয়মের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার উপর উচ্চস্তরের অনেক পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হইত। তাঁহাদের দ্বারা অনেক নূতন পারলৌকিক-তথ্য লিখিত হইয়াছিল। কোন আত্মা লিখিয়াছিলেন যে, ইহজগতে আমরা যে সকল পাপ করি, পরলোকে যাইয়া তজ্জন্য যে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহা কবির কল্পনা নহে। এই মর-জগতে পীড়া যেমন মানব-দেহকে যন্ত্রণা দেয়, পর-জগতে যাইয়া পারলৌকিক-দেহকে সেইরূপ পাপের ফল ভুগিতে হয়। অনেক সময় তাহাদের সেই অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া আতঙ্ক উপস্থিত

হয়। যাহারা এই পৃথিবীতে নানারূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে করিতে পার্থিব-দেহ ত্যাগ করে, তাহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবীর আকর্ষণ ছিন্ন করিতে পারে না; এবং যতকাল তাহারা পাপকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত না হয়, অথবা তাহাদের মুক্তিলাভের জন্য কেহ গয়ায় পিণ্ড না দেয়, কিংবা এরূপ কোন প্রক্রিয়া না করে যাহাতে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তাহারা উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, ততকাল সেই সকল প্রেতাত্মা এই মর-জগতে সূক্ষ্মশরীরে বিচরণ করে, এবং কখন বা কোন মানব-দেহ আশ্রয় করিয়া নানারূপ অত্যাচার করিয়া থাকে। এইরূপ ভৌতিক ব্যাপার যখন তখন যেখানে সেখানে ঘটিতে দেখা যায়। আবার যাহারা নানারূপ পাপকার্য্য করিয়া অনুতপ্ত না হইয়া, বরং ইহার জন্য গৌরবান্বিত বোধ করে এবং তাহাদিগের কৃত পাপকার্য্যের জন্য শ্রীভগবানকে দায়ী করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনাতীত।

একদিন হেমন্তবাবুর হাত দিয়া উর্দ্দু লেখা বাহির হইল। তিনি কিংবা আমাদের পরিবারস্থ বা গ্রামস্থ কেহই উর্দ্দু লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না। আমাদের গ্রামের পার্শ্বে মিশ্রীদেয়ারা গ্রামে মীর হবিবর শোভাহান নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত মুসলমান বাস করিতেন। তাঁহার নিকট ঐ লেখা পাঠাইলে তিনি উহার পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিতের প্রথম খণ্ডের উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছেন,—"মেজদাদা মহাশয় (হেমন্তবাবু) কখন কখন আবিষ্ট হইতেন ও সেই অবস্থায় আমাকে পত্র লিখিতেন। সে সমুদায় পত্রগুলি যেন কেহ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া লেখাইতেন। আমি তাঁহার সেই আবিষ্ট অবস্থার আদেশগুলি বড় মান্য করিতাম।

একদিন তাঁহার এইরূপ একখানি পত্র আসিল। আমি তখন হাঁসখালি গ্রামে চুরণী নদীর ধারে একটী বাটীতে সপরিবারে বাস করিতেছিলাম; আর মেজদাদা আমাদের পল্লীভবন অমৃতবাজারে থাকিতেন। তখন বিকাল বেলা প্রায় ছয়টা। আমি একটী ঘরে একলা বসিয়া আছি। মেজদাদার পত্রখানি পাইবামাত্র খুলিলাম। তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহার ভাবার্থ এই,—শিশির! কোন দেবতা—তাঁহাকে আমি চিনি না—আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিলেন,—তোমার কনিষ্ঠ শিশির, ওটি শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস। তাঁহার দ্বারা মহাপ্রভু অনেক কার্য্যসাধন করিবেন।......আমার এখন বোধ হয় যে, সেই পত্রখানি দ্বারা মেজদাদা আমাতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন।"

ক্রমে আমার বড়পিসিমা (স্থিরসৌদামিনী), মেজপিসিমা (নীলকাদম্বিনী) এবং আমাদের পরিবারস্থ আরও কয়েকজন মিডিয়ম হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও হাত দিয়া লেখা বাহির হইতে লাগিল, কেহ বা কথা বলিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিলেন, কাহারও বা চোখ খুলিয়া গেল অর্থাৎ চক্ষু বুঁজিয়া পরলোক ও মৃতব্যক্তিদিগকে দেখিতে ও তাহাদের সহিত মনে মনে কথার আদান প্রদান করিতে লাগিলেন। আবার কেহ বা মেস্‌মেরাইজ বা হিপ্‌নোটাইজ করিয়া অপরের দেহ হইতে আত্মা বাহির করিয়া, সেই আত্মাকে ইহলোক ও পরলোকের নানাস্থানে বিচরণ করাইবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিলেন। কেহ আবার আরোগ্যকারী বা হিলিং মিডিয়মের ক্ষমতা লাভ করিয়া দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে রোগীকে মুক্ত করিতে লাগিলেন।

আমাদিগের পারিবারিক-চক্রে কত কবিতা, কত গান, কত ধর্ম্মকথা, পরলোক সম্বন্ধে কত নূতন তথ্য উচ্চস্তরের মুক্তাত্মাদিগের

নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল এবং লিপিবদ্ধ করিয়াও রাখা হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নানা কারণে ক্রমে সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমাদের 'চক্রে' সকল শ্রেণীর আত্মারই আবির্ভাব হইত। সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর আত্মার ভর হইলে, হাত পা ছোড়া, চীৎকার করা, কদর্য্য ভাষায় গালি দেওয়া, প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা মিডিয়মের কষ্টের একশেষ হইত। কচিৎ কখন ভগবানের নাম শুনিয়া এই শ্রেণীর প্রেতাত্মা মিডিয়মকে ছাড়িয়া যাইত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ইহাদিগকে তাড়ান বিশেষ কষ্টসাধ্য হইত। তখন মিডিয়মকে খোলা-হাওয়ায় আনিয়া, চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া, অনেক কষ্টে প্রেতাত্মার কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইত।

কিন্তু উচ্চশ্রেণীর আত্মার আবির্ভাব হইলে, মিডিয়মের কোনরূপ কষ্ট হইত না, বরং চক্রে উপস্থিত সকলেই বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন। কখনও বা মিডিয়মের মুখ দিয়া এমন মধুর সঙ্গীত বাহির হইত, যাহা শুনিয়া সকলেই তন্ময় হইয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে "হরিদাস" নামধারী এক উচ্চশ্রেণীর পবিত্র আত্মা আসিয়া কীর্ত্তনানন্দে সকলকে মোহিত করিয়া তুলিতেন। আমরা কোন নূতন শোক পাইয়া চক্রে বসিলেই, হরিদাস আসিয়া এমন আনন্দের ঢেউ উঠাইতেন যে, শোক ভুলিয়া আমরা বেশ শান্তিলাভ করিতাম। সাধারণতঃ আমার বড়পিসিমা স্থিরসৌদামিনীর উপরই তাঁহার ভর হইত। একদিন তাঁহার উপর ভর করিয়া হরিদাস একটি সুন্দর গান সুর করিয়া গাহিয়াছিলেন; তাহার কতকাংশ এখনও আমার স্মরণ আছে। যথা :—

"কি আনন্দে ভাসিছে হৃদয়।
আনন্দেতে মন মেতেছে, হচ্ছে কত ভাবোদয়।
সে ভাবের ভাবুক যারা, সেই আনন্দে ভেসে যায়॥" ইত্যাদি।

হেমন্তকুমার ঘোষ

৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

৯ই চৈত্র ১২৯৮ সাল। ইং ২১।৩।৯২

পরিমলকান্তি ঘোষ
৩৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন
১৮ই শ্রাবণ ১৩৩০ সাল (ইং ৩।৮।২৩

পৃঃ—১৯

কখনও কখনও এরূপও দেখা গিয়াছে যে, কোন আত্মার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়মের মুখ দিয়া মৃতব্যক্তির কণ্ঠস্বর, কথার উচ্চারণ, মুখের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হাবভাব এরূপ পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাইত যে, দূর হইতে শুনিয়া মনে হইত যেন মৃতব্যক্তিই কথা কহিতেছেন। কখনও কোন অজানিত মৃতব্যক্তির আত্মা আসিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেন। পরে অনুসন্ধান করিয়া অনেক স্থলেই উহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইত।

আমাদের পারিবারিক-চক্রে মৃতব্যক্তিদিগের আত্মার আবির্ভাব হইতেছে এবং তাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন,—এই সংবাদ ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহার ফলে অনেক শোকসন্তপ্তা রমণী আপনাদের মৃত-আত্মীয়গণের সংবাদ জানিবার জন্য আমাদের চক্রে যোগদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরলোকগত নিজজনদিগের আত্মা আসিয়া, মিডিয়মের উপর ভর করিয়া, যখন কথাবার্ত্তা বলিতেন, তখন মৃতব্যক্তির আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই আর কোন সন্দেহ থাকিত না; এবং তাঁহাদের অনেকে শোক দুঃখ ভুলিয়া মনে বেশ শান্তিও পাইতেন।

একদিন একটী স্ত্রীলোক তাঁহার কোন মৃত-স্বজনের সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন। তিনি স্থিরভাবে একপার্শ্বে বসিয়া চক্রের কার্য্যাবলী দেখিতেছেন, এমন সময় তাঁহার দেহ ভারবোধ হইতে এবং ক্রমে হাত কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তিনি এই কথা প্রকাশ করেন নাই। শেষে যখন কিছুতেই ইহা নিবারিত হইল না, বরং তাহার শরীর আরও অধিক কাঁপিতে লাগিল, তখন তিনি ভীত হইলেন, এবং ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার কাঁপুনী এত বেশী হইতে লাগিল যে, তিনি আর উঠিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার সেই মৃত-আত্মীয়ের আত্মা

তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে ভর করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে দুই একটী কথাও বলিলেন। তাঁহার শারীরিক ক্লেশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, তাঁহাকে উঠাইয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল এবং অনেক শুশ্রূষার পর তিনি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

আমার মা-জননী

ফুলকাকা হীরালালের পরলোকগমনের আট মাস পরে আমার মাতাঠাকুরাণী আমাদিগকে কাঁদাইয়া স্বর্গে যান। তখন তাঁহার বয়স উনিশ এবং আমার সাড়ে পাঁচ বৎসর। আমি মাতার একমাত্র সন্তান। আমার বয়স যখন প্রায় পাঁচ বৎসর তখন মাতাঠাকুরাণীর পুনরায় গর্ভ-সঞ্চার হয়। আমি আমাদের মাগুরার বাটীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রসব হইবার জন্য মাকে তাঁহার পিত্রালয়ে লইয়া যাওয়া হয়, আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া কিছুকাল পরে মা পীড়িত হন এবং সেই অবস্থায় আট মাসে একটী মৃতাকন্যা প্রসব করেন। সে ধাক্কা মা সামলাইতে পারিলেন না,—প্রসব হইবার কয়েকদিন পরেই আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার শবদেহ দাহ করিবার জন্য শ্মশান-ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইলে, তাঁহার মুখাগ্নি করিবার জন্য আমাকেও সেখানে যাইতে হইয়াছিল। মুখাগ্নি করিবার সময় মার মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, মা আমার যেন শান্তিদেবীর ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন—তাঁহার বদনে মৃত্যুর ছায়ামাত্রও স্পর্শ করে নাই। তাঁহার সেই সুন্দর সরল প্রেমভক্তিপূর্ণ মুখখানি এখনও জাজ্বল্যভাবে আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

মাতার মৃত্যুর পর পিতৃদেব আমার মাতুলালয়ে যাইয়া আমাকে

ও আমার দিদিমাকেঅমৃতবাজারের বাটীতে লইয়া আসিলেন। সে সময় আমাদের বাটীতে নিয়মমত চক্রে বসা হইত। আমার দিদিমাও ঐ চক্রে বসিতেন। একদিন মার আত্মা আসিয়া বড়পিসিমার উপর ভর করিলেন। আমি তখন অন্যান্য বালকদিগের সঙ্গে বাহিরে খেলা করিতেছিলাম। যে ঘরে চক্রে বসা হইয়াছিল, সেখানে আমাকে আনা হইল। আমি আসিবামাত্র বড়পিসিমা আবিষ্ট অবস্থায় আমাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন। তখনও আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ক্রমে তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল। সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। এ যে আমার চির-পরিচিত স্বর! এ যে আমার স্নেহময়ী মাতার সেই সুমধুর আদরের ডাক! ঠিক মা যেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন! মার গলার স্বর শুনিয়া কেবলই ইচ্ছা হইতে লাগিল, মাকে বলি,—মা, তুমি আর যেও না, এখানে থাক, তোমাকে না দেখ্‌লে যে আমার বড় কষ্ট হয়। কিন্তু আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না,—আমি বড়পিসিমার কোলের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন বড়পিসিমা দুইখানি হাত দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমার কিন্তু মনে হইতে লাগিল, মা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। তারপর, মা যে ভাবে আমাকে আদর করিতেন, ঠিক সেই ভাবে বলিলেন,—ছি! কেঁদ না, এইত আমি আসিয়াছি—বলিতে বলিতে তাঁহার গলার স্বর ভারি হইয়া আসিল, দুই চারি ফোটা চক্ষের জল আমার গায়ে পড়িল। ইহাতে আমার মনের বেগ এত বেশী হইল যে, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখন দিদিমা আমাকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে আনিয়া শান্ত করিতে লাগিলেন।

আমাদের চক্রে মাঝে মাঝে এই গানটী গাওয়া হইত :—

ঐ বুঝি আমার মাতা এলেন ॥ ধ্রু ॥
মা তুমি ছিলে গো কোথায় ?
কত কেঁদেছি মা মা বলে,
তা' কি শুনেছ মা ?

এই গানটী শুনিলেই মার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তিনিও যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া কোন মিডিয়মের উপর ভর করিতেন এবং আমাকে মিডিয়মের কোলের কাছে আনিয়া কত আদর করিতেন, কত বুঝাইতেন ; শেষে আমরা মাতা-পুত্রে কাঁদিয়া মনের বেগ লাঘব করিতাম। ইহার কয়েক বৎসর পরে, একদিন আমার নূতনকাকা রামলাল আমাকে মেস্‌মেরাইজ করেন। সেই দিন মাকে বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার সেই স্নেহমাখা মুখখানি এখনও স্মরণ হইলে হৃদয় আবেগে ভরিয়া উঠে।

বসন্তকুমারের মহাপ্রস্থান

আমার মাতাঠাকুরাণীর পরলোক-গমনের এক বৎসর পরে আমার জ্যেঠামহাশয় বসন্তকুমার ইহসংসার ছাড়িয়া অমরধামে গমন করেন। তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর। তিনি শৈশব হইতেই শ্বাসরোগে ভুগিতেছিলেন। শেষে ইহা ক্ষয়রোগে পরিণত হয়। এই ভগ্নদেহে তিনি আপন ভ্রাতা, ভগিনী ও পরিবারস্থ অপর সকলকে লইয়া একটী আদর্শ পরিবার গঠন করেন। আমার বড়পিসিমা স্বর্ণসৌদামিনী "আমাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ" নামক পুস্তকে

লিখিয়াছেন,—"আমাদের মধ্যে যদি কাহারও কিছু ধর্ম্মভাব ও সৎপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সে আমার দাদার (বসন্তকুমারের) প্রসাদাৎ।" মহাত্মা শিশিরকুমার শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিতের দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহার দাদা বসন্তকুমারকে উৎসর্গ করেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমার দাদাকে আমি ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তোষের জন্য আমি শতবার প্রাণ দিতে পারিতাম। কাদা দিয়া যেমন পুতুল গড়ে, তিনি আমাকে সেইভাবেই গড়িয়াছিলেন। আমার দাদা ভগবদ্ভক্তিতে জর-জর ছিলেন। একদিন তিনি নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার নিজ-কৃত এই গীতটি গাহিতেছিলেন :—

আমার বন্ধু কত রস জানে। ধ্রু
আমি মনেতে ধরিতে নারি, বর্ণিব কেমনে॥
আমি যখন চেতন থাকি, তাঁহারি করুণা দেখি,
(আমি) তাঁহারি করুণা ভুঞ্জি নিশির স্বপনে॥

দাদা গাহিতেছেন, আর তাঁহার বদন বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। এমন সময় আমি হঠাৎ সেখানে আসিলাম এবং দাদার চক্ষে জল দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—দাদা, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? দাদা অমনি যেন লজ্জা পাইয়া নয়ন মুছিয়া মস্তক অবনত করিলেন। আমি আবার ঐকথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—আর একটু বড় হও, তখন বুঝ্‌বে।

দাদার দেহ তাঁহার মানসিক শ্রম ও হৃদয়ের বেগ সহ্য করিতে পারিল না; অল্পকাল মধ্যে দেহ ভগ্ন হইয়া পড়িল। এই সময় একদিন আমরা দুই ভাই দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, হঠাৎ দাদা কাসিয়া সম্মুখে কাস ফেলিলেন। আমি কথায় বিভোর ছিলাম, সেদিকে

লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ দেখিলাম, দাদা পা দিয়া সেই কাস ঢাকিলেন। ইহাতে আমার মনে হইল, পাছে আমি দেখিতে পাই সেই জন্যই দাদা উহা ঢাকিয়াছেন।

আমি অমনি সেখানে বসিয়া পড়িলাম এবং দাদার পা ধরিয়া বলিলাম,—তুমি পা সরাও, আমি কাস দেখিব। দাদা পা সরাইতে চাহেন না দেখিয়া ব্যাপারখানা কি বুঝিলাম; তখন আমার ভুবন অন্ধকার হইয়া আসিল। দাদা তখন ধীরে ধীরে বলিলেন,—দেখিবে কি, ও রক্ত। আমি রোদন করিতে লাগিলাম।

দাদা তখন আমার অগ্রে বসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—আমি আগে আসিয়াছি, আগে যাইব, সে জন্য দুঃখ করিবে কেন? তারপর আবেগ ভরে বলিলেন,—শিশির! আমার দেহের কষ্ট এত বেশী যে, আমার এ জগৎ আর সহিতেছে না। আমি চলিয়া যাই; তুমি সচ্ছন্দ মনে আমাকে অনুমতি দাও।”

ইহার পরে ক্রমে বসন্তকুমার শয্যাশায়ী হইলেন। শেষে একদিন কনিষ্ঠ শিশিরের কোলে মস্তক রাখিয়া ক্ষীণ-স্বরে বলিলেন,—শিশির, ভাই, আমি চলিলাম। অকারণে মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া আর আমার কষ্টবৃদ্ধি করিও না। বলিতে বলিতে তিনি নীরব হইলেন,—আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোষ-পরিবারে দারুণ শোকোচ্ছ্বাস উত্থিত হইল।

শিশিরবাবু শেষে লিখিয়াছেন,—বহুদিন দাদার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে বিরহাগ্নি এখনও সমভাবেই রহিয়াছে। এখনও শ্রীভগবানের পূজা করিতে বসিয়া আমি প্রভুকে দেখিতে পাই না;—তাঁহার স্থানে দাদাকে দেখি।

জেঠাইমা ও সেজকাকিমা

এখানেও আমাদের দুর্দ্দিনের অবসান হইল না। উক্ত ঘটনার দশ মাস পরে আমাদের গ্রামে ওলাওঠা-রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইল এবং গ্রাম উজাড় হইবার উপক্রম হইল। এ অবস্থায় গ্রামে থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া আমাদের পরিবারস্থ অনেককে যশোহর শহরে পাঠান হইল। কেবল আমার জেঠাইমা (বসন্তবাবুর স্ত্রী) বাতশ্লেষ্মা-বিকারে মরণাপন্ন পীড়িত হওয়ায় তাঁহার যাওয়া হইল না, এবং সেজকাকার (শিশিরবাবুর) দশ মাসের একমাত্র পুত্রটী অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় সেজকাকিমাও যাইতে পারিলেন না। জেঠাইমার সেবা-শুশ্রূষার জন্য ছিলেন আমার ঠাকুরমা ও দিদিমা। জেঠাইমা আমাদের বাড়ীতে রহিলেন ; এবং সেজকাকিমাকে তাঁহার পীড়িত পুত্রসহ কপোতাক্ষী নদীর তীরে আমাদের ডাক্তারখানায় লইয়া যাওয়া হইল।

এখানে "আমাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ" হইতে আবার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে হইল। বড়পিসিমা লিখিয়াছেন :—

"আমাদের আবার সর্ব্বনাশের দিন উপস্থিত। ডাক্তারখানায় যাইযাই সেজদাদার স্ত্রীর কলেরা হইল। এদিকে বাটীতে দাদার স্ত্রী সঙ্কটাপন্ন পীড়িত। সেজদাদার ছেলেটি অত্যন্ত পীড়িত বলিয়া তাহাকে তখন বাড়ীতে আমার মার কাছে লইয়া আসা হইল। সে সময় আমরা তিন ভগিনীই শ্বশুরালয়ে। মায়ের নিকটে একমাত্র মেজদাদার (হেমন্তবাবুর) শাশুড়ী ছিলেন।

সেজবৌয়ের যেদিন কলেরা হইল, সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা সেজদাদার ছেলেটিকে কোলে লইয়া একাকী সেজবৌকে দেখিবার জন্য বাড়ী হইতে ডাক্তারখানায় যাইতেছিলেন। এদিকে

সেজবৌ ইহলোক ত্যাগ করায়, সেজদাদা তাহাকে রাখিয়া বাটী যাইতেছিলেন। অর্দ্ধেক রাস্তায় আসিয়া তিনি দেখেন যে, মা তাঁহার অর্দ্ধমৃত ছেলেটাকে বুকে লইয়া পাগলিনীর ন্যায় আবল-তাবল বকিতে বকিতে আসিতেছেন। সেজদাদা আসিয়াই মাকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন,-আর কি দেখ্‌তে যা'বে মা? স্বর্গপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম। তারপর তিনি মায়ের হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গেলেন। বাটী যাইয়া দেখেন বৌকে বাহির করা হয়েছে!"

আমার ঠাকুরমার তখন কি শোচনীয় অবস্থা তাহা মনে ধারণা করা অসাধ্য। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি স্বামী, দুইটী পুত্র, তিনটী পুত্রবধূ হারাইলেন। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী শিশু সন্তানের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তখন একমাত্র আমার দিদিমা ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক তাঁহার সাহায্যার্থে সংসারে ছিলেন না। তাঁহার তিনটী কন্যাই তখন শ্বশুরালয়ে।

জেঠাইমা দশমাসকাল বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া একুশ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইলেন। রাখিয়া গেলেন পাঁচ বৎসরের পুত্র সরোজকান্তিকে ও দুই বৎসরের কন্যা সরলাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক বৎসর পরেই কন্যাটীকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন!

শিশিরকুমার ও ভুবনমোহিনী

সেজকাকিমা আমাদের ছাড়িয়া গেলেন সতেরো বৎসর বয়সে। মৃত্যুর সময় সেজকাকা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে সময় শিশির-কুমারের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার কতকটা আভাস

চল্লিশ বৎসর পরে তাঁহার লিখিত নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করিলে জানা যাইবে :—

ওরে আমার কে ভাঙ্গিল রে
সাধের প্রাণারাম মালঞ্চ ॥ ধ্রু ॥
নাম ভুবনমোহিনী প্রেমময় তনুখানি
আট বছর ছিনু তার সাথ।
ভাল মন্দ ত জানিনে ফাল্গুনের পাঁচ দিনে
অদর্শন হৈল অকস্মাৎ ॥
যাবার বেলা ডেকেছিল ধীরে ধীরে কি বলিল
ভাল করে স্মরণ না হয়।
মোর কোলে মাথা দিল মনে হয় এই বলিল—
মনে রেখ, মাঙ্গিছি বিদায় ॥
ধৈর্য্য ধরে না কান্দিনু নয়নজল না ফেলিনু
বুক পুড়ে হয়ে গেল ছাই।
পোড়ে অন্তরে অন্তরে কে নিভাবে কব কারে
তখন গৌরাঙ্গ চিনি নাই ॥
চল্লিশ বছরের কথা তবু সমান সেই ব্যথা
আমি তারে পাসরিতে নারি।
শুদ্ধ-প্রেম বলে কারে শিখাইল সে আমারে
প্রেমের গুরু সেই ত হামারি ॥
শুন গৌর-দয়াময় বলিবারে লজ্জা হয়
তাকে ছাড়ি থাকিতে না পারি।
তুমি দিয়াছিলে তারে ফিরাইয়া দাও মোরে
তা সঙ্গে মিলন ভিক্ষা করি ॥

এইরূপ পতিপ্রাণা প্রিয়তমা ভুবনমোহিনীকে হারাইয়া শিশিরকুমার এক ফোটা চোখের জল পর্য্যন্ত ফেলিবার অবসর পাইলেন না। কারণ মাতৃহারা রোরুদ্যমান পীড়িত শিশুসন্তানটীকে তাঁহারই বুকে তুলিয়া লইতে হইল। অবশ্য তাঁহার ভগিনী স্থিরসৌদামিনী এই দুঃসংবাদ শুনিয়া কয়েকদিন পরে শ্বশুরালয় হইতে আসিয়া শিশুর ভারগ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু সেই ব্রজবালককে বেশীদিন রাখিতে পারিলেন না,—ছয় মাস গত না হইতেই স্নেহময়ী জননী ভুবনমোহিনী প্রাণাধিক পুত্রকে আপনার কোলে টানিয়া লইলেন।

শিশিরকুমারের বিবাহের সময় তাঁহার বয়স ছিল উনিশ ও তাঁহার স্ত্রীর নয় বৎসর। এই বালিকা-বধূ ভুবনমোহিনী প্রকৃতই ভুবনমোহিনী ছিলেন। এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী এখনকার দিনে অতি বিরল। তাঁহার বর্ণ ছিল কাঁচা-সোনার মত, গঠন একেবারে নিখুঁত, মূর্ত্তি সরলতামাখা, হৃদয় ভালবাসার আধার, বদন সদা হাস্যময়; ক্রোধ বা বিরক্তি যে কি তাহা তিনি আদপে জানিতেনই না। তবে তাঁহার বুদ্ধি সেরূপ প্রখর ছিল না, আর লেখাপড়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া অল্প কিছু শিখিয়াছিলেন। স্বামীই ছিলেন তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান,—একমাত্র উপাস্য-দেবতা। গুরুজনের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা এবং অপরের প্রতি স্নেহ-মমতা তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল।

প্রিয়তমার প্রেমের গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্য শিশিরকুমার মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেন। একদিন বলিলেন,—আচ্ছা বল দেখি, তুমি যদি আমার নিকট অবিশ্বাসী হও, তাহা হইলে আমার কি করা কর্ত্তব্য?

স্ত্রী। (হাসিয়া) শুনিবামাত্র আমাকে বধ করা।

স্বামী। আর আমি যদি বিশ্বাস-ঘাতকের কাজ করি, তাহা হইলে তুমি কি কর?

স্ত্রী। কি করিব? কিছুই না।

স্বামী। (সবিস্ময়ে) তোমাকে ভাল না বাসিয়া যদি অপরকে ভালবাসি, তাহাতে কি তোমার রাগ হয় না?

স্ত্রী। মোটেই না। দেখ, স্বামী যে কি বস্তু, তাহা তোমরা পুরুষ-মানুষ কি করিয়া বুঝ্‌বে? তুমি আমাকে কিরূপ ভালবাস, কি আদপে ভালবাস কি না, সে কথা একবারও আমার মনে হয় না। তোমাকে যে ভালবাসিবার অধিকার শ্রীভগবান দিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। এইটুকু ছাড়া আমি আর কিছুই চাহি না। এই সুখ হইতে বঞ্চিত না হইলেই নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিব।

ভুবনমোহিনী যখন বিহ্বলভাবে এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার বদনমণ্ডলের সরলতা-মাখা সেই স্বর্গীয় ভাব আস্বাদন করিয়া শিশিরকুমার একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং আপনাকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

আর একদিন শিশিরকুমার বলিলেন,—আমি যদি আবার বিবাহ করি, তাহা হইলে তুমি কি কর?

এই কথা শুনিয়া ভুবনমোহিনী বিস্ফারিত-নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন; তারপর প্রফুল্লবদনে বলিলেন,—তোমার সুখেই আমার সুখ। আবার বিবাহ করিয়া যদি তুমি সুখী হও, তাহা হইলে আমি পরম আনন্দের সহিত তাহাতে মত দিব। দেখ, তোমার সুখের জন্য আমি শতবার জীবন দিতে পারি। একটু থামিয়া গদ্‌গদ্ ভাবে আবার বলিলেন,—তোমার কাছে আমার চাহিবার কিছুই নাই। এমন কি একটা আঙ্গুল পাইলেই আমি কৃতার্থ হইব। আর, তাহাও

যদি না পাই, তাহাতেই বা কি? তুমি যে আছ, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

শিশিরকুমারের ভগিনীরা ভুবনমোহিনীর সরলতার সুবিধা লইয়া মাঝে মাঝে তাঁহার সঙ্গে কৌতুক করিতেন। একদিন একজন বলিলেন,—তুমি কি এতই বোকা! সেজদাদা তোমাকে তাচ্ছিল্য করেন তাহা কি তুমি বুঝ্‌তে পার না? তুমি যদি মাঝে মাঝে রাগ কর, তাহা হইলে কি তিনি ঐরূপ করিতে পারেন?

ভুবনমোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—কি করিব ঠাকুরঝি, ওঁর উপর রাগ যে মোটেই হয় না।

ভুবনমোহিনীর সম্বন্ধে শিশিরকুমার একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে দিলাম:—

ভালবাসা কারে বলে ভুবন শিখা'ল।
মোর প্রতি কোন দিন ক্রোধ না করিল॥
বিদেশ হইতে গৃহে আইনু যখন।
পুকুরে নাহিতে ছিল বালিকা তখন॥
ছুটিয়া আসিল কাছে জ্ঞান-হারা হ'য়ে।
পরাণ পাইল মোর মুখ-পানে চেয়ে॥
তখন পাইয়া লজ্জা নারিল থাকিতে।
সাড়া পেয়ে পলাইল, বলিতে বলিতে—
'ঠাট্টা করে মোরে সবে নির্লজ্জ বলিয়া।
আমি মরি বাঁচি সুধু তোমার লাগিয়া॥
একটি আঙ্গুল দাও, চাহিব না আর।
আঙ্গুলটী নাড়ে চাড়ে সেই সুখ তার॥

এইভাবে সুখের সায়রে ভাসিতে ভাসিতে আট বৎসর কাটিয়া

গেল। তারপর সতের বৎসর বয়সে একদিন হঠাৎ তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে ভুবন আঁধার করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে মাতাঠাকুরাণীর আদেশে শিশিরকুমারকে পুনরায় বিবাহ করিতে হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে পরে বলিব।

দিব্যদৃষ্টি (Clairvoyance)

শশিমুখী

শশিমুখী নাম্নী আমাদের এক আত্মীয়া আমাদের চক্রে বসিতেন। তিনি চোখ বুঁজিয়া মনঃসংযোগ করিয়া বসিলেই, পরলোকগত ব্যক্তিদিগের আত্মা দেখিতে পাইতেন। এমন কি, তাঁহাদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান ও হৃদয়ে হৃদয়ে কথাবার্ত্তাও চলিত। চক্রে না বসিয়া নির্জ্জনে ঐভাবে বসিলেও তিনি ঐরূপ দেখিতে পাইতেন। মেস্‌মেরাইজ করিলে এইভাবে দেখা যায় সত্য, কিন্তু ইহাকে কেহ কখন মেসমেরাইজ করেন নাই,—তিনি আপনা হইতেই এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

একদিন তিনি আমাদের চক্রে চোখ বুঁজিয়া বসিয়াছিলেন। একটু পরে আমার পিতামহীকে বলিলেন,—জেঠিমা, এখানে একজনকে দেখিতেছি। তিনি বলিতেছেন, তিনি তোমার বাবা। তাঁহার চেহারা কিরূপ জিজ্ঞাসা করায়, শশিমুখী তাঁহার চেহারা যেরূপ বর্ণনা করিলেন, তাহাতে ঠাকুরমা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতা ভিন্ন অপর কেহ নহেন। অবশ্য শশিমুখী তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় কখনও

দেখেন নাই; আর আমাদের বাড়ীতেও তিনি কখন আসেন নাই। তবুও, সন্দেহ একেবারে দূর করিবার জন্য ঠাকুরমা শশিমুখীকে এরূপ কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহা তাঁহার জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইবার পর, তিনি যে ঠাকুরমার পিতা তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রহিল না।

শশিমুখী ছিলেন অতি সরল-স্বভাবা। লেখাপড়া তিনি বিশেষ কিছু জানিতেন না। তাঁহার ন্যায় সাদাসিদা গো-বেচারার পক্ষে মনগড়া কোন কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই তিনি চক্ষু বুঁজিয়া যাহা দেখিতেছেন বলিয়া বর্ণনা করিতেন, তাহা কল্পনা করিয়া বলিবার শক্তি তাঁহার আদপেই ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার এই দিব্যদৃষ্টি-শক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছিল; তখন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি তাঁহার স্বামীর কিংবা অপর কোন মৃতব্যক্তির দর্শন পান নাই।

নীরজনয়না

এই ঘটনার বহুবৎসর পরে, আমাদের পরিবারস্থ আর একটী মেয়ে এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তিনি আজ পর্য্যন্তও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মৃতব্যক্তিদিগের মূর্ত্তি দেখিতে পান ও তাঁহাদের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিয়া থাকেন। এই মেয়েটি আমার ছোটকাকা গোলাপবাবুর মধ্যমা-কন্যা, নাম নীরজনয়না। কলিকাতায় আমরা ১৮৭১ সালে আসি। ইহার ৪০ বৎসর পরে নীরজনয়না আমাদের পারিবারিক-চক্রে বসিতে আরম্ভ করেন এবং তখন হইতেই তিনি দিব্যদৃষ্টি-শক্তি লাভ করেন।

শশিমুখীর ন্যায় নীরজনয়নাও বেশ সাদাসিদা ও সরল-স্বভাবা; এবং শশিমুখীর ন্যায় তাঁহাকেও কেহ কখন মেসমেরাইজ করেন নাই; তিনি আপনা হইতেই এই ক্ষমতা পাইয়াছেন। নীরজনয়না অনেক সময়েই পরলোকগত ব্যক্তিদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন; তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুইটী অলৌকিক ঘটনা নিম্নে বিবৃত করিতেছি:—

(ক) আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরিমলকান্তি ১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে বৈদ্যনাথে মারা যান। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। এখানে আসিবার পরই আমরা চক্রে বসিয়াছিলাম। নীরজনয়নাও সেদিন আমাদের সঙ্গে বসিয়াছিলেন। বসিবার কিছুক্ষণ পরে নীরজনয়না বলিলেন,—ফুলদাদাকে (পরিমলকে) দেখিতেছি।

প্রশ্ন। কোথায়, কি ভাবে দেখিতেছ?

উত্তর। একখানি তক্তপোষের উপর শুইয়া আছেন।

প্র। জ্ঞান বেশ হইয়াছে কি?

উ। না, এখনও ভাল জ্ঞান হয় নাই।

প্র। নিকটে কেহ আছেন?

উ। হাঁ, তাঁহার মাসিমা (১) আছেন।

প্র। পরিমলের গায়ে কিছু আছে কি?

উ। হাঁ, একটা কোট আছে।

প্র। কি কাপড়ের কোট?

উ। ছিটের।

---

(১) পরিমলের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি মারা যান। বিধবা হইবার পর হইতে ইনি আমাদের সংসারভুক্ত হইয়া ছিলেন। পরিমলকে ইনি মানুষ করেন ও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

প্র। কিরূপ ছিট ?

উ। সাদা ও বেগুনে ডোরা-কাটা।

প্র। বিছানায় আর কিছু আছে কি ?

উ। একখানা মোটা সাদা-চাদর পায়ের কাছে জড় করা আছে।

এই সমস্ত কথাই ঠিক। মৃত্যুর সময় পরিমল ঐ ভাবে তক্তপোষের উপর শুইয়া ছিলেন ; এবং তাঁহার গায়ে ঐরূপ ছিটের কোট ও পায়ের কাছে ঐরূপ একখানি মোটা সাদা-চাদর ছিল। এই সকল কথা নীরজনয়নার জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ইহার পরে আরও কয়েকবার নীরজনয়না তাঁহাকে দেখিয়াছেন, এবং ক্রমে কি ভাবে পরিমলের জ্ঞানসঞ্চার হয়, তাহাও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। জ্ঞানসঞ্চার হইবার পর পরিমল প্রায় চক্রে আসিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রদিগের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন ; কিন্তু পরলোকগত নিজ-জনদিগের বিশেষ চেষ্টায়, ক্রমে তিনি পার্থিব-আকর্ষণ কাটাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারও চক্রে বসিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম।

(খ) আর একটী ঘটনা আরও বিস্ময়জনক। কলিকাতায় আমাদের এক আত্মীয়ের বাটিতে একটী যুবক মারা যায়। তাহার সংবাদ জানিবার জন্য তাহার আত্মীয় স্বজনেরা আমাকে অনুরোধ করেন। ইহার পর একদিন আমরা চক্রে বসিয়াছিলাম ; নীরজনয়নাও বসিয়াছিলেন। প্রথমে শ্রীভগবানের নাম-গান করিয়া, পরে মৃতব্যক্তিকে চক্রে আনিবার জন্য আহ্বান করা হয়। একটু পরে নীরজনয়না বলিলেন যে, একটী যুবক অজ্ঞান অবস্থায় শুইয়া আছে এবং তাহার কাছে একটী হিন্দুস্থানী যুবতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে সে যেন যুবককে আগ্‌লাইয়া আছে। সেখানে অপর কাহাকেও নীরজ

দেখিতে পান নাই। তারপর তিনি যুবকটীর চেহারা বর্ণনা করিলেন; ইহার কিছু পরে তিনি বলিলেন যে, একটি মুক্তাত্মা যুবকটির নিকট আসিতেছেন দেখিয়া স্ত্রীলোকটি সরিয়া পড়িল।

এই সংবাদ মৃত-যুবকের বাড়ীতে দেওয়া হইল। যুবকটীর চেহারার বর্ণনা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন যে, যুবকটীর চেহারা ঠিক ঐরূপই ছিল বটে; তবে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে কোন সংবাদ তাঁহারা তখন দিতে পারিলেন না। শেষে অনেক অনুসন্ধানের পর একটি অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশ পাইল। ঘটনাটী এই :—

তাঁহাদের একটী ভাড়াটিয়া বাটিতে সেই সময় একজন হিন্দুস্থানী সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। তাহাদের পরিবারস্থ একটি বধূ ঐ যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঐ ভাড়াটিয়া বাটীর সংলগ্ন তাঁহাদের আর একটি বাটিতে যুবকটিকে কার্য্যোপলক্ষে প্রত্যহই যাতায়াত করিতে হইত। এই সময় স্ত্রীলোকটির দৃষ্টি উহার উপর পতিত হয় এবং ক্রমে সে যুবককে আত্মসমর্পণ করে। যুবতী আপনার মনোভাব নানাপ্রকারে যুবককে জানাইবার চেষ্টা করে। এমন কি, উভয়ের মধ্যে কয়েকবার দৃষ্টি-বিনিময়ও হইয়াছিল; কিন্তু যুবকটি অতিশয় চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মভীরু বলিয়া সে স্ত্রীলোকটির কুহকে পড়ে নাই। এই সময় স্ত্রীলোকটি হঠাৎ মারা যায়। মৃত্যুর পরেও নাকি সে নানাপ্রকারে যুবককে ভয় দেখাইত। এই সকল কথা ঐ যুবক তাহার এক বন্ধুর নিকট প্রকাশ করে; এবং তাহার কাছেই ইহা পরে জানা গিয়াছিল। যুবকটি পীড়িত অবস্থায় ভয়বিহ্বল নেত্রে একদিকে চাহিয়া থাকিত, এবং মধ্যে মধ্যে বলিত যে, কোন ছায়ামূর্ত্তি তাহাকে ভয় দেখাইতেছে। এই সকল কথাও পরে জানা যায়। যুবকটি বিবাহ করিয়াছিল এবং তাহার দুইটি সন্তানও হয়।

চক্রে বসিয়া পরে জানা যায়, কোন পবিত্র আত্মার প্রচেষ্টায় ঐ

প্রেতাত্মার কবল হইতে যুবকের আত্মা উদ্ধারলাভ করে। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধীয় এই সকল ব্যাপার নীরজনয়নার জানিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

স্থিরসৌদামিনী

আমার বড়পিসিমা স্থিরসৌদামিনী ভাল মিডিয়ম ছিলেন। ইনি হাতে লিখিতে ও মুখে কথা কহিতে পারিতেন। তাঁহার উপর অনেক সময় পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হইত। আবেশ অবস্থায় তাঁহার হাত দিয়া অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশ পাইত, এবং মধ্যে মধ্যে গান ও কবিতা লেখা হইত। কখন কখন সুর করিয়া তিনি অজানা গানও গাহিতেন। তিনি খুব ভাল মিডিয়ম ছিলেন বলিয়া, তাঁহার উপর যাঁহাদের ভর হইত, তাঁহারা পরিষ্কাররূপে আপনাপন মনের ভাব তাঁহার দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারিতেন।

তিনি চোখ বুঁজিয়া পরলোক ও মৃতব্যক্তিদিগকে দেখিবার ক্ষমতাও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমাদের দেশস্থ বাটিতে চক্রে বসিবার সুরু হইতে শিশিরকুমার তাঁহাকে নিয়ম মত মেসমেরাইজ করিতেন। তাহার ফলে, কেবল যে তাঁহার চোখ খুলিয়া গিয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার দেহ হইতে আত্মা বাহির হইয়া ইহলোকের ও পরলোকের নানাস্থানে বেড়াইবার ক্ষমতাও লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মানসিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়াই তিনি একজন উৎকৃষ্ট মিডিয়ম হইতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, শিশিরবাবু তাঁহাকে মেসমেরাইজ না করিলেও, শশিমুখী ও নীরজনয়নার ন্যায় তাঁহার চোখ আপনিই খুলিয়া যাইত।

মহাত্মা শিশিরকুমার সাধারণ-মিডিয়মের ক্ষমতা কখন লাভ না

করিলেও, মেসমেরাইজ বা হিপ্‌নোটাইজ করিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। তিনি কখনও কাহাকেও মেসমেরাইজ বা হিপ্‌নোটাইজ করিয়া অকৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার এই মেসমেরাইজ করিবার জন্য, স্থিরসৌদামিনীর আত্মা সপ্তম-স্বর্গ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, সেই সকল স্থানের অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় দৃশ্য বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে "আমাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ" নামক পুস্তকে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

স্থিরসৌদামিনী লিখিয়াছেন,—"আমার উপর আত্মার ভর হইত। আবার সেজদাদা (শিশিরবাবু) আমাকে মেস্‌মেরাইজও করিতেন। ইহাতে আমার চোখ এরূপ খুলিয়া গিয়াছিল যে, আমি পরলোকের সপ্তম-স্তর পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারিতাম। সেই সকল স্তরে আমি যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহা ভাল করিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। তবে মোটামুটি কতকটা বলিতেছি।

"মেসমেবাইজ করিতে করিতে আমি অচেতন হইয়া পডিতাম। তখন আমার আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিত। প্রথমে সর্ব্বনিম্ন স্তবে যাইতাম। সে কেবল ভূত-প্রেতের আড্ডা। তাহাদের চেহারা এত ভয়ানক যে, এখনও মনে হইলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই জডজগতে যাহারা নিতান্ত নিকৃষ্ট, একরূপ পশুর ন্যায় বাস করে, মরণের পর তাহাবা এই প্রথম-স্তরে স্থান পায় ও সর্ব্বদা শিয়াল কুকুরের ন্যায় কামড়া-কামড়ি করে।

"বিদ্যাবুদ্ধিহীন ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য নিরীহ লোকেরা মৃত্যুব পর দ্বিতীয়-স্তরে বাস করে।

"দেবদেবীতে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, পরের অনিষ্ট বা হিংসা

করিবার প্রবৃত্তি নাই, তাঁহারা তৃতীয়-স্তরে গমন করিয়া আপনাপন ইষ্টদেবতার পূজায় নিমগ্ন থাকেন।

"চতুর্থ-স্তরে যে সকল আত্মা অবস্থান করেন, তাঁহাদিগের চেহারা বেশ সুন্দর ও অল্প জ্যোতির্ম্ময়।

"ইহার উপর পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম—এই তিনটি স্তর আছে। চতুর্থ-স্তরের আত্মারা উন্নতি করিয়া ক্রমে উপরের তিনটি স্তরে যাইয়া অবস্থান করিবার অধিকারী হন। এই সকল স্তরের মুক্তাত্মাগণ আপনাদের উন্নতি অনুসারে উত্তরোত্তর অধিক জ্যোতিযুক্ত হন।

"সপ্তম-স্তর এত সুন্দর, মনোহর ও সুখপ্রদ যে, তাহা মনে ধারণা করা যায় না। এই স্তরের সমস্ত দ্রব্য হইতেই নানাবর্ণের সুস্নিগ্ধ জ্যোতিপুঞ্জ সর্ব্বদা নির্গত হইতেছে। নানাবিধ সুগন্ধে সপ্তম-স্তর ভরপুর। রাগরাগিনী মূর্ত্তিমন্ত হইয়া এখানে বিরাজ করিতেছেন। *এস্থান চিরানন্দময়। এখানে সকলেই সর্ব্বদা* প্রেমানন্দে ভাসিতেছেন, এবং সেই আনন্দ ঢোকে ঢোকে পান করিতেছেন। এই স্থানই বৈষ্ণবদিগের শ্রীবৃন্দাবন। এখানে একবার আসিলে আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না।"

স্থিরসৌদামিনী সপ্তম-স্তরে

কি প্রকারে স্থিরসৌদামিনী সপ্তম-স্তরে গিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি। অধিকক্ষণ মেস্‌মেরাইজ করিলে ফল কি হয়, ইহা পরীক্ষা করিতে শিশিরকুমারের ইচ্ছা হয়। এইজন্য একদিন তিনি তাঁহার ভগিনী স্থিরসৌদামিনীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া মেস্‌মেরাইজ করেন। ক্রমে ভগিনী অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখনও শিশিরকুমার তাঁহাকে

মেস্‌মেরাইজ করিতে লাগিলেন। শেষে ভগিনীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। একটু পরে পুনরায় ডাকিয়াও কোন উত্তর না পাইয়া শিশিরকুমার উচ্চৈস্বরে বারম্বার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—দামিনী, তুমি কি ঘুমাইতেছ? কিন্তু তাহারও কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি ভগিনীর নাড়ী ও হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কোন স্পন্দন পাইলেন না। এরূপ অবস্থায় মনের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু শিশিরকুমার কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া, ধীর ও স্থিরভাবে ভগিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—দামিনী, তুমি কি ঘুমায়ে আছ?

সেবার ভগিনী উত্তর দিলেন,—না, আমি মরিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া শিশিরকুমার চম্‌কিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্তভাবে বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—মরিয়াছ! তুমি বলিতেছ কি?

উত্তর। হাঁ, আমি মরিয়াছি; মরণের পর আত্মা যেস্থানে যায়, আমি সেখানে আসিয়াছি।

ভগিনীর এই কথা শুনিয়া শিশিরবাবু এবার প্রকৃতই ভীত হইলেন। তখন ভগিনীকে ফিরিয়া আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন।

ভগিনী বলিলেন,—আমাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য কেন জিদ্ করিতেছ? মৃত্যু জীবের একটা পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই ত নয়। এইস্থানে একবার আসিতে পারিলে কেহ কি আর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে?

ভগিনীর এই কথা শুনিয়া শিশিরকুমার ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন,—তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক হইতে পারে। কিন্তু তুমি কি আমার

অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না? এইভাবে যদি তুমি চলিয়া যাও, তাহা হইলে আমার হৃদয় যে একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর বৃদ্ধা মায়ের দশা কি হইবে তাহাও ভাবিয়া দেখ।

ভগিনী। আমি যেখানে আসিয়াছি এইস্থান জড়জগত হইতে সহস্র গুণে সুন্দর, মনোহর ও শান্তিপ্রদ। এখানে সবই আনন্দময়। মনে করিলেই এস্থানে আসা যায় না। তোমারই চেষ্টায় আমি এখানে আসিতে পারিয়াছি, এখন তুমিই আবার আমাকে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ। তুমি আমাকে স্নেহ কর, ভালবাস; আমার এই সুখ দেখিয়া কোথায় তুমি আনন্দ প্রকাশ করিবে, তাহা না করিয়া আমাকে আবার ঐ দুঃখময় জগতে টানিয়া লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়াছ কেন?

ভগিনীর কথা শুনিয়া শিশিরকুমার কাঁদিয়া ফেলিলেন। শেষে ব্যথিত-হৃদয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বিশেষ মিনতি করিয়া বলিলেন,—দামিনী, তুমি যদি ফিরিয়া না এস, তাহা হইলে আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে, তাহা কি বুঝিতেছ না? আর, তুমি যে নিজের সুখের জন্য এতগুলি লোককে ক্লেশ দিতে যাইতেছ, ইহা কি তোমার ঘোর স্বার্থপরতার পরিচয় নহে?

এইভাবে অনেক কথা কাটাকাটির পর, স্থিরসৌদামিনীর আত্মা ফিরিয়া আসিতে রাজি হইলেন। তাহার পর তাঁহার দেহে ধীরে ধীরে জীবন-সঞ্চার হইতে লাগিল, এবং শেষে তিনি সম্পূর্ণ চেতনা লাভ করিলেন।

এই ঘটনাটি মতিবাবুর ও স্থিরসৌদামিনীর নিকট শুনিয়া মহাত্মা শিশিরকুমারের জীবনী-লেখক স্বর্গীয় অনাথনাথ বসু তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শিশিরবাবুও হিন্দু-স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে এই ঘটনাটি বিবৃত করিয়া শেষে লিখিয়াছেন যে, ভগিনী পরলোকে যাইয়া

কিছুতেই ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছিলেন না। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া যখন তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন তাঁহার মনের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল এবং তিনি বলিলেন,—আর কখনও আমাকে মেস্‌মেরাইজ করিও না। কারণ তখন তাঁহার ভয় হইল, পাছে তাঁহার আত্মা পরলোকে যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিতে রাজি না হয়। কি আশ্চর্য্য! এই জড়জগতে থাকিবার সময় আমাদের মরিতে, এমন কি মরিবার কথা শুনিতেও ভয় হয়; কিন্তু পরলোকে গেলে আর কিছুতেই এখানে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না। (১)

সূক্ষ্মদেহের বহির্গমন

এখানে আর একটী ঘটনা বলিতেছি; ইহা আরও বিস্ময়কর। ইহা আমাদের কলিকাতা আসিবার দুই বৎসর পূর্ব্বেকার (১৮৬৯ খৃঃ অব্দের) কথা। আমাদের দেশস্থ বাটীর পূর্ব্বপার্শ্বে আমাদের এক ঘর জ্ঞাতি বাস করিতেন। সেই বাটীর শশধর নামক ১৫।১৬ বৎসরের একটী বালক

(১) শিশিরবাবু Hindu Spiritual Magazineএ লিখিয়াছেন,—"We personally know the case of a lady who was so deeply mesmerised that she almost died under the process. We saw that her body had become cold, her heart and pulse had ceased to beat. With gigantic efforts she was brought to consciousness. And no sooner was this done than she declared: "Why did you bring me back? There is struggle in death; I conquered it without any struggle; I had been to the border of a beautiful world. Let me go; let me tell you that death is nothing but a pleasant change. So

পুরাতন পীড়ায় ভুগিতেছিল। মাঝে মাঝে তাহার মূর্চ্ছা হইত। একদিন বৈকালে সে অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া আমাদের বাটীতে আসে, এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবার অনেক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কিছুতেই মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না; বরং তাহার অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। চিকিৎসক যখন বলিলেন যে, রোগীর বাঁচিবার আশা আদপে নাই, তখন শিশিরবাবুর মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল; অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় মানবদেহ হইতে সূক্ষ্মমূর্ত্তি বহির্গত হয় কি না এবং যদি প্রকৃতই হয়, তবে সে কি ভাবে হইয়া থাকে, তাহাই পরীক্ষা করিবার বলবতী ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ স্থিরসৌদামিনীকে মেসমেরাইজ করিতে বসিলেন। ক্রমে যখন তিনি সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, তখনই শিশিরবাবু দৃঢ়তার সহিত তাঁহার ভগিনীর আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—তুমি এখনই শশধরের কাছে যাও, এবং সেখানে যাহা যাহা তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহাই বর্ণনা কর।

স্থিরসৌদামিনী সেই অচেতন অবস্থায়বলিলেন,—হাঁ, আমি শশধরের কাছে আসিয়াছি। এখানে তাহার পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। তাঁহারা উদ্‌গ্রীব ভাবে শশধরের দিকে চাহিয়া আছেন, যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

don't mourn for me." She at last consented to come. But wonder of wonders, when she regained her consciousness fully, she refused to be mesmerised again, lest she died again and could not come back. In short, when in this world, people refuse to die, and when in the spirit-world, the spirits refuse to come here.—H. S. M. Vol. IV. No. 1.

স্থির-সৌদামিনী

৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

১১ই বৈশাখ ১৩৩২ সাল (ইং ২৪।৪।২৫)

[পৃঃ ৪২

লীলাবতী

৩০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

পৃঃ —৭৩

একটু পরে বলিলেন,—এখন দেখিতেছি তাহার দেহ হইতে বাষ্প নির্গত হইতেছে। তৎপরে বলিলেন,—সেই বাষ্প মানুষের আকার ধারণ করিতেছে। পরে বলিলেন,—ক্রমে ইহা শশধরের মূর্ত্তিধারণ করিল। অবশেষে বলিলেন,—শশধরের মৃত-আত্মীয়েরা তাহার ছায়ামূর্ত্তি লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

লীলাবতী

আমাদের দেশস্থ বাটিতে অবস্থানকালীন একদিন শিশিরকুমার তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনী লীলাবতীকে হিপ্‌নোটাইজ করিয়া বলিলেন,—এখনই আমাদের ডাকঘরে যাও।

সে সময় ডাকঘরটি আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে কপোতাক্ষী নদীর তীরে বাজারের পার্শ্বে ছিল।

শিশিরবাবু একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—ডাকঘরে গিয়াছ ?

উত্তর। হাঁ, আসিয়াছি।

প্রশ্ন। পূর্ব্বদিকের দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ কর।

উ। করিলাম।

প্র। বল দেখি ঘরে টেবিল, চেয়ার ও আলমারী কয়টা করিয়া আছে, এবং কোন খানা কোন স্থানে রহিয়াছে।

উ। টেবিল ২ খানা, চেয়ার ৪ খানা, আলমারী ২টা আছে। ইহার মধ্যে একখানা টেবিল ঘরে ঢুকিতে উত্তর পার্শ্বে ও একখানা দক্ষিণ পার্শ্বে রহিয়াছে, এবং প্রত্যেক টেবিলের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে একখানা করিয়া চেয়ার আছে। আর আলমারী দুইটা পশ্চিমদিকে রহিয়াছে

প্র। টেবিলের উপর কোথায় কি দ্রব্য ও ঘরে কত জন লোক আছে? তাহারা কে কোনদিকে বসিয়া কি করিতেছে?

এই সকল ও আরও কতকগুলি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার পর শিশিরবাবু ভগিনীর সহজ জ্ঞান সম্পাদন করাইলেন। তারপর অপর কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া তিনি তখনই দ্রুতপদে ডাকঘরে গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, লীলাবতী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সমস্তই ঠিক মিলিয়া গেল। লীলাবতী তখন বয়স্থা, সুতরাং তাঁহার তখন ডাকঘরে যাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

হিলিং বা আরোগ্যকারী মিডিয়ম

আমরা দেখিতে পাই কখনও কোন আত্মীয়স্বজনের আত্মা কিংবা উচ্চস্তরের কোন পবিত্র আত্মা এই মর-জগতের কোন দুরারোগ্য ব্যাধিযুক্ত রোগীকে নিরাময় করিবার নানাপ্রকার চেষ্টা করেন এবং অনেক স্থলেই সফলতা লাভ করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল উপায় অবলম্বন করেন তন্মধ্য প্রধান কয়েকটি নিম্নে বলিতেছি:—

(ক) কোন উপযুক্ত মিডিয়মের উপর ভর করিয়া, তাহার দ্বারা কখনও মেস্‌মেরাইজ করিয়া, কখন বা ঔষধ বলিয়া দিয়া, রোগীকে ব্যাধিমুক্ত করিবার চেষ্টা করেন।

(খ) কখন বা মিডিয়মের দ্বারা সদুপদেশ দিয়া রোগীর মানসিক পীড়া দূর করিতে সাহায্য করেন।

(গ) কখনও বা পরোক্ষে থাকিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

(ঘ) আবার কখন বা স্বপ্নে ঔষধ প্রদান করেন কিংবা ঔষধের নাম বলিয়া দেন।

যে সকল মিডিয়মের উপর ভর করিয়া রোগীকে ব্যাধিমুক্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ হিলিং বা আরোগ্যকারী মিডিয়ম বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রোগমুক্ত করেন আত্মারা,—মিডিয়মেরা নহেন। কাজেই হিলিং মিডিয়ম না বলিয়া, হিলিং স্পিরিট বা আরোগ্যকারী আত্মা বলা উচিত।

আত্মার সাহায্যে রোগমুক্ত হইয়াছে এইরূপ কয়েকটী চাক্ষুষ ঘটনা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

মহাত্মা শিশিরকুমার

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহাত্মা শিশিরকুমার মেস্‌মেরাইজ বা হিপ্‌নোটাইজ করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ঝাড়িয়া বা মেস্‌মেরাইজ করিয়া রোগীকে ব্যাধিমুক্ত করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু মেস্‌মেরাইজ করিবার সময় তাঁহার হাবভাব দেখিয়া বেশ বুঝা যাইত যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ঝাড়িতেছেন না,—কোন পবিত্র আত্মা তাঁহার উপর ভর করিয়া ঐরূপ করিতেছেন। নিম্নে একটী ঘটনা বলিতেছি :—

সে সম্ভবতঃ ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের কথা। আমাদের গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ে একদিন সকালবেলা একটী রোগীকে আনা হয়। হাঁটু জুড়িয়া যাওয়ায় সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত না। এই রোগী যখন চিকিৎসালয়ে আসে, তখন শিশিরবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন; আমরাও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম।

শিশিরকুমার কিছুক্ষণ রোগীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর গম্ভীর

স্বরে ভারপ্রাপ্ত-ডাক্তার চন্দ্রনাথ কর্ম্মকারকে বলিলেন,—দেখ ডাক্তার, আমি এখনই ইহাকে হাঁটাইব। তিনি এই কথা এরূপ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, ডাক্তার বাবু কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, এবং তিনি আবিষ্ট অবস্থায় ঐ কথা বলিতেছেন বুঝিতে পারিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

শিশিরবাবু তখনই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন, এবং তাহার ব্যাধিগ্রস্ত পা-খানি ঝাড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ঝাড়িবার পর হঠাৎ গম্ভীর স্বরে রোগীকে বলিলেন,—উঠিয়া দাঁড়াও।

এই কথা বলিবামাত্র রোগী মন্ত্রমুগ্ধ-ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া বসিল, তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়াইল, এবং শেষে লাঠিতে ভর দিয়া সহজভাবে হাঁটিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

মতিলাল

মহাত্মা শিশিরকুমারের ন্যায় মতিবাবুও কঠিন ব্যাধিগ্রস্থ রোগীকে ঝাড়িয়া নিরাময় করিয়াছিলেন, একথা শিশিরবাবু হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে লিখিয়াছেন। তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দিতেছি :—

শিশিরবাবু লিখিয়াছেন,—একবার গুরুপাক দ্রব্য আহার করিয়া আমার পেটের পীড়া হয়। তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, তাহার উপর আহারের আরও অত্যাচার করি। ইহার ফলে আমি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হই। আমার পেটের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া দেহ অবসন্ন হইতে লাগিল,—ক্রমে মূর্চ্ছা পাইবার উপক্রম হইল এবং নাড়ী ক্ষীণ হইয়া আসিল।

এই কথা এতক্ষণ আমি কাহাকেও জানাই নাই। আমার কনিষ্ঠভ্রাতা

মতিলাল তখন আমার নিকট হইতে একটু দূরে বসিয়াছিলেন। আমি যে তখন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। মতিলালকে আমি আমার পিঠের কাছে বসিতে ইঙ্গিত করিলাম। তিনি আসিয়া বসিলে, আমি তাঁহার উপর ঠেস্ দিয়া বসিলাম ও অতি কষ্টে ক্ষীণ-স্বরে বলিলাম,—আমার কলেরা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়াই তাঁহার দেহ অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। তখন তাঁহার হাবভাব দেখিয়া বোধ হইল তিনি স্ববশে নাই। তারপরই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জোরের সহিত থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হঠাৎ মতিলালের এই ভাব দেখিয়া আমি এরূপ বিস্মিত হইলাম যে, আমার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না ; এমন কি, তাঁহার যে কি হইয়াছে তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। একটু পরে মনে হইল তিনি যেন কতকটা স্ববশে আসিয়াছেন এবং সেই আবিষ্ট অবস্থায় দক্ষিণহস্ত দিয়া আমাকে ঝাড়িতেছেন।

আমি অনেকদিন হইতেই মেস্‌মেরাইজ বা হিপ্‌নোটাইজ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু মতিলালকে কখনও ইহা করিতে দেখি নাই। আজ তাঁহার ভাব দেখিয়া আসল ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। অর্থাৎ আমাকে এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া, কোন উচ্চস্তরের পবিত্র আত্মা আমাকে মেস্‌মেরাইজ করিয়া ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্য, মতিলালকে ভাল মিডিয়ম দেখিয়া তাঁহার উপর ভর করিয়াছেন। ইহার ফলে মতিলাল আবিষ্ট অবস্থায় হতচৈতন্য হইয়া আমাকে মেস্‌মেরাইজ করিতেছেন।

মতিলাল এক একবার হস্ত সঞ্চালন করিতেছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার উত্তরোত্তর অধিক আরাম বোধ হইতেছে। ইহার ফলে, আমার অবসাদ ক্রমে দূর হইতে লাগিল এবং আমার মনে হইতে লাগিল যেন আমার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইতেছে।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অসহ্য যন্ত্রণা ও ক্লান্তি আমাকে অভিভূত করিতেছিল এবং একটা অবসাদ আসিয়া আমার মূর্চ্ছা পাইবার উপক্রম হইতেছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই মেস্‌মেরাইজের ফলে, দুই মিনিটের মধ্যে, আমার দেহ জুড়াইতে লাগিল, আর আমি ক্রমে সবল ও সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম।

তখন সেই পবিত্র আত্মাকে—যিনি মতিলালের উপর ভর করিয়া আমাকে মেস্‌মেরাইজ করিতেছিলেন—উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, আপনাকে শত-সহস্র ধন্যবাদ! আমি এখন বেশ সুস্থবোধ করিতেছি। তারপর যেন কোন অদৃশ্য-শক্তির প্রভাবে আমি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বুঝিতে পারিলাম, আমার শরীরে আর কোন গ্লানি নাই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি।

বিনোদীলালের দেহত্যাগ

আর একবার আমাদের এই বাগবাজারের বাটীতেই মতিবাবু ঐরূপ আবিষ্ট অবস্থায় মেস্‌মেরাইজ করিয়া আমার রাঙ্গাকাকা বিনোদীলালকে ব্যাধিমুক্ত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিনোদীলাল কিছুকাল রোগভোগ করিয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। শেষে একদিন তাঁহার শ্বাসের কষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। মতিবাবু রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিতেছেন। হঠাৎ তিনি কোন পবিত্র মুক্তাত্মা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইলেন, এবং সেই আবিষ্ট অবস্থায় বিনোদীলালকে মেস্‌মেরাইজ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে ঝাড়িবার পর মতিবাবুর মুখ দিয়া বাহির হইল—উঠে ব'স।

বিনোদীলাল তখন এত দুর্ব্বল যে তাঁহার পাশ ফিরিয়া শুইবার শক্তি নাই। কিন্তু এই আদেশে তিনি অপরের সামান্য সাহায্যে উঠিয়া বসিলেন এবং কাসিতে কাসিতে কাস তুলিয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাঁহার কিছু সোয়াস্তি বোধ হইল বটে, কিন্তু দৌর্ব্বল্যের জন্য বেশীক্ষণ বসিতে পারিলেন না—আবার শুইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে রোগীর আবার শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল। মতিবাবুর তখনও সেই আবিষ্টভাব ছিল। সেই অবস্থায় তিনি আবার বিনোদীলালকে ঝাড়িতে লাগিলেন এবং আবার দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। সেবারও রোগী পূর্ব্বের ন্যায় অপরের সাহায্যে উঠিয়া বসিলেন, এবং কতকটা কাস তুলিলেন, শেষে আবার শুইয়া পড়িলেন।

কয়েকবার এইভাবে উঠিয়া কাস তুলিলেন বটে, কিন্তু উপশম বিশেষ কিছু বোধ হইল না; বরং বারম্বার উঠিবার জন্য দেহ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে একবার তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসান হইল বটে, কিন্তু কাস আর তুলিতে পারিলেন না। এই সময় কাসের প্রবল একটা ধমক আসিল, ইহা তাঁহার ক্ষীণদেহ সহ্য করিতে পারিল না,—তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইল, এবং তাঁর আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

স্থিরসৌদামিনীর দিব্যদর্শন

বিনোদীলালের ইহসংসার পরিত্যাগের তিনদিন পূর্ব্বে আমার বড়পিসিমা স্থিরসৌদামিনী তন্দ্রাবস্থায় একটী অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করেন।

তাঁহার লিখিত "আমাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ" হইতে এই ঘটনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

বিনু বৈঠকখানার পার্শ্বের একটি ঘরে শুইয়া রহিয়াছে। মাঝখানের হলঘরে ভগিনী কাদম্বিনী ও আমি শুইয়া আছি। আমার একটু তন্দ্রাবোধ হইতেছে, এমন সময় শুনিলাম শূন্যের উপর কে যেন বলিতেছে,—হা ভগবান্! কে তোমাকে দয়াময় বলে। যাহার জীবন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছে, তাহার প্রতি তোমার কিছুমাত্র দয়া হইল না!

এই কথা শুনিয়া আমি জগৎ-সংসার অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলাম। সেই সময় অন্ধকার ঘরের মধ্যে দপ্ করিয়া একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোর মধ্যে একখানি সুন্দর মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই মুখের জ্যোতি হইতেই এই আলো বাহির হইতেছে। মুখখানি সরোজকান্তির। (১)

সরোজকান্তি যেন একটু কাষ্ঠ-হাসিয়া কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কহিল,—বড়পিসি! এত চিন্তা করিতেছ কেন? রোগ কি কাহারও হয় না? দেখিও আর তিনদিন পরেই রাঙাকাকা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন।

ইহা স্বপ্ন নহে, একরূপ জাগ্রত অবস্থাতেই দেখিয়াছি। আমার নিজের অস্তিত্বে যদি ভুল না হইয়া থাকে, তবে যাহা দেখিয়াছি তাহাতেও ভুল হয় নাই। সরোজকান্তি যে বলিয়াছিল রাঙাকাকা তিন দিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন, তাহা তাহাদের হিসাবে ঠিকই

---

(১) বিনোদীলালের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে আমার জ্যেঠতুত ভাই সরোজকান্তির পরলোকপ্রাপ্তি হয়। সরোজের কথা পরে বলিব।

হইল। কিন্তু তিন দিন পরে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিল,—বিনোদীলাল আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেল! [হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের ৫ম খণ্ডের ১ম সংখ্যায় এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।]

মুক্তাত্মা কর্ত্তৃক ব্যাধিমুক্তি

তড়িৎকান্তি

আমার পিসতুত ভাই রায়বাহাদুর তড়িৎকান্তি বক্সি এম-এ, এম-আর-এ-এস, কেমিষ্ট্রীতে এম-এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, জব্বলপুর রবার্টসন কলেজে কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন, এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এই কলেজেই ছিলেন। তিনি যেমন প্রখর বুদ্ধিমান্ তেমনি প্রগাঢ় ভক্তিমান্, যেমন পরদুঃখ-কাতর তেমনি সেবা-পরায়ণ ছিলেন। এক কথায়, সদালাপ ও মধুর স্বভাবের জন্য তিনি অনেকের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শত্রু বলিয়া কেহ ছিল না।

১৯০৬ সালে তিনি বিষাদ-বায়ু (obsessive melancholia) রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার পীড়ার কথা প্রথমে কেহ জানিতে পারে নাই। কিন্তু যখন তিনি ইহা আর গোপন রাখিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার আত্মীয়স্বজন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু তাহাতে উপকার কিছুই হইল না, বরং তাঁহার পীড়ার প্রকোপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইত না, নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিত; কাজেই তাঁহার কাজকর্ম্ম করা ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার কি যে হইয়াছে

তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাঁহার লোপ পাইল। তিনি বলিতেন, তাঁহার চিৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে, এবং এইভাবে কিছুক্ষণ ক্রন্দন করিলে বুকের চাপ অনেকটা কমিয়া হাল্কা বোধহয়। তিনি হৃৎপিণ্ডের অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িতেন ; কখন বা প্রবল ফিটে আক্রান্ত হইয়া চেতনাশূন্য হইতেন ; কচিৎ কখন বলিয়া ফেলিতেন যে মনের বল বেশী না থাকিলে, অব্যক্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এতদিন হয়ত তিনি আত্মহত্যা করিতেন। সারারাত্রির মধ্যে তাঁহার নিদ্রা হইত না, এবং মন সর্ব্বদা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত, কিন্তু এই চিন্তার সূত্র তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না। যখন তিনি এই অবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন তাঁহাকে কলিকাতায় আমাদের বাটীতে লইয়া আসা হইল।

কলিকাতায় আনিয়া বিচক্ষণ চিকিৎসকদিগকে দেখান হইল, কিন্তু ফল কিছু পাওয়া গেল না। জব্বলপুরে তিনিই ছিলেন বাড়ীর কর্ত্তা, কাজেই সেখানে তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। কিন্তু কলিকাতায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের মধ্যে আসিয়া তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করিবার সুযোগ হইত না। অনেকের সহিত মেলামেশা করিতে হইত এবং অনেক সময় ইচ্ছা না থাকিলেও কথাবার্ত্তা কহিতে ও গল্পগুজব শুনিতে হইত। ইহার ফলে, তাঁহার আপন মনে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অবসর সর্ব্বদা মিলিত না।

এই সময় আমাদের বাড়ীতে নিয়মমত আধ্যাত্মিক-চক্রে বসা হইত। তড়িৎকান্তিকে এই চক্রে যোগদান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইল। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিত ; কাজেই মৃতব্যক্তির আত্মা আসিয়া মনুষ্যের উপর ভর করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁহার আদপে ছিল না। কিন্তু অপরদিকে শান্ত-প্রকৃতির

লোক বলিয়া আত্মীয়স্বজনের কথা উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত ; কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি চক্রে বসিতে বাধ্য হইলেন।

প্রথম দিনের চক্রে আমার খুড়তুত ভাই কিসলয়কান্তির আত্মা আসিয়া একজন মিডিয়মের উপর ভর করিলেন। কিসলয় অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। আমার বড়পিসিমা স্থিরসৌদামিনী (তড়িৎ-কান্তির মাতা) কিসলয় ও তাঁহার মাতাকে জব্বলপুরে লইয়া যান এবং আপনার কাছে রাখেন। অনেকদিন একসঙ্গে থাকিয়া তড়িৎকান্তি কিসলয়কে আপন ছোটভাইয়ের মত ভাল বাসিতেন। তড়িৎকান্তি রোগাক্রান্ত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কিসলয় মারা যান। সুতরাং কিসলয়ের আত্মা মিডিয়মের উপর ভর করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলেও, কিসলয়ের নাম শুনিয়া তড়িৎকান্তির মন তাঁহার প্রতি কতকটা আকৃষ্ট হইল এবং মিডিয়মের মুখ দিয়া কিসলয় যে সকল কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া তড়িৎকান্তি মনে কিছু শান্তিও পাইলেন ; শেষে, কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে চক্রে বসিতে তাঁহার মনপ্রাণ ধাবিত হইল।

সেইদিন হইতে চক্রে বসিবার জন্য তড়িৎকে আর পীড়াপীড়ি করিতে হইত না, আপন ইচ্ছায় তিনি যথাসময়ে আসিয়া বসিতেন ও কিসলয়ের আত্মাব সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। এই সময় তড়িতের প্রশ্নোত্তরে মিডিয়মের মুখ দিয়া মধ্যে মধ্যে এমন সকল কথা বাহির হইতে লাগিল, যাহা তড়িৎ ও কিসলয় ভিন্ন অপর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। ইহাতে তড়িৎকান্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং প্রকৃতই কিসলয়ের আত্মা আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এইরূপ বিশ্বাস করা ভিন্ন তাঁহার আর কোন উপায় রহিল না।

এই ঘটনা হইতে তড়িতের পীড়ার গতি ফিরিয়া গেল। তখন

চক্রে বসা তড়িতের একটা নেশায় পরিণত হইল; এমন কি, একদিন চক্রে না বসিতে পারিলে তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া পড়িত। তড়িতের যখন এইরূপ মনের অবস্থা, তখন কিসলয়ের, তড়িতের পিতার ও অন্যান্য নিজজনের আত্মারা আসিয়া, নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া, নানাবিধ উৎসাহ দিয়া, ক্রমে তাঁহাকে আপনাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে সক্ষম হইলেন।

তড়িৎকান্তি বিষাদবায়ু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া একেবারে শক্তি-সামর্থ্যশূন্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, এই বিষম রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু মুক্তাত্মাদিগের প্রচেষ্টায় ও তাঁহাদের উপদেশমূলক বাক্য শ্রবণে তড়িৎকান্তির মানসিক দৌর্ব্বল্য ও নৈরাশ্যভাব ধীরে ধীরে বিদূরিত হইতে লাগিল।

এই সময় একদিন কিসলয়ের আত্মা আসিয়া বলিলেন,—দেখ সোণা-দাদা (১), আমরা সর্ব্বদা তোমার কাছে থাকিয়া, মনের ব্যারাম হইতে তোমাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। তুমি যদি চেষ্টা দ্বারা মনে বলসঞ্চার করিতে পার, তাহা হইলে শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে ব্যাধিমুক্ত হইতে পারিবে। কিরূপভাবে চেষ্টা করিতে হইবে তাহাও কিসলয় বলিয়া দিলেন। কিসলয় আরও বলিলেন,—তুমি প্রচুর পরিমাণে শক্তিসামর্থ্য লাভ করিলে, তখন তোমার পীড়ার প্রকৃত কারণ তোমাকে জানাইব। এই কথা শুনিয়া তড়িৎ ইহা তখনই জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে জানান হইল যে, তাঁহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় এই কথা বলিলে তাঁহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

(১) তড়িৎকে তাঁহার কনিষ্ঠেরা 'সোণাদাদা' বলিয়া ডাকিত।

তড়িৎকান্তি বক্সি

৫৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

৭ই চৈত্র ১৩৩৪ সাল (ইং ৩ ।৩।২৮)

[পৃ — ৫৯

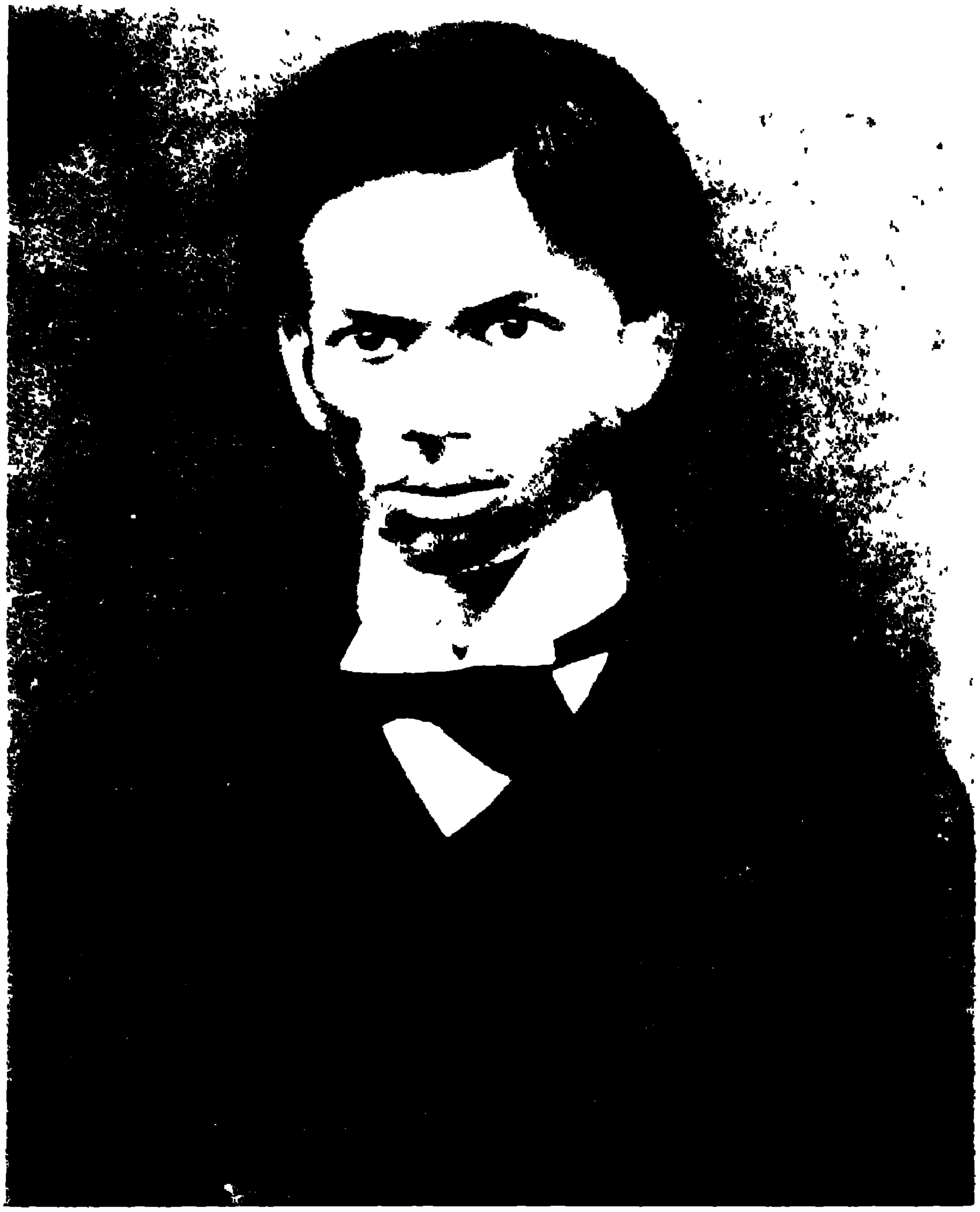

কিশলয়কান্তি ঘোষ

২৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

৪ঠা আষাঢ় ১২০৯ সাল (ইং ১৮।৬।০২

[পৃঃ—৫৫

ইহার পর এক পক্ষ গত না হইতেই তড়িৎকান্তি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মানসিক ক্লেশ প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সকলের সঙ্গে মেলামেশা ও হাস্যকৌতুক করিতে ও গৃহস্থালীর কাজে মন দিতে ততটা কষ্ট বোধ হয় না।

সেই সময় আর একটী ঘটনা ঘটিল। তড়িৎকান্তির স্ত্রী পূর্ব্বে কখনও চক্রে বসিতেন না, কিংবা মিডিয়ম হইবার শক্তি যে তাঁহার আছে তাহাও কেহ জানিতেন না। একদিন তাঁহাকে চক্রে বসান হইল এবং সেইদিনই তাঁহার উপর এক আত্মার ভর হইল। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি একজন ভাল মিডিয়ম হইলেন। তখন প্রত্যহ রাত্রিতে কেবল তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে চক্রে বসিতে আরম্ভ করিলেন। কিসলয়ের আত্মা প্রত্যহ তড়িৎকান্তির স্ত্রীর উপর ভর করিতেন, এবং তড়িতের সঙ্গে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা চলিত। কোন দিন তাঁহারা কথায় কথায় এরূপ তন্ময় হইতেন যে, কোথা দিয়া রাত্রি কাটিয়া যাইত তাহা জানিতেই পারিতেন না। তড়িতের পিতার আত্মা এবং অপর দুই এক জনের আত্মাও মধ্যে মধ্যে আসিয়া তড়িতের স্ত্রীর উপর ভর করিতেন, এবং নানারকম উপদেশ দিতেন। এই প্রকারে ক্রমে তড়িতের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

একদিন কিসলয়ের আত্মা এক অদ্ভুত কথা প্রকাশ করিলেন। তিনি তড়িৎকান্তিকে বলিলেন,—গত তিন বৎসর হইতে একটী দুষ্ট প্রেতাত্মা তোমার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই আত্মা অপর কেহ নহে, তোমারই এক জ্ঞাতিশত্রু; তোমার উপর তাহার জাতক্রোধ।

কিসলয় তড়িতের সেই জ্ঞাতির নামও বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি ইহজগতে থাকিবার সময় অত্যন্ত বদ্‌স্বভাবের লোক ছিল; এবং

সেইজন্য তড়িতের পিতা ও তড়িৎ তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখিতেন। সেও জড়জগতে থাকিতে তাঁহাদের অনিষ্টের বিশেষ চেষ্টা করিত। তড়িতের পিতার মৃত্যুর পর সেও মারা যায়। মৃত্যুর পরেও সে বদ্‌অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই। ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে এই দুষ্ট আত্মাই তড়িতের অনিষ্ট সাধনের জন্য তিন বৎসরকাল বিশেষ চেষ্টা করে এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হয়।

যেদিন তড়িৎ এই কথা জানিতে পারিলেন, সেই দিন এক দুষ্ট প্রেতাত্মা তড়িতের স্ত্রীর উপর ভর করিল। মিডিয়ম আবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার কর্কশ-স্বর ও কথার ভঙ্গি শুনিয়া এবং তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষু ও তাঁহাকে পুরাতন ঘটনাবলীর উল্লেখ করিতে দেখিয়া, সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, এ সেই দুষ্ট প্রেতাত্মা, যে তড়িতের অনিষ্ট করিবার জন্য তিন বৎসর চেষ্টা করিতেছে।

ইহজগতে থাকিবার সময় এই ব্যক্তিকে তড়িতের স্ত্রী কখন ত দেখেনই নাই, তাহার কথাও কখন শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এই প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া তিনি এরূপ হাবভাব প্রকাশ করিতে ও কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, যাহা দেখিয়া সকলেই ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। অনেক রকম চেষ্টা করিয়া সেই প্রেতাত্মার কবল হইতে তড়িৎকান্তির স্ত্রীকে মুক্ত করা হইল। সেই দিন হইতে তড়িৎকান্তির পিতা মতিলাল বক্সি মহাশয়ের ও কিসলয়ের প্রযত্নে পূর্ব্বোক্ত প্রেতাত্মা তড়িৎ কিম্বা তাঁহার স্ত্রীর আর কোন অনিষ্টসাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। এই প্রকারে তড়িৎকান্তি ক্রমে রোগমুক্ত হইয়া দুইবৎসর পরে জব্বলপুরে যান এবং আপন কার্য্যে যোগদান করেন। (১)

---

(১) Vide H. S. M. Vol III Part I

পরোক্ষে মাদুলী প্রদান

কলিকাতা ক্যাম্বেল-মেডিক্যাল-স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পরলোক-গত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম-ডি মহাশয় ১৯০৪ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় একটী অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন। উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ডাঃ সেন লিখিয়াছেন,—বিগত ১৬ই মার্চ্চ রাত্র ৮টার সময় কলিকাতা ঝামাপুকুর ব্রজনাথ মিত্রের লেনস্থ ১৩নং ভবনে,—বাবু রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের বাসায়—আমি একটী রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। রোগীর শয়ন-গৃহে একটী যুবককে দেখিতে পাইলাম। এই যুবকটীর নাম সুরেন্দ্রনাথ দাস। সে আমার ছাত্র, ক্যাম্বেল-মেডিক্যাল-স্কুলের প্রথমবার্ষিক-শ্রেণীতে পাঠ করে। আমি রোগীকে পরীক্ষা করিতেছি, এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ উপবেশন অবস্থায় হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। তখনই তাহার কাছে যাইয়া, তাহার পায়ের বুট খুলিয়া, তাহাকে শয়ন করাইয়া দিলাম। তখন অনবরত বিক্ষেপের জন্য তাহার মাংসপেশী শক্ত ও দেহ পরিক্লিষ্ট হইতে লাগিল। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, এই নিদারুণ আক্ষেপ বিক্ষেপেও তাহার নাড়ীর, হৃৎপিণ্ডের ও শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রক্রিয়ার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই। আমি তাহার দেহে চিমটি কাটিলাম, ছুরী দিয়া আঘাত করিলাম ও শেষে জলন্ত বাতি ধরিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার চেতনালাভ হইল না।

সুরেন্দ্রনাথ তখন বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া কি বকিতেছিল। প্রথমে বোধ

হইল যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছে, তারপর বোধ হইল সে যেন অন্ধকার রাত্রে কণ্টকপূর্ণ পথে বিচরণ করিতেছে। একি স্বপ্ন? না সূক্ষ্মশরীরে অন্যত্র পরিভ্রমণ? স্বপ্ন হইলে এ কেমন স্বপ্ন? আর, এই নিদ্রা কি এতই গাঢ় যে, ছুরীর আঘাতে বা আগুনের ছেকাতেও ভঙ্গ হয় না? এরূপ গাঢ়নিদ্রা ত দেখা যায় না। সুতরাং অবশ্যই বুঝিতে হইবে উহা নিদ্রা নহে, অপর কিছু।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুরেন্দ্রের চৈতন্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-বিক্ষেপও বন্ধ হইল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গায়ের কোট ও পায়ের মোজা খুলিয়া বলিল,—আঃ কি গরম, সমস্ত শরীরে ভীষণ ব্যথা হইয়াছে। শেষে জিজ্ঞাসা করিল,—আমার কি মূর্চ্ছা হয়েছিল? এই বলিয়া কাষ্ঠাসনে সোজা হইয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার দেহ আবার কাঁপিয়া উঠিল, আবার সেইরূপ ভীষণ ভাবে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, শেষে তাহার বিন্দুমাত্রও বাহ্যজ্ঞান রহিল না,—অচেতন অবস্থায় সে কত কথা কহিতে লাগিল,—একটা পুকুর,—তাহাতে পদ্মফুল,—সেই পদ্মফুলের পুকুরে স্নান,—মায়ের মন্দির সন্দর্শন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই সময় সুরেন্দ্রনাথের দেহ প্রবল বিক্ষেপে আবার অত্যন্ত প্রকম্পিত ও পরিক্লিষ্ট হইতে লাগিল। তখন সে আকুলকণ্ঠে 'মা' 'মা' বলিয়া উচ্চৈস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ক্রমে তাহার দেহ ধনুকের আকার ধারণ করিল, সে পেটের উপর ভর দিয়া এবং সংলগ্ন পদদ্বয় ও হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া যেন কি প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার এই ভীষণ ক্লেশকর অবস্থা দেখিয়া রাজেন্দ্রবাবু তাহার হাত পা ধরিয়া সোজা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা সকলে ব্যথিত ও বিস্মিত হইলাম।

কিন্তু উহা অপেক্ষা আরও অধিক বিস্ময়কর ব্যাপার তখনই সংঘটিত হইল। সুরেন্দ্র যখন এইরূপ দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতেছিল, ঠিক সেই সময় হঠাৎ শূন্য হইতে তাহার হাতে কি একটা পড়িল। সুরেন্দ্র তখন একেবারে জ্ঞানহারা। তাহার হাত হইতে গড়াইয়া উহা রাজেন্দ্রবাবুর হাতে পড়িল। তিনি উঠাইয়া দেখিলেন, একটি মাদুলী, ও হাতে বাঁধিবার জন্য উহাতে সূতা বান্ধা রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মাদুলীটি সুরেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। উহা পাইবামাত্র সুরেন্দ্রনাথের মোহনিদ্রা যেন ভাঙ্গিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার অঙ্গ-বিক্ষেপও বন্ধ হইল,—সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দক্ষিণহস্তে মাদুলী ধারণ করিল। অমনি তাহার দেহের সমস্ত ক্লেশ দূর হইল,—সে যেন নবজীবন লাভ করিল।

সুরেন্দ্রনাথ কেন হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল, কোথা হইতে এবং কেন তাহার হাতে মাদুলী পতিত হইল, মাদুলী ধারণ করিবামাত্র কেন তাহার অঙ্গ-বিক্ষেপ দূর হইল,—এই সকল ব্যাপার প্রহেলিকা-বিশেষ। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা যাহা অবগত হইয়াছি তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি :—

১৯০৪ সালের ১৩ই জুলাই রবিবারে যথা সময়ে বঙ্গীয় থিওসফিকাল সোসাইটির অধিবেশনে উক্ত সমিতির সভ্যগণ উপস্থিত হইলে, ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন একটি যুবককে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। হেমবাবু বলিলেন,—কয়েক বৎসর হইল এই যুবকের দেহে এক প্রেতাত্মা ভর করিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একদিবস যখন তাহার ভয়ানক অঙ্গ-বিক্ষেপ ও মূর্চ্ছা হয়, সেই সময় সহসা একটি মাদুলী উপর হইতে তাহার হাতে আসিয়া পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। তখন সে বলে যে, তাহার মৃত কনিষ্ঠভ্রাতার আত্মা আসিয়া তাহাকে এই মাদুলী দিয়া গিয়াছে। এই মাদুলী কখনও কখনও অন্তর্হিত হয়। সেই

সময় অঙ্গ-বিক্ষেপ ও মূর্চ্ছাপ্রভৃতিতে তাহার ক্লেশের পরিসীমা থাকে না। আবার সহসা সে ঐ মাদুলী প্রাপ্ত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্লেশ দূর হয়। এই যুবকই পূর্ব্বোল্লিখিত সুরেন্দ্রনাথ দাস। এই সময় হইতে ঝামাপুকুরের রাজেন্দ্র বাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি থিওসফিকাল সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয়।

সুরেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিল। কুসংস্কার উন্মূলনের জন্ত তাহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। ১৯০১ সালে সে বহরমপুর কলেজে অধ্যয়ন করিত ও কলেজের হোষ্টেলে থাকিত। সেই সময় একদিন সান্ধ্য-ভ্রমণের পর সে হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিতেছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ তাহার মৃত কনিষ্ঠভ্রাতার মত একজনকে দেখিতে পাইল, দেখিয়াই চম্‌কিয়া উঠিল। ইহা তাহার চক্ষুর ভ্রম কিনা জানিবার জন্ত, আবার সেইদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। তখন তাহার আর সন্দেহ রহিল না,—কারণ সে যাহাকে দেখিল সে তাহার ছোট ভাই ভিন্ন অপর কেহ হইতেই পারে না। কিন্তু তাহার ভাই ত মারা গিয়াছে, সে আবার কি করিয়া আসিল? সেই মূর্ত্তি দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের ভয় ও বিস্ময়ের এক শেষ হইল। তবুও মনে বলসঞ্চারপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া সে বলিল,—তুমি কি আমার ছোট ভাই?

উত্তর হইল—হাঁ।

সুরেন্দ্রনাথের যাহা একটু সন্দেহ ছিল, তাহাও দূর হইল। সে তখন ভয়ে বিহ্বল হইয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল এবং হোষ্টেলে আসিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ইহার পর হইতেই সুরেন্দ্র স্নায়বীয়-রোগে আক্রান্ত হইল। অনেক চিকিৎসার পর কতকটা সুস্থতা লাভ করিলেও তাহার মূর্চ্ছারোগ একেবারে সারিল না।

মেস্‌মেরাইজ করিয়া ব্যাধিমুক্তি

মেস্‌মেরাইজ করিয়া নানাবিধ পীড়া আরোগ্য হইবার কথা শুনা যায়। কেহ কেহ ইহা স্বচক্ষেও দেখিয়াছেন। ডাঃ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিগত ১৯০৪ সালের ৬ই এপ্রেল তারিখের "শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা" নামক সাপ্তাহিক পত্রে এইরূপ একটি ঘটনা প্রকাশ করেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"১৮৮০ সালের ২৭শে এপ্রিল অপরাহ্নে কলিকাতা মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রিটস্থ ৪৯নং বাসায় আমরা মস্তিষ্কশক্তি (Brain-power) ও মেস্‌মেরিজম্ সম্বন্ধে খুব ঘটা করিয়া আন্দোলন আলোচনা করিতেছিলাম। মেডিকেল কলেজের আমার প্রাচীন সতীর্থগণের মধ্যে পাঁচজন ব্যুৎপন্ন প্রবীন ডাক্তারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই বাসায় আমাদের জনৈক ছাত্র-বন্ধু জ্বরবিকারে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তাহাকে দেখিবার জন্য সেই সময় ডাঃ ভগবানচন্দ্র রুদ্র এম-ডি মহাশয় আসিলেন।

রোগী জ্বরে প্রলাপ বকিতেছিল। চক্ষু লাল, জ্বরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রি। রোগীর শুশ্রূষার যথারীতি ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, অন্য ঘরে আসিয়া, মেস্‌মেরাইজ দ্বারা এই জ্বরবিকার আরাম করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে আমরা আলাপ আলোচনা করিতেছিলাম। রুদ্র মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া আমরা সসম্ভ্রমে উঠিলাম এবং তাঁহার সহিত রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ও ব্যবস্থাপত্র আমার হাতে দিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম,—মহাশয়, এই ঔষধ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন ফলোদয় হয় নাই। তবে মাত্রার কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা

আছে। এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্যে যদি ফলের কোন তারতম্য হয় ত স্বতন্ত্র কথা।

তিনি বলিলেন,—সে ধারণা আমার নাই, তবে আমার বিশ্বাস এইরূপ প্রলাপে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। বহু ব্যবহারেও যদি ফল না হইয়া থাকে, তবে এ ঔষধে কোন ফলের আশা নাই।

তথাপি ঐ ঔষধ আনাইয়া খাওয়ান হইল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। তখন রুদ্র মহাশয়কে বলিলাম,—ইহাতে ফল হইতেছে না, আর কোন উপায় থাকে ত বলুন। তিনি বলিলেন,—আর কি উপায়?

এই সময় সহরে মেস্‌মেরিজমের খুব একটা হুজুগ পড়িয়া গিয়াছিল। মেডিকেল কলেজেও মধ্যে মধ্যে এই বিষয়ের আলোচনা হইত। আমি ডাঃ রুদ্রকে বলিলাম,—আপনি মেস্‌মেরাইজ করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারেন কি? তিনি বলিলেন,—উহাতে আমার বিশ্বাস বড় কম। তবে স্নায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট লোকদিগকে স্বীয় বাসনার আয়ত্বে আনিয়া অনেক প্রকার কার্য্য করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এই রোগীকে মেস্‌মেরাইজ করিয়া বশে আনা অসম্ভব। তোমরা উহার মাথায় বরফের ব্যাগ (ice-bag) প্রয়োগ কর গিয়ে। আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপে বার ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

সুবিধা পাইলেই আমি সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ঘাটে বেড়াইতে যাইতাম। সেদিনও গেলাম। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে যাইয়া দেখি সেখানে এক সন্ন্যাসীঠাকুর বসিয়া আছেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়াই তাঁহাকে সদাশয় বলিয়া বোধ হইল। আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমাকে আলাপ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া তিনি স্নেহভরে বসিতে বলিলেন। আমি হিন্দীভাষা ভাল বুঝিতাম না। সুখের বিষয় তিনি

ইংরাজীতে আলাপ করিতে লাগিলেন, আমার বুঝিবার সুবিধা হইল। আমি ডাক্তারী জানি শুনিয়া তিনি বলিলেন,—চিকিৎসা অনেক প্রকার আছে, কিন্তু যোগবিদ্যার চিকিৎসাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

আমি। উহা কথার কথা, কাজে প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হয় না।

সন্ন্যাসী। (ঈষৎ হাসিয়া) আচ্ছা রোগী পাইলে আমাকে দেখাইও; আমি পরীক্ষা দিয়া তোমার নিকট ভাল সার্টিফিকেট লইব।

আমি। আমার হাতে রোগী আছে, আপনি চলুন।

সন্ন্যাসী। এখন যাইব না, আমার কাজ আছে, তিন ঘণ্টা পরে যাইব, ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া যাও।

ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম এরূপ সুপণ্ডিত সদাশয় ব্যক্তি হইয়াও বুজরুকী ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ঠিকানা ত লিখিয়া রাখিলেন, যাবেন যে, তা মা-গঙ্গাই জানেন! ফলকথা, আমার তখন বেশ ধারণা হইল যে সন্ন্যাসীঠাকুর আমাকে ফাঁকি দিয়া বিদায় করিলেন।

বাসায় আসিয়া দেখি রোগী ছট্‌ফট্ করিতেছে। কখনও শয্যা হইতে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, কখনও জোর করিয়া উঠিয়া কাপড়-চোপড় দিয়া পুটুলী বাঁধিতেছে, আর অনবরত প্রলাপ বকিতেছে। ইহা দেখিয়া সকলেরই মনে হইল রোগীর অবস্থা সুবিধাজনক নহে। প্রকৃতই তখন রোগীর ঘোর বিকার উপস্থিত। মাথায় বরফ দিয়া কোন ফল না হইলেও, অন্য কোন প্রক্রিয়ার বন্দোবস্ত না থাকায়, বরফই দেওয়া হইতেছিল। এইরূপে তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। আমার তখন মনে হইতে লাগিল, গঙ্গাতীরে বসিয়া এইরূপ মিথ্যাকথা বলা কি সন্ন্যাসীর মত ধার্ম্মিক-লোকের কাজ!

এই সময় সহসা সদর-দরজায় "হর হর বম্ বম্ শ্রীমহাদেব

শব্দো” ধ্বনি শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। দরজা খুলিয়া দেখি সম্মুখে সন্ন্যাসীঠাকুর দাঁড়াইয়া! তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া তখনই উপরে রোগীর ঘরে লইয়া গেলাম। সন্ন্যাসীঠাকুর কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া রোগীর শয্যায় ও তাহার গায়ে ছিটাইয়া দিলেন। তাহার পর রোগীর সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া তাহার চক্ষুর দিকে একদৃষ্টে চাহিলেন। রোগী মুখ বাঁকা করিল। সন্ন্যাসী হাত দিয়া তাহার মুখখানি সোজা করিয়া, আবার তাহার চক্ষুপানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিলেন। সন্ন্যাসীর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আমার বোধ হইল উহা যেন রোগীর বহির্দৃষ্টি ভেদ করিয়া তাহার মস্তিষ্কের নিভৃত-প্রদেশে প্রবেশ করিতেছে। তখন বোধ হইল, রোগী যেন তার সেই জবাকুসুম-সঙ্কাশ আরক্ত-লোচনে সন্নাসীর দিকে স্তম্ভিত ও স্থির ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। ঠিক পাঁচমিনিটকাল তাহার চক্ষুর স্পন্দন হইল না। অবশেষে চক্ষুর কোণে জল আসিয়া চক্ষুর্দ্বয় ছলছল হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসীঠাকুর স্নিগ্ধ অথচ তীক্ষ্ণ ও স্থির দৃষ্টিতে সমভাবে রোগীর পানে চাহিয়াই রহিলেন। রোগীর চক্ষু ধীরে ধীরে ছোট হইয়া আসিল ও ক্রমে মুদিত হইল। তখন সন্ন্যাসী মন্ত্রপাঠ করিয়া রোগীকে ঝাড়িতে লাগিলেন। রোগী যেন গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—বারটার পর রোগী জাগিবে ও খাইতে চাহিবে। তখন দুধ খাইতে দিবে। শেষে হাসিয়া বলিলেন,—আর আগামী কল্য আমাকে সার্টিফিকেট দিও। এই কথা বলিয়া, আর তিলার্দ্ধকাল অপেক্ষা না করিয়া, তিনি চলিয়া গেলেন।

আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ১২টা বাজিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ঘরে কোন গোলমাল কি শব্দ না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, আমরা চারিজন বন্ধু রোগীর কাছে বসিয়া রহিলাম।

রাত্রি ১১টার সময় হইতে রোগীর দেহ হইতে দরদরিত ধারায় ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। ১২টা বাজিবার পরেই রোগী চেতনালাভ করিল, এবং ক্ষীণ-স্বরে বলিল,—বড় ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও।

আমরা দেখিলাম রোগীর চক্ষুতে রক্তরেখার লেশমাত্র নাই। তাহার দেহের তাপ ৯৭ ডিগ্রির ও কম, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক, নাড়ী ধীর অথচ সমগতি। রোগীকে দুধ খাইতে দিলাম। প্রদীপের আলো ক্ষীণ করা হইল। আমাদের মধ্যে দুইজন শয়ন করিলেন। রোগী বলিল,—আমি বেশ আছি, আপনারাও শয়ন করুন। আমার তখন মনে হইতেছিল, যদি বেশী ঘর্ম্ম হইয়া দেহের তাপ আরও কমিয়া যায় তখন কি হইবে? কাজেই আমি শুইলাম না। কিন্তু ১২টার পর রোগীর আর ঘাম হইল না। এক ঘণ্টা পরে রোগীর নাড়ী ও হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলাম আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিলাম।

পরদিবস সকাল ৭টার সময় উঠিয়া রোগীর ঘরে গিয়া দেখি তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, বেশ ভাল আছে, সহসা জ্বর বিচ্ছেদ হওয়ায় কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তখন কুইনাইন দেওয়া হইবে কি না এই প্রশ্ন উঠিল। শেষে সাব্যস্থ হইল কুইনাইন বা অপর কোন ঔষধই দেওয়া হইবে না।

তখন সন্ন্যাসীঠাকুরকে সার্টিফিকেট (অর্থাৎ সাধুবাদ) দিবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে গেলাম; কিন্তু সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। এমন কি, তাঁহার কোন চিহ্নও সেখানে নাই। তখন দুঃখিত মনে বাসায় ফিরিলাম এবং রোগীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম।

রোগী বলিল, কি প্রকারে সে রোগমুক্ত হইল, তাহার বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। তবে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছিল যেন মহাদেব বিছানার কাছে বসিয়া ঢুলুঢুলু নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন, আর ধীরে

ধীরে তাহার দেহ নিদ্রায় অবশ হইয়া আসিতেছে। ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু রোগী বলিতে পারিল না।

রোগী ক্রমে বেশ সুস্থ ও সবল হইল, তাহার কোন ঔষধের প্রয়োজন হইল না। কিন্তু আমাদের মনে একটা খট্‌কা থাকিয়া গেল। আমরা ভাবিলাম, চোখের দিকে চাহিয়া এইরূপ ভীষণ জ্বরবিকার আরোগ্য করা হইল, ইহা কি প্রকারের শক্তি? ইহা কি দৈবশক্তি কিংবা মানুষী-শক্তি? মানুষ যে এই প্রকারের দৈবশক্তি দেখাইতে পারে তাহা কিন্তু মানিতাম না। আমরা মেস্‌মেরিজমের কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু ডাঃ রুদ্র বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এই রোগীকে মেস্‌মেরাইজ করা আদৌ সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ মেস্‌মেরাইজ করিতে হইলে রোগীর স্বাভাবিক জ্ঞান (natural consciousness) থাকা আবশ্যক। বিকারগ্রস্ত-রোগীর সেরূপ জ্ঞান থাকে না; কাজেই তাহাকে স্বীয় আয়ত্তাধীনে আনা যায় না। রুদ্র মহাশয়কে শেষে সকল কথা জানাইলাম। তিনি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, প্রকৃত কারণ স্থির করিতে পারিলেন না।

প্রকৃতই রোগীর বিকার অতি ঘোরতর হইয়াছিল। বাহ্যজগতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। সে তখন আপন মনে কথা বলিতেছিল। কেহ ডাকিলে সে কথার সাড়া দিত না, কেহ তাকাইলে তাহার দিকে তাকাইত না। সুতরাং কাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে হইলে তাহার মস্তিষ্ক-বৃত্তিকে যে প্রণালীতে স্বীয় আয়ত্বে আনিতে হয়, এস্থলে তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। দৃষ্টির একাগ্রতা সাধন দ্বারা স্নায়ু-প্রণালী অবশীভূত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষকে আপন আয়ত্তাধীনে আনা যাইতে পারে। কিন্তু যে রোগী একেবারেই বাহ্যজ্ঞানহীন, তাহার দৃষ্টির একাগ্রতা সাধনই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

ইতঃপূর্ব্বে আমি ফিজিয়লজীর আলোক লইয়া নিম্নলিখিত প্রকারে মেস্‌মেরিজম্ বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম; যথা,—যিনি মেস্‌মেরাইজ করেন, তিনি তদুপযুক্ত ব্যক্তিকে কোন উজ্জ্বল বা অপর কোন পদার্থের প্রতি, অথবা তাঁহার নিজের চক্ষুর প্রতি, একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে আদেশ করেন। এই অবস্থায় কাহারও কাহারও দৃষ্টি অল্পক্ষণ মধ্যে অস্পষ্ট বা তিমিরাবৃতের ন্যায় হইয়া পড়ে, দেহ অবসন্ন হইয়া আসে, চক্ষুর পাতা ক্রমে জুড়িয়া যায়, হাই উঠিতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাস ঘনঘন বহিতে থাকে, এবং চেতনাশক্তি ক্রমে লোপ পাইতেছে বলিয়া বোধহয়।

এই সকল লক্ষণ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক, এবং ইহার ফলে এই ব্যক্তির মনোবৃত্তি বা বাসনা, যে ব্যক্তি মেস্‌মেরাইজ করেন তাঁহার বাসনার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ে। তিনি তখন উহাকে যেরূপভাবে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করেন, সে সেই ভাবেই পরিচালিত হয়। তিনি যদি বলেন,—তুমি অন্ধ হইয়াছ, তবে সে প্রকৃতই অন্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহার দৃঢ় ধারণা হয় এবং সে ঠিক অন্ধের ন্যায় আচরণ করে; তিনি যদি বলেন,—তুমি বোবা, তবে সে ঠিক বোবার ন্যায় শব্দ করে। এই প্রকারে বশীভূত ব্যক্তিদ্বারা বশকারী ব্যক্তি যথেচ্ছরূপে বিবিধ কার্য্য করাইতে পারেন। এমন কি, তাহার ইন্দ্রিয়শক্তির উপরেও যথেচ্ছা অত্যাচার করা যাইতে পারে। যদি বশীভূত ব্যক্তির হাতে রশুন দিয়া বলা যায় যে ইহা গোলাপফুল, তাহা হইলে রশুনের ঘ্রাণ লইয়া সে বলিবে গোলাপফুলের সুমধুর গন্ধ পাইতেছে।

এই সকল ঘটনা দেখিয়া আমার মনে হইত, সরল ও শান্ত প্রকৃতির লোক-বিশেষের স্নায়ু-প্রণালীর উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়া অভিসন্ধি-শীল বশীকরণ-বিদ্যাবিদ্‌গণ এই প্রকার বুজরুকী দেখাইয়া থাকেন। ফিজিয়লজীর nervous systemএর সূক্ষ্মতত্ত্বের কথা তুলিয়া

ইহার ব্যাখ্যা করিতে আমি প্রবৃত্ত হইতাম। আমি বলিতাম, মস্তিষ্কে শ্বেতসূত্রবৎ একপ্রকার পদার্থ আছে, উহা ত্রিবিধভাবে বিন্যস্ত; এক প্রকার শুভ্র-সৌত্রীণ পদার্থ নিম্নদিক হইতে উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া Hemespherical ganglionকে কশেরুকা মজ্জার (spinal cordএর) সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেয়।

অপর প্রকার শুভ্র-সৌত্রীণ পদার্থ অনুপ্রস্থভাবে অনুসৃত হইয়া দুই অর্দ্ধ-গোলকের (Hemespheres) মিলন সাধন করে। তৃতীয় প্রকার সৌত্রীণ পদার্থ অগ্রভাগের সহিত পশ্চাদ্ভাগের সম্মিলন সাধন করে। মনুষ্যের চিন্তাকার্য্যে এই সকল সূত্র প্রধান সহায়। বর্ত্তমান সময়ে দার্শনিকগণ (Metaphysicians) এবং শরীরবিচারবিদ্‌গণ (Physiologists) স্বীকার করেন যে, মন বিবিধ চিত্তবৃত্তির সমষ্টি মাত্র, এবং মনের বিবিধ কার্য্যসাধনের জন্য বিবিধ প্রকার স্নায়ুশক্তির প্রয়োজন হয়। মস্তিষ্কের কোন্ অংশের স্নায়ুদ্বারা কোন্ কার্য্য সম্পন্ন হয়, বর্ত্তমান ফিজিয়লজী যদিও অতীব ক্ষীণালোকে সেই সকল তত্ত্ব পাঠ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, কিন্তু সময়ে সম্ভবতঃ এই সূক্ষ্ম জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইলে আমরা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিব যে, স্নায়বীয় প্রণালীর কার্য্যবিশেষ দ্বারাই এই সকল ঘটনা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু সন্ন্যাসীঠাকুর এই ভীষণ বিকারগ্রস্থ রোগীর বিকৃত স্নায়ুর উপর কি কৌশলে এই অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, তাহা আমি আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। ম্যানচেষ্টারের ডাঃ ব্রেড যে অবস্থাকে নিউরো-হিপ্‌নোটিজম্ (Neuro-hypnotism) বলেন এবং সাধারণ লোকে যাহাকে হিপ্‌নোটিজম্ (hypnotism) বলে, এই প্রকার রোগীর পক্ষে সে অবস্থা একেবারে অসম্ভব। যাঁহারা স্নায়ুবিকারের সংপ্রাপ্তি বা Pathology জানেন, তাঁহারা কিছুতেই মনে করিতে পারিবেন না যে,

সন্ন্যাসীঠাকুরের এই প্রক্রিয়া নিউরো-হিপ্‌নোটিজম্ (Neuro-hypnotism) মাত্র। সুতরাং আমি জড়ীয়-বিজ্ঞানে যে প্রকারে মেস্‌মেরিজমের ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম, এস্থলে তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল।

আমি ও সরোজকান্তি

আমার জ্যেঠতুত ভাই সরোজকান্তি আমার এক বৎসর চারিমাসের ছোট। আমাদের মধ্যে যেরূপ সম্প্রীতি ছিল, সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। আমরা দুই ভাই সর্ব্বদা একত্র থাকিতাম,—একত্র আহার না করিলে আমাদের তৃপ্তি হইত না, এক সঙ্গে শয়ন না করিলে নিদ্রা হইত না, একস্থানে বসিয়া না পড়িলে পাঠে মন যাইত না। একত্র খেলা, একত্রে বেড়ান, একত্র স্নান ইত্যাদি সকল কার্য্যই আমাদের এইরূপ একত্র ছিল। এইভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে আমরা কলিকাতায় আসিলাম। ইহার আট বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে, আমরা (ছোটকাকা, সরোজকান্তি ও আমি) ঢাকায় আমার বড়পিসিমার কাছে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইবার কিছুদিন পরে সরোজকান্তি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় আমাদের কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। এখানে চিকিৎসায় কোন উপকার না হওয়ায়, সেজকাকা (শিশির বাবু) সপরিবারে সরোজকে লইয়া বৈদ্যনাথে গেলেন; সেই সঙ্গে রাজাকাকা, মেজপিসিমা ও আমি গিয়াছিলাম।

সেখানে যাইয়া কিছুদিনের মধ্যে সরোজের জ্বর বিচ্ছেদ হইল, এবং ক্রমে সে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন সময়,—সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবার পূর্ব্বেই,—হঠাৎ সরোজ আমাশয়-রোগে আক্রান্ত হইল। এই ধাক্কাও কতকটা সে সামলাইয়া উঠিল; শেষে ডাক্তার তাহাকে অন্নপথ্যও দিলেন।

যেদিবস সরোজ অন্নপথ্য পাইল, সেইদিন বৈকালে আমরা একত্রে বসিয়া কলিকাতায় যাওয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। ডাক্তার তাহাকে কলিকাতায় যাইতে বলিয়াছেন শুনিয়া সরোজের অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছিল; দুর্ব্বলতা সত্বেও সে উঠিয়া বসিয়া কলিকাতার পত্রে ২।৪ ছত্র লিখিয়া দিল।

রাত্রে আহারান্তে আমরা শয়ন করিলাম। আমরা দুই ভাই একঘরে পাশাপাশি দুইখানি খাটিয়ায় শুইতাম। অপর সকলে অন্যান্য ঘরে শুইতেন। সেদিন শয়ন করিয়া আমরা দুইজনে কলিকাতায় যাওয়া সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলাম, শেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

শেষরাত্রে একটা করুণ ক্রন্দনের ধ্বনি কাণে যাইয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। দেখি, সরোজকান্তি ক্ষীণ করুণস্বরে কাঁদিতেছে। এইভাবে কাঁদিবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমি তাড়াতাড়ি তাহার বিছানায় যাইয়া বসিলাম, এবং সান্ত্বনা দিবার জন্য তাহার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলাম। তাহার ক্রন্দনের বেগ কতকটা কমিয়া আসিলে, আদর-ভরে তাহাকে বলিলাম,—কেন কাঁদছ, সরোজ?

মনের আবেগে প্রথমে সে কোন কথা কহিতে পারিল না; শেষে অনেক কষ্টে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।

একে সে অতিশয় দুর্ব্বল, তারপর তাহার মনের এইরূপ আবেগ

দেখিয়া, আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম ; তাই স্বপ্নের কথা শুনিয়া, কোমল-কণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে ?

পরলোকগত আত্মীয়ের সাক্ষাৎ

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজকান্তি ধীরে ধীরে বলিল,—দেখ্‌ছিলাম, মা বাবা ও আরও কতজন,—যাঁরা মারা গিয়াছেন,—আমার কাছে বসে আছেন। তাঁদের মুখ মলিন। তাঁদের দেখে আমি কাঁদ্‌ছিলাম। কত কথা তাঁরা বল্লেন, সব আমার মনে নাই।

সরোজকান্তি অত্যন্ত আবেগের সহিত এই কথাগুলি বলিল। ইহা শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া আমার চক্ষুতে জল আসিল। কিন্তু পাছে সরোজ অধিক কষ্ট পায়, সেইজন্য মনের বেগ ধারণ করিলাম ; এই সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা না করিয়া বলিলাম,—এখনও রাত্রি আছে একটু ঘুমাও, আমি তোমার গায়ে হাত বুলায়ে দিই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজ বলিল,—দাদাবাবু, বড় শীত বোধ হচ্ছে।

আমি তাড়াতাড়ি একখানা মোটাচাদর দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলাম। কিন্তু তাহাতে তাহার শীত কমিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—বড় শীত, হাত পা বড় ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। তখন দেখি, তাহার হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা !

তখন ভাদ্রমাস, শীতের কোন চিহ্ন নাই, তবে কেন সরোজের হাত পা এরূপ ঠাণ্ডা হইল,—ইহাই ভাবিয়া মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন সকলকে ডাকিলাম। তাঁহারা আসিলেন, এবং আগুন

করিয়া সরোজের হাত পা সেঁকিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না।

ক্রমে ভোর হইল। ডাক্তারকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিলেন, এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি সরোজের কাছে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে ও তাহাকে সময় মত ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলাম। কিন্তু ঔষধে কোন ফল হইল না,—অবস্থা ক্রমেই যেন খারাপ হইতে লাগিল।

সরোজের পরলোকগমন

সরোজকান্তির অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। আমার তখন চিন্তাশক্তি রহিত হইয়াছে। কে কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন, সেদিকে আদপে আমার লক্ষ্য নাই; আমি বিভোর ভাবে রোগীর সেবা করিয়া যাইতেছি।

এমন সময় সরোজ আমার দিকে চাহিয়া কাতর-কণ্ঠে ক্ষীণস্বরে বলিল,—দাদাবাবু, বড় কষ্ট।

তাহার সেই কথা শুনিয়া ও কাতর ভাব দেখিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু মুখে সেরূপ কোন ভাব প্রকাশ করিলাম না; বরং তাহাকে প্রবোধ দিতে ও তাহার কষ্ট লাঘবের জন্য নানা রকম চেষ্টা করিতে লাগিলাম; শেষে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি কষ্ট হচ্ছে, সরোজ?

সরোজকান্তি বলিল,—বুঝ্‌তে পারছি না। তারপর ক্ষীণস্বরে বলিল,—এই হাতখানা অসাড় বোধ হচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই হাতে ঔষধ মালিস করিতে লাগিলাম।

একটু পরে সরোজকান্তি বলিল,—এই পা খানা অবশ বোধ হচ্ছে। আমি অমনি সেই পায়ে মালিস করিলাম।

ক্রমে তাহার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইতে লাগিল। তখন সরোজ অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—বড় কষ্ট, কি কর্‌ব, দাদাবাবু?

এতক্ষণ তাহার কণ্ঠের স্বর ক্ষীণ হইলেও বেশ সুস্পষ্ট ছিল, কিন্তু ক্রমে কথা জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

এই সময় সেজকাকা আসিয়া আমাকে ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেলেন, এবং বলিলেন,—তুমি এখানে একটু বিশ্রাম কর, আমি সরোজের কাছে বস্‌ছি।

আমার তখন বিভোর অবস্থা। কেন যে সেজকাকা আমাকে সরোজের নিকট হইতে উঠাইয়া আনিলেন, সে কথা একবারও মনে হইল না। ফল কথা, সরোজের তখন যে শেষ-অবস্থা, তাহা চোখে দেখিতেছি বটে, কিন্তু মনে ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া, অর্দ্ধচেতন অবস্থায় সেখানে পড়িয়া রহিলাম।

পার্শ্বের ঘর হইতে মধ্যে মধ্যে সরোজের ক্ষীণকণ্ঠের "দাদাবাবু" ডাক কাণে আসিতে লাগিল। ক্রমে তন্দ্রাভাবাপন্ন হইলাম। সেই তন্দ্রার ভরে দেখিতে লাগিলাম যেন পরলোকগত নিজজনেরা আসিয়াছেন এবং সরোজকে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি সেই সঙ্গে যাইতে চাহিতেছি। সরোজও আমাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজি হইতেছে না। শেষে, কি এক কারণে,—আমার ঠিক স্মরণ নাই,—আমার যাওয়া হইল না; তাঁহারা সরোজকে তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও লইয়া চলিলেন। সরোজ যেন আমার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া 'দাদাবাবু' 'দাদাবাবু' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, তাঁহারা সরোজকে যতই দূরে লইয়া যাইতেছেন,

ততই তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমে অধিকতর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। শেষে তাঁহারা সরোজকে যেমন আমার চক্ষুর অন্তরালে লইয়া গেলেন, অমনি 'দাদাবাবু' ডাক আর শুনিতে পাইলাম না; সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের রোল উঠিয়া আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল,—আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

আমার আবেশ অবস্থা

সরোজকে চিরতরে বৈদ্যনাথে রাখিয়া আমরা কলিকাতায় আসিলাম। তারপর কিছুকাল কাটিয়া গেল। শোকের বেগও ক্রমে কমিয়া আসিল। এই সময় একদিন প্রাতে নির্জ্জনে একাকী বসিয়া একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেছিলাম; পাঠে বেশ মনও লাগিয়াছিল; এমন সময় আমার দেহে অবসাদের ভাব আসিতে লাগিল। প্রথমে ইহা গ্রাহ্য করিলাম না, ভাবিলাম এখনই কাটিয়া যাইবে। কিন্তু যখন দেখিলাম উহা সহজে যাইতেছে না, তখন চোখ রগ্‌ড়াইয়া এই ভাব কাটাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না, বরং শরীর আরও অধিক ভারাক্রান্ত বোধ হইতে লাগিল, এবং ক্রমে চক্ষুদ্বয় স্থির হইয়া আসিল। পুস্তকের দিকে চাহিয়া আছি বটে, কিন্তু পাঠে মন যাইতেছে না। ক্রমে হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল; তারপর কান্না পাইতে লাগিল। সেই কান্না ক্রমে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, হৃদয়ের বেগ বাড়িয়া চলিল, শ্বাস-প্রশ্বাস গাঢ় হইয়া আসিল, শেষে সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তারপর, প্রথমে হাত পা, ও ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল,—আমি একরূপ হতচৈতন্য হইয়া পড়িলাম।

আমার মনের বেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি হাঁপাইতে লাগিলাম,—হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁদিয়া ফেলিলাম। "কাঁদিয়া ফেলিলাম" বলিলাম বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি কাঁদিলাম না,—কে যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া করুণ-স্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আমার চেতনা কতকটা বিলুপ্ত হইলেও আমি সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হই নাই। অন্য লোকে যাহা বলিতেছেন, তাহা আমার কাণে প্রবেশ করিতেছে এইমাত্র,—তাহার উত্তর দিবার, কিংবা তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিবার ক্ষমতা তখন আমার লোপ পাইয়াছে। ফলকথা, তখন কেহ যেন আমার মন-প্রাণ-দেহ সমস্তই এরূপভাবে অধিকার করিয়াছে যে, আমার কোন রকম শারীরিক বা মানসিক কার্য্য করিবার সাধ্য মোটেই নাই।

এই সময় বোধ হইতে লাগিল, কেহ যেন আমার হৃদয়ের মধ্য হইতে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু অনেক দূর হইতে অতিশয় বেগের সহিত দৌড়িয়া আসিয়াই কথা বলিতে গেলে যেমন ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে থাকে,—মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হয় না, আমারও মনের আবেগের জন্য সেইরূপ কথা বাহির হইতেছিল না। এই ভাবে কিছুক্ষণ জোরে জোরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইল,—আ—মি আ—মি সরোজ,... দাদা—বাবুকে ছেড়ে থাকৃতে পারছি না,...বড়ই কষ্ট হচ্ছে...আমি এখানে বাবা ও মার কাছে আছি। এইরূপ আরও কতকগুলি কথা বাহির হইল, সমস্ত কথা আমার স্মরণ নাই।

ক্রমে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, আমার সমস্ত শরীর ঝাঁঝাঁ করিতে লাগিল। তখন আমার চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া ও পাখার বাতাস করিয়া আমাকে প্রকৃতিস্থ করা হইল।

এই প্রথম আমার দেহের উপর আত্মার ভর হইল। সেই সময় হইতে আমার মনে হইতে লাগিল সরোজ যেন সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে রহিয়াছে। তখন হইতে চক্রে বসিলেই সরোজের আত্মা আসিয়া, হয় আমার কিংবা অপর কাহারও উপর ভর করিতে লাগিল। ক্রমে আমি একজন ভাল মিডিয়ম হইলাম। আবেশাবস্থায় আমার মুখ দিয়া অনেক কথা এবং হাত দিয়া অনেক লেখা বাহির হইয়াছে, চোখ বুঁজিয়াও নানাশ্রেণীর আত্মা ও তাঁহাদের আবাসস্থান বহুবার দেখিয়াছি।

আমার রাঙ্গাকাকা বিনোদীলালের পরলোকগমনের কিছুকাল পরে একদিন আমার নূতনকাকা রামলাল ও আমি চক্রে বসিয়াছিলাম। রাঙ্গাকাকার আত্মা আমার উপর ভর করিয়া নূতনকাকার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন। তাঁহাদের দুই ভ্রাতায় বেশ সম্প্রীতি ছিল। অনেক সময় নূতনকাকা গাহিতেন, আর রাঙ্গাকাকা বাঁয়া-তবলা লইয়া বাজাইতেন। সে দিন আমার উপর ভর করিয়া, অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, রাঙ্গাকাকা নূতনকাকাকে গান গাহিতে বলিলেন, এবং নিজে বাজাইবার জন্য একটা বাঁয়া চাহিলেন। আমার নিকট বাঁয়া দেওয়া হইল। আমি আদপে বাজাইতে জানিতাম না, এখনও জানি না; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে দিন নূতনকাকা গাহিতে লাগিলেন, আর রাঙ্গাকাকা দ্বারা আবিষ্ট হইয়া আমি সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে তালে মানে বেশ বাজাইতে লাগিলাম।

আবেশ অবস্থায় সকল সময় আমার একেবারে চেতনা লোপ পাইত না। সেই অবস্থায়, কথা বলিয়া বা লিখিয়া উত্তর দিবার সময়, কখনও কখনও সন্দেহ হইত,—এই যে উত্তর দেওয়া হইতেছে, ইহা কি আমার নিজের মনের ভাব অথবা কোনও আত্মার কথা? ইহাই লইয়া মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে করিতে, হঠাৎ এমন একটা

উত্তর বাহির হইয়া পড়িত, যাহা এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও আমার মনে উদিত হয় নাই। তখন বেশ বুঝিতে পারিতাম, ইহা আমার নিজের কথা নহে; কোনও মুক্তাত্মা আমার উপর ভর করিয়াছেন, এবং ইহা তাঁহারই কথা। ইহাতে মনে বেশ একটু আনন্দ ও সোয়াস্তি অনুভব করিতাম।

আবার কখনও আমার অচেতন অবস্থায় এরূপ কোন আত্মার ভর হইত, যাঁহার কথা আমি কখনও ভাবি নাই, কিংবা যাঁহাকে আদপে জানি না। এই শেষোক্ত আত্মা আসিয়া অনেক সময় আত্ম-পরিচয় দিতেন এবং এরূপ সকল কথা বলিতেন যাহা আমার জানিবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। শেষে অনুসন্ধান করিয়া ইহার অনেক কথা যথার্থ বলিয়া জানা যাইত।

এই প্রকারে বহুবৎসর ধরিয়া পরলোক সম্বন্ধে যে সকল অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে বিশ্বাস হইয়াছে যে, পরজগতের এবং পরলোকের আত্মাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

নিদ্রিতাবস্থায় আমাদের জড়দেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ বহির্গত হইয়া ইহজগত ও পরজগতে বিচরণ করিয়া থাকে, এরূপ ঘটনা গ্রন্থে অনেক পাঠ করা যায়। যাঁহারা নিজ-জীবনে এই ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতের অভাব নাই। আমার নিজের জীবনে স্বপ্নাবস্থায় একটী বিষয় অনেকবার অনুভব করিয়াছি। অনেক সময় স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, সিঁড়ি দিয়া উপর হইতে নামিতেছি, কিন্তু সিঁড়ির ধাপে পা লাগিতেছে না, অর্দ্ধ কি এক হস্ত উপরে থাকিয়া শূন্যভরে নামিয়া আসিতেছি। আবার এরূপও দেখিয়াছি, কোথায়ও যাইবার সময় মাটি হইতে কিছু উপর

দিয়া শূন্যভরে উড়িয়া যাইতেছি। কখন বা দেখিয়াছি যে, ভয় পাইয়া দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু পা চলিতেছে না। তখন লাফাইয়া মাটি হইতে উপরে উঠিয়া উর্দ্ধশ্বাসে শূন্যভরে চলিয়াছি। ইহা যে সূক্ষ্মদেহের কার্য্য তাহা যাঁহারা এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহারাই অবগত আছেন।

কখন চক্ষু বুঁজিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেহ ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শেষে অর্দ্ধচেতনা বা চেতনাশূন্য অবস্থায় দিব্যদৃষ্টি-শক্তিবলে বিভিন্ন স্তরের জ্যোতির্ম্ময় আত্মাদিগকে ও তাঁহাদিগের জ্যোতির্ম্ময় আবাসস্থান সকল দেখিয়া বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছি।

শিশিরকুমার ও কুমুদিনী

ভুবনমোহিনীর পরলোকগমনের পাঁচবৎসর পরে শিশিরকুমারকে পুনরায় বিবাহ করিতে হইল। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী কুমুদিনী প্রথমা স্ত্রী ভুবনমোহিনীর ন্যায় প্রেমময়ী ছিলেন না বটে, কিন্তু অধিকতর বুদ্ধিমতী ছিলেন বলিয়া সেবা ও যত্নের দ্বারা ক্রমে পতির সমস্ত হৃদয়খানি অধিকার করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ভুবনমোহিনীর সম্বন্ধে দম্পতিযুগলের মধ্যে কখন কখন কথাবার্ত্তা হইত। স্বামীর মুখে সতীনের সুখ্যাতি ও স্বামীর প্রতি তাঁহার নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা শুনিয়া কুমুদিনী কিছুমাত্র ঈর্ষান্বিতা হইতেন না, বরং সতীনের প্রতি তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধাঞ্জলি যেন আপনি আসিয়া পড়িত। অনেক সময় স্বামীস্ত্রীতে এই ভাবের কথাবার্ত্তা হইত, যথা :—

স্বামী। তোমার দিদির এমন অনেক গুণ ছিল যাহা এখনকার দিনে অতি বিরল।

স্ত্রী। (গদ্‌গদ্ স্বরে) হাঁ, তাহা শুনিয়াছি। তাঁহার কথা শুনিতে আমার বড়ই ভাল লাগে। তোমার উপর তাঁহার ভালবাসার কথা যখনই শুনি তখনই তাঁহার চরণে মাথা লুটাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়, আর তাঁহার মত করে তোমাকে ভালবাসিতে পারি না বলিয়া দুঃখ হয়।

স্বামী। কিন্তু সে যে তোমার সতীন, তাহার উপর তোমার কি ঈর্ষা হয় না?

স্ত্রী। (ভাববিহ্বল হইয়া) তাঁহার উপর ঈর্ষা! সেই দেবীর উপর ঈর্ষা! বল কি? বরং আমার উপর তাঁহারই ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ তাঁহারই জিনিষ তোমাকে আমি পাইয়াছি; আর, এই অধিকার দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাছে আমি চিরবিক্রীত। তাঁহার এ ঋণ শুধিবার নহে। তাঁহার উপর আমার ভক্তিশ্রদ্ধার যে সীমা নাই! আমি প্রতিদিন তাঁহার কাছে যত প্রার্থনা করি, শ্রীভগবানের নিকটও বোধহয় তত করি না। তাঁহার কাছে কি প্রার্থনা করি জান? আমি যোড়করে তাঁর উদ্দেশে এই বলে প্রার্থনা করি,—হে দেবি! স্বামীর উপর তোমার যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, তাহার এক কণাও যেন আমি পাই।

মৃত্যুশয্যায় ছায়ামূর্ত্তি-দর্শন

এইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কুমুদিনীর ছয় পুত্র ও দুই কন্যা হয়, তাহার মধ্যে দুইটী পুত্র তাঁহার জীবিতাবস্থায় মারা যায়। ক্রমে কুমুদিনী পীড়িত হইয়া পড়িলেন। শেষে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিহ্বলাবস্থায় তিনি বলিয়া উঠিলেন,—ঐ সধবা সুন্দরী রমণীটি কে? আহা! কি স্নেহপূর্ণ চাহনি! আমি ত ইহাকে

কখনও দেখি নাই! এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বাকরোধ হইল, তিনি পরলোকে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের বিশ্বাস ইনি অপর কেহ নহেন,—শিশিরকুমারের প্রথমা স্ত্রী ভুবনমোহিনী। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেহ কেহ এইভাবে পরলোকগত নিজজনদিগকে দেখিতে পাইয়া থাকেন।

মধ্যে কয়েক বৎসর শিশিরকুমার চক্রে বসিবার সময় ও সুবিধা পাইতেন না। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় আমাদের পারিবারিক-চক্রে নিয়মমত বসিতে সুরু করিলেন। কিন্তু এই চক্রে ভাল মিডিয়মের অভাবে তিনি পরলোকবাসীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। সেইজন্য ভাবিলেন, এমন একজনকে মিডিয়ম করিবেন, যাহাকে লইয়া তিনি স্বতন্ত্রভাবে চক্রে বসিতে পারেন, এবং যাহার কথাবার্ত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন। শিশিরবাবু অনেক দিন হইতে পারলৌকিক-চর্চ্চা করিয়া এই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই ভাল মিডিয়ম হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি বাছিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল না।

সুহাসনয়নার আবেশাবস্থা

তিনি দেখিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠাকন্যা সুহাসনয়না ক্রমে একজন ভাল মিডিয়ম হইতে পারিবে। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাহাকে লইয়া চক্রে বসিতে সুরু করিলেন। কয়েক দিন নিয়মমত বসিবার পর, একদিন সুহাসের উপর আত্মার ভর হইল। প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল; তারপর দুই হাতে টেবিল চাপ্ড়ান সুরু হইল। ক্রমে মনে হইল

মিডিয়ম লিখিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা দেখিয়া টেবিলের উপর সাদা কাগজ রাখিয়া সুহাসের হাতে পেন্সিল দেওয়া হইল। প্রথমে কাগজে হিজিবিজি কাটিয়া, পরে প্রশ্নোত্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা হইল :—

আমি যখন এখানে একা ছিলাম, তখন অনেকটা শান্তিতে সময় কাটিত। এখন আমার সঙ্গিনী জুটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে সুস্থির হইতে পারিতেছি না, কারণ তুমি এখন ওখানে একা রহিয়াছ। তবে আর বেশীদিন এইভাবে যাইবে না, তোমার শীঘ্রই এখানে আসিতে হইবে। তখন আমরা তিন জনে মনের সুখে শ্রীভগবানের নামগান করিতে পারিব। কুমুদিনীর জন্য তুমি বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছ বলিয়া সে প্রায় তোমার কাছে আসে, সেইজন্য আমি আর আসি না। আজ সে অনেক জিদ করায় আমি আসিয়াছি। সেও এখানে আছে।

এই পর্য্যন্ত লেখা হইবার পর সুহাসের হাত হইতে পেন্সিল পড়িয়া গেল। তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে দেখিয়া অনেক চেষ্টায় তাহার আবেশ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। সহজ জ্ঞান হইলে, কাগজগুলি পাঠ করিয়া সে অবাক্ হইল; তখন বলিয়া উঠিল,—এ আবার কে লিখিল? আমারই লেখার মত বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি লিখিয়াছি বলিয়া ত মনে হইতেছে না! ইহাতে আবার আমার মার নাম ধরিয়া লেখা আছে। আজ চক্রে বসিয়া কেবল মার কথাই ভাবিতেছিলাম, কিন্তু তিনি নিজের নাম ধরিয়া নিজে লিখিবেন কেন? অবশ্য আমার বিমাতা লিখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কথা ত আমি একবারও ভাবি নাই!

সুহাসের জন্মের বহুপূর্ব্বে তাহার বিমাতা পরলোকগত হন; কাজেই তাঁহার কথা সুহাসের মনে আসিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আর একটা কথা। আবেশাবস্থায় যাঁহার চেতনা একেবারে বিলুপ্ত হয়,

তিনিই ভাল মিডিয়ম হইয়া থাকেন। কারণ আবেশাবস্থায় জ্ঞান থাকিলে অনেক সময় নিজের মনের ভাবের সঙ্গে, যে আত্মার ভর হয় তাহার ভাবের গোলমাল হইয়া যায়। সুহাসের কথায় বেশ বুঝা যায় যে, আবেশাবস্থায় তাহার আদপে জ্ঞান ছিল না। সুতরাং তাহার হাত দিয়া যে লেখা বাহির হইয়াছিল, তাহা যে কোন পারলৌকিক-আত্মার লেখা তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পরদিবস চক্রে বসিয়া সুহাসের উপর এক আত্মার ভর হইল। শিশিরবাবু তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে কোন উত্তর পাওয়া গেল না; পরে গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল,—আমি তোমার বাবা। তোমার শীঘ্র এখানে আসিতে হইবে, সুতরাং প্রস্তুত হও।

শিশির। বাবা, তোমাকে কত তাচ্ছিল্য করিয়াছি, তাই ভাবিতাম ওখানে যাইয়া তোমার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

পিতা। আমার কাছে ক্ষমা না চাহিয়া ভগবানকে ডাক। তোমার মা দশবৎসর কত কঠোর সাধনা করিয়াছেন তাহা ত জান? তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ওখানে ধন্য হইয়াছ; ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এখানে আসিয়াও সেইরূপ ধন্য হও। আমি যাই, কারণ মিডিয়ম আমাকে সহ্য করিতে পারিতেছে না।

শিশির। আপনি ও দাদারা কি এক সঙ্গে আছেন?

পিতা। আমি ও তোমার মা একত্রে আছি। একত্রে আর ভিন্ন কি, বলিতে গেলে সকলেই একত্রে আছি। আমি যাই, আর থাকিতে পারিতেছি না।

শিশিরবাবুর পিতা হরিনারায়ণ যে বলিলেন,—আমি যাই, মিডিয়ম আমাকে সহ্য করিতে পারিতেছে না, আমিও আর থাকিতে পারিতেছি

না,—ইহাতে বুঝা যাইতেছে হরিনারায়ণ উচ্চস্তরের আত্মা; সুহাসের ন্যায় আধার তাঁহার ভর সহ্য করিতে না পারিয়া কষ্টবোধ করিতেছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি যাইবার জন্য ঐরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

হরিনারায়ণ চলিয়া গেলে, সুহাসের উপর শিশিরকুমারের দ্বিতীয়া পত্নী কুমুদিনীর আত্মার আবির্ভাব হইল। শিশিরকুমার প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি কবে মরিব?

উত্তর। আমি সে সব জানি না। ভগবান ইহা আমাদের জানিতে দেন না। তিনি (বাবা) যে 'শীঘ্র' বলিয়াছেন, তাহার মানে দুইবৎসর হইতে পারে, চারিবৎসরও হইতে পারে। তিনি যখন চক্রে আসেন, তখন আমরা সেখানে ছিলাম।

প্রশ্ন। যাক্ ও কথা, এখন এস একটু আমোদ করি। আচ্ছা, বল দেখি তুমি ও তোমার দিদির মধ্যে ভাল কে?

উত্তর। দিদি ভাল।

প্রশ্ন। তাহা ত তুমি বলিবেই। তোমার দিদি কবে সাধনভজন করিল? তুমি ত অনেক সাধনভজন করিয়াছ।

উত্তর। দিদি ৪০ বৎসর এখানে আসিয়াছেন। তুমি কি ভাব যে, তিনি এতদিন চুপ করিয়া বসিয়া আছেন? তাহা নয়, তিনি বরাবর সাধনভজন করিতেছেন। আমি প্রথমে সাধনভজন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু শেষে পাষাণবৎ হইয়া ওসব ছাড়িয়াছিলাম। ইহাই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন। কাঁদিতেছ কেন?

উত্তর। একটা কথা মনে হওয়ায় কান্না আসিল, তোমাকে বলিয়া দুঃখ দিব না।

প্রশ্ন। এতদূর যখন বলিলে, তখন সবই বল।

উত্তর। যে দিন আমি দেহত্যাগ করিয়া এখানে আসি, সেদিন বিকালে প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল তোমাকে বুকে করিয়া হৃদয় জুড়াই।

ইহা শুনিয়া শিশিরকুমার কষ্ট প্রকাশ করিলেন। তাহাতে কুমুদিনী বলিলেন,—তোমাকে বলিয়া অন্যায় করিলাম। তখন শিশিরকুমার বলিলেন,—ওসব কথা যাক্। আচ্ছা বল দেখি, তুমি ও তোমার দিদির মধ্যে কে বেশী সুন্দরী ?

কুমুদিনী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কাহাকে বেশী ভালবাস ? তারপর বলিলেন,—কাল দিদির অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, বলিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আসিবার জন্য কত বলিলাম, কিন্তু তিনি আসিলেন না, আমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ছিদাম (১) আসিবার জন্য পাগল হইয়াছে, সে রোজই আসিতে চাহে।

প্রশ্ন। তাহাকে আসিতে দাও না কেন ?

উত্তর। আমাদের সাহায্য ভিন্ন সে আসিতে পারে না। ফুলির (২) উপর আমি যত সহজে ভর করিতে পারি, দিদি তাহা পারেন না, কারণ সে আমার মেয়ে। (একটু থামিয়া) আমি ওখানে থাকিতে ভাবিতাম যে, তুমি আমার স্বামী, অতএব আমার সামগ্রী। মনে এই গৌরব হওয়ায় তোমাকে তাচ্ছিল্য করিয়াছি। এইজন্য শেষকালে বড় কষ্ট পাইয়াছি। তখন ভগবানের কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতাম,—হে ভগবান্, ছয়মাস আমাকে

(১) ছিদাম—শিশিরকুমারের মধ্যমপুত্র অমিয়কান্তির ডাক্‌নাম। সে শৈশবে মারা যায়। (২) ফুলি—সুহাসনয়নার ডাক্‌নাম।

স্বাস্থ্য দাও, আমি একবার প্রাণভরে স্বামীর সেবা করি। কিন্তু তাহা হইল না। (ক্রন্দন)

প্র। আবার কান্নাকাটা আরম্ভ করিলে ?

উ। (নিজেকে সামলাইয়া) না, আর কাঁদিব না। (পরে হাসিয়া) আমি না লিখিয়া কেন কথা কহিতেছি, জান ?

প্র। কেন ?

উ। তুমি কৃপণ-লোক, তোমার বেশী কাগজ খরচ হইবে বলিয়া।

প্র। কাল ভুবন আসিয়া যাহা লিখিল, তাহাতে বুঝিলাম সে এখন আর বোকা নাই।

উ। চিরকালই কি বোকা থাকিবেন ? যে ব্যক্তি প্রাণ হইতে কথা বলে, তাহার কথায় বোকামী থাকিবে কেন ? আমি যাই, আমাদের অধিকক্ষণ থাকিবার যো নাই।

প্র। তোমার কি অধিকক্ষণ থাকিতে কষ্ট হয় ?

উ। ঠিক তা নয়। ভগবান্ কৃপা করিয়া কথা কহিবার সুবিধা দিয়াছেন ; আমাদের উচিত নয় যে তাহার অপব্যবহার করি।

সুহাসনয়নার আবিষ্টভাব কাটিয়া যাইতে না যাইতেই এক হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা তাহার উপর ভর করিল। তখন মিডিয়ম উত্তেজিত হইয়া হিন্দিভাষায় অনর্গল কথা কহিতে লাগিল। সুহাসের এরূপ ভাবে হিন্দিতে কথা বলা কখনও অভ্যাস ছিল না। কোন দুষ্ট প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, শিশিরকুমার সুহাসের চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, মিডিয়ম ততই অকথ্য ভাষায় তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর সুহাস স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

পরদিবস নিয়মমত চক্রে বসিবার পরই কুমুদিনীর আত্মা

আসিয়া সুহাসের উপর ভর করিলেন। তার পরই মিডিয়মের মুখ দিয়া বাহির হইল,—কাল ফুলির বড় কষ্ট হইয়াছিল। একটা পতিতা মেয়েমানুষ কয়েকদিন হইতে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল, আমরা আসিতে দিই নাই। কাল সুযোগ পাইয়া হঠাৎ ভর করে। আমরা তখনই তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করি, তবে কিছু সময় লাগিয়াছিল।

প্র। কি করিয়া তাড়াইলে ?

উ। আমরা রুক্ষভাবে তাহার দিকে চাহিলাম। প্রথমে সে গ্রাহ্য করিল না, শেষে উহা সহ্য করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল। মাগীটা একটা চা-বাগানের মেয়েকুলি ছিল। সে নিজের স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অতি ভয়ানক; দেখিলে ভয় হয়, দুঃখও হয়।

প্র। তাহাকে সদুপদেশ দাও না কেন ?

উ। কয়েকদিন দিয়াছি, কিন্তু সে তাহা শোনে না। যাহারা জড়জগতে মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়, এখানে আসিয়াও সে স্বভাব সহজে ছাড়িতে পারে না। একটা কথা জানিয়া রাখা উচিত। ওখানে এক বৎসরে যে উন্নতি হয়, এখানে কুড়ি বৎসরেও তাহা হয় না।

প্র। তোমার দিদিকে আসিতে দিলে না কেন ?

উ। তিনি ত কাছেই আছেন।

প্র। দেখিবে, তোমার দিদির সঙ্গে তোমার ঝগড়া বাধাইয়া দিব ?

উ। কখনই নয়, সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি যে কত ভাল তাহা তুমি ধারণা করিতেই পার না। জান, তিনি ৪০ বৎসর তোমার পথ চাহিয়া আছেন।

প্র। আচ্ছা, তোমরা মেয়েমানুষ হইয়া পেত্নীকে তাড়াইলে কি করে ?

উ। এখানে মেয়ে পুরুষে বিভিন্নতা নাই। যে যত ভাল, তাহার শক্তি তত বেশী। আমি পরম ভাগ্যবতী যে তোমাকে পাইয়াছিলাম।

প্র। আমাকে না পাও, কেদার হালদারকে পাইতে।

উ। (হাসিয়া) কেদার হালদার নয়, নামটা ভুলিয়া গিয়াছি।

প্র। আমার মনে হইয়াছে, তাঁহার নাম চণ্ডী হালদার। (১)

উ। (উচ্চহাস্য করিয়া) ঠিক।

প্র। ওখানকার কথা সব বল।

উ। তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর দিতেছি।

প্র। ওখানে তোমরা কি ভাবে দিন কাটাও।

উ। হাসি কাঁদি গল্প করি বেড়াই ঘুমাই।

প্র। তোমরা কি ঘুমাও?

উ। ঠিক ঘুম নয়, একরূপ বিশ্রাম করি।

প্র। দাদাদের সঙ্গে কি দেখা হয়?

উ। প্রায়ই দেখা হয়, কিন্তু আমি দিদির সঙ্গেই সর্ব্বদা একত্রে থাকি।

প্র। তুমি কি ফুলিকে নিজের আয়ত্বাধীনে আনিতে পারিয়াছ?

উ। হাঁ, সম্পূর্ণরূপে।

প্র। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব তাহার উত্তর দিতে পারিবে?

উ। হাঁ, অবশ্য পারিব।

প্র। তুমি এমন সব কথা বল যাহা ফুলি না জানে।

উ। দেখ, বোটে যাওয়ার কথা, হাসখালিতে থাকার কথা,—ইহার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর।

---

(১) চণ্ডী হালদার নামক একব্যক্তির সহিত কুমুদিনীর প্রথমে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, কিন্তু শেষে শিশিরবাবুর সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

প্র। আচ্ছা, বল দেখি বোটে আমরা কে কে গিয়াছিলাম?

উ। তুমি আমি পীযূষ পাঁড়ে ও রাখালের মা। এই দেখ, পাঁড়ে ও রাখালের মার কথা ফুলি আদপেই জানে না।

আমাদের দেশে ভাল মিডিয়ম অতি বিরল। তাহার কারণ আমরা আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব সম্বন্ধে নিয়মমত চর্চ্চা করি না। তারপর, মিডিয়মকে একেবারে আপন আয়ত্তাধীনে আনিয়া সম্পূর্ণভাবে চেতনাশূন্য করিতে না পারিলে, তাহার দ্বারা আত্মা সকল কথা ঠিক ভাবে জানাইতে পারে না। ফুলিকে তাহার মাতা সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্বের মধ্যে আনিয়া, তাহার চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কাজেই মিডিয়মের দ্বারা নিজের অভীষ্ট বিষয় জানাইতেও পারিয়াছিলেন। আর সেই জন্য পাঁড়ে ও রাখালের মার কথা মিডিয়মের মুখ দিয়া সহজে বলাইতেও সক্ষম হইয়াছিলেন।

সুহাসনয়না লিখিয়াছেন,—সোণাদাদা (তড়িৎকান্তি) যখন বিষাদবায়ু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন এবং আমাদের পারিবারিক-চক্রে বসিতে সুরু করেন, তখন একদিন জেঠাইমা সোণাদাদা ও আমি চক্রে বসিয়াছিলাম। সোণাদাদার সেই মৃত-আত্মীয় আমার উপর ভর করে। আমার হাত দিয়া সোনাদাদাকে উদ্দেশ করিয়া সেই প্রেতাত্মা লিখিল,—তোমার মার কাছে এখনই গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে ঝাঁটা দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এ কথা আমরা কেহ জানিতাম না। আমার আবেশ ভাঙ্গিয়া গেলে, সে যে আমার উপর ভর করিয়াছিল, এই কথা শুনিয়া পিসিমা (সোণাদাদার মা) বলিলেন,—আমার উপর সে ভর করিবার চেষ্টা করায়, আমি তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়ায়েছি; আবার ফুলির কাছে গিয়াছে? আমার হাত দিয়া ঝাঁটা মারিবার কথা যাহা লেখা হয়, তাহা অবশ্য পিসিমা

জানিতেন না। পিসিমার ক্ষমতা বেশী ছিল বলিয়া তিনি উহাকে তাড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু সেরূপ শক্তি আমার না থাকায়, আমার উপর সে ভর করিতে পারিয়াছিল।

সুহাসনয়না আর একটী ঘটনা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা প্রকৃতই বিস্ময়কর ব্যাপার। সুহাস লিখিয়াছেন—আমার দ্বিতীয় পুত্র যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন রাখালের মা বলিয়া একটী বাগ্দীর মেয়ে আমার সূতিকাগারে নিযুক্ত হয়। ১৫ দিন পরে তাহার একমাত্র পুত্র রাখালের অসুখের খবর আসিল, কিন্তু সে পয়সার মায়ায় ছেলেকে দেখিতে যায় নাই। ইহার ২৬ কি ২৭ দিন পরে, রাত্রি একটার সময় আমার মুখচাপা ধরে। সে সময় আমি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম। আমার দক্ষিণদিকে তিন বৎসরের বড় ছেলে ও বামদিকে আতুরে ছেলে, এবং তাহার পরে রাখালের মা শুইয়াছিল। মুখচাপা ধরিবামাত্র সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। আমি জোর করিয়া চাহিয়া দেখি, আমার মাথার কাছে খর্ব্বাকৃতি একটী পুরুষমানুষ দাঁড়ায়ে আমার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। আমার মনে হইল সে মানুষ নয়। আমি অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের নাম জপ করিতে লাগিলাম। আমার ভয় হইল, পাছে আমার ছেলেদের অকল্যাণ হয়। শেষে দেখিলাম সে ক্রমে রাখালের মার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম লইতেই আমার অবসন্নভাব দূর হইল, আমি উঠিয়া বসিয়া রাখালের মাকে ডাকিতে লাগিলাম। সে সজাগ হইলেও তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। শেষে আমি তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে জোরে ঠেলিয়া দিতেই সে কাঁদিয়া উঠিল। শেষে বুঝিলাম, সে তাহার ছেলে রাখালের নাম ধরিয়া কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় বলিল, তাহার ছেলে রাখাল আসিয়া বলিতেছে,—মা, তুই আমার কাছে গেলিনি,

আমি তোর কাছে এসেছি, আমার ছেলেদের দেখিস্। ইহার দুই দিন পরে সংবাদ আসিল যে, যেদিন রাখাল দেখা দিয়াছিল, সেই দিন রাত্র ১টার সময় তাহার মৃত্যু হয়।

শ্রীভগবানে বিশ্বাস

শিশিরকুমার ও অমিয়কান্তি

মহাত্মা শিশিরকুমারের দ্বিতীয়পক্ষের মধ্যমপুত্রের নাম অমিয়-কান্তি। অমিয় পাঁচ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর যাবত সে ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াছিল। মহাত্মা শিশিরকুমার অত্যন্ত সন্তান-বৎসল ছিলেন। অমিয় পীড়িত হইলে শিশিরকুমার নিজের আরাম-বিরাম, সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, প্রাণাধিক পুত্রের কষ্টভার কমাইয়া তাহাকে ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্য, একাধিক্রমে দুই বৎসরকাল দিবানিশি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাহাকে রাখিতে পারিলেন না,—অবশেষে শ্রীভগবান্ তাহাকে নিজের শীতল-ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

অমিয়কান্তির ডাক্‌নাম ছিল 'শ্রীদাম'। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বদিন শ্রীদাম বলিল,—মা, আমাকে সাজায়ে দাও। ইহাই বলিয়া সে একখানি আর্শি সম্মুখে রাখিয়া বসিল এবং মা অলক-তিলক দিয়া মনের সাধে পুত্রকে সাজাইয়া দিলেন।

কুমুদিনী

৪৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

১৩ই ভাদ্র ১৩১৩ সাল (ইং ২৯।৮।০'

শৈলবালা, নিতাই, মুকুন্দ ও মোহন

[পৃঃ ৯১

এই ঘটনাটী আস্বাদন করিবার জন্য শিশিরকুমার একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে দিলাম।

যেই দিন যাবে, তার এক দিন আগে।
'সাজাইয়া দাও' বলে, শ্রীদাম মাতাকে॥
আরশি আগেতে করি, শ্রীদাম বসিল।
মনোসাধে মাতা তারে, সাজাইয়া দিল॥
বদনে তিলক দিয়া, মুখ মুছাইল।
কৃষ্ণ-রূপসুধা-স্বাদ, তাই শিখাইল॥
আরশিতে নিজ মুখ, শ্রীদাম দেখিছে।
বুঝিনু সে পলা'বার, যোগাড় করিছে॥

পরদিবস যাইবার সময়—

কি বলিতে গেল,—কথা মুখেতে রহিল।
মোর পানে চাহিতেই, চক্ষু স্থির হ'ল॥

তখন শিশিরকুমার পরিবারস্থ সকলকে লইয়া স্বতন্ত্র একটী ঘরে বসিলেন; এবং একটী সেতার লইয়া ধীর ও স্থির ভাবে তারে ঝঙ্কার দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ মৃদুভাবে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে শ্রীভগবানকে উদ্দেশ করিয়া অতি কোমল-করুণ-কণ্ঠে হৃদয় উঘাড়িয়া এই গীতটী গাহিতে লাগিলেন:—

আদরের দুলালিয়া দিনু তোমারে।
আমার মন্দির আঁধার করে॥ ধ্রু॥
ক্ষমা কর স্নেহময়, দুঃখ পেয়ে দিনু তোমায়,
আমার হৃদয়খানি চিরে।
নব-নলিনে, নূতন জীবনে,
তুলিয়া দিলাম তোমার করে।

যদি মোর লাগি কাঁদে, মুছাইও মুখচাঁদে,
চুম্বন করিও প্রেমভরে ॥

শিশিরকুমার শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের তৃতীয় খণ্ড অমিয়কান্তিকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন,—

"তুমি ওপারে গিয়াছ, আমি এপারে আছি। এরূপ পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড় কষ্টকর। কিন্তু তোমার কি আমার ইহাতে দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই, কারণ তুমি এখন সেই সকলের পিতার শ্রীহস্ত দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছ। পুত্রের নিকট পিতা অনেক আশা করিয়া থাকেন। তুমি অতি শিশুবেলা ভবসাগর পার হইয়াছ, তাই পিতৃঋণ কিছু শোধ করিতে পার নাই বলিয়া ক্ষোভ করিও না। আমি তোমার নিকট যে উপকার পাইয়াছি, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। এই সংসারে নানা কু-প্রবৃত্তি দ্বারা বিচলিত হওয়ায় আমার অন্তর অঙ্গার হইতেও মলিন হইয়াছিল। তোমার বিয়োগজনিত নয়নজল দ্বারা আমার অন্তর কিয়ৎ পরিমাণে ধৌত হয়; তাহা না হইলে আমার যে কি দশা হইত তাহা মনে করিলে হৃৎকম্প হয়। তাহার পরে আমার সর্ব্বস্বধন যে নিমাইচাঁদ, তাঁহাকে কত চেষ্টা করিয়াও একটু ভালবাসিতে পারিলাম না। তাই তাঁহার প্রতি একটু প্রীতি বাড়াইবার আশায় আমি তোমার নাম তাঁহার নামের সহিত মিলাইয়া দিয়াছি। প্রকাশ্যে তাঁহাকে আমি শুধু 'নিমাই' বলিয়া ডাকি, কিন্তু মনে মনে যখন ডাকি, তখন তাঁহাকে 'অমিয়নিমাই' বলিয়া সম্বোধন করি। দেখি, যদি তোমার সাহায্যে তাঁহাকে পাই।"

অমিয়কান্তির বিয়োগজনিত বিষম-বিরহ-বেদনা শিশিরকুমারকে বিশেষভাবে অভিভূত করিতে পারে নাই; এবং পরলোকে যাইয়া

আবার আমরা সকলে মিলিত হইব, এই বিশ্বাস যে শিশিরকুমারের মনে দৃঢ় হইয়াছে, ইহার একমাত্র কারণ শ্রীভগবানে অটল বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা, এবং তাহা উল্লিখিত ঘটনাবলী পাঠে বেশ জানা যায়।

এখানে আমার নিজ জীবনের একটী ক্ষুদ্র কাহিনী বলিব। আমার প্রথম পুত্র আড়াই বৎসর বয়সে আমাশয়-রোগে নিদারুণ ক্লেশভোগ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া আমি শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম,—হে দয়াময় প্রভু, এই দুগ্ধপোষ্য শিশু আর এই বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছে না। কৃপা করিয়া তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিয়া ইহার জ্বালা-যন্ত্রণা দূর কর। আমার সেই করুণ-কণ্ঠের আকুল-ডাক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছিল; এবং তিনি প্রকৃতই আমার প্রাণাধিক পুত্রকে আপন শীতল-ক্রোড়ে স্থান দিয়া তাহার সকল কষ্ট দূর করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের উপর জীবের বিশ্বাস কতদূর গাঢ় হইতে পারে, এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রিয়জনকে অর্পণ করিয়া জীব কতদূর নিশ্চিন্ত হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে আর একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

আমার পিসতুত-ভাই শ্রীমান্ রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী আমার মেজপিসিমা নীলকাদম্বিনীর তৃতীয়-পুত্র। রঞ্জন আমার আড়াই বৎসরের ছোট। আমরা মামাত-পিসতুত ভাই-সকল শৈশব হইতে একত্রে এক-পরিবারে লালিত-পালিত হইয়াছিলাম। সেইজন্য আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ভাব-ভঙ্গী ধ্যান-ধারণা অনেকটা এক ধরণের।

রঞ্জনবিলাস ডাকবিভাগে কাজ করিতেন। তিনি বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অনেকগুলি প্রধান জেলার সদরে পোষ্টমাষ্টার

ছিলেন। রঞ্জনের একটী প্রধান গুণ যে, তিনি যখন, যেখানে গিয়াছেন, সেখানকার সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পেন্সন লইয়া তিনি কলিকাতার দক্ষিণ-উপকণ্ঠ বেহালায় স্থায়ি-ভাবে বাস করিতেছেন।

রঞ্জন যেদিন হাবড়ার ডাকঘরের কার্য্য হইতে অবসর লয়েন সেই দিনই তাঁহার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী অমরধামে চলিয়া যান। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান হয়, ইহার মধ্যে অধিকাংশই পরলোকগত হইয়াছে। ১৯০৭ সালে আরার পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য করিবার সময় তিনি প্রথম ও বিষম পুত্রশোক পান। এখানে কলেরা-রোগে আক্রান্ত হইয়া একদিনে তাঁহার চারিটী প্রাণাধিক পুত্র মারা যায়। সে ঘটনাটী রঞ্জনবিলাসের নিজের কথায় নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে জানা যাইবে শ্রীভগবানের উপর তাঁহার বিশ্বাস কত গাঢ়।

রঞ্জনবিলাসের পত্র

মেজদাদা!—

ভগবানে যদি প্রকৃত বিশ্বাস থাকে এবং তাহার ফলে যদি পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে গুরুতর শোকেও মানুষকে দমাইতে পারে না, ইহা ধ্রুবসত্য। ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে এক সঙ্গে চারিটী পুত্র হারাইয়া আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তুমি তাহার একটী লিখিত বিবরণ চাহিয়াছ, তাহাই লিখিতেছি।

১৯০৭ সালে আমি আরার পোষ্টমাষ্টার ছিলাম। অক্টোবর মাসে একদিন সন্ধ্যার সময় ডাকঘরের বারান্দায় বসিয়া মুন্সেফ বাবু অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' গ্রন্থখানি অতি

ভক্তির সহিত পাঠ করিতেছিলেন; আর ডাক্তার বাবু অন্নদা প্রসন্ন ঘটক, উকিল বাবু যতীন্দ্রলাল মিত্র ও আমি শুনিতেছিলাম। এই সময় আমার বাড়ীর ভিতর হইতে কে একজন আসিয়া আমাকে বলিল,—মোহনের পাতলা বাহ্য হয়েছে। আমি এত মুগ্ধ হইয়া কথামৃত শুনিতেছিলাম যে আমার উঠিতে আদপে ইচ্ছা হইল না; বলিলাম,—হোমিওপ্যাথিক চায়না ১নং দিতে বলগে। ২০।২৫ মিনিট পরে পাঠ শেষ হইলে আমি বাড়ীর মধ্যে যাইয়া দেখি, পায়খানার কাছে একটী পেঁপেগাছের তলায় বসিয়া আমার পাঁচ-ছয় বৎসরের পুত্র মোহন বাহ্যি করিতেছে, আর মধুর-কণ্ঠে গাহিতেছে—

দীন-দয়াময় গৌরহরি
পার কর আমারে।

তাহার বাহ্যি দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমার বড় ছেলে নিতাই ঘুমাইতেছিল। তাহার বয়স তখন ষোল বৎসর। সে বেশ সুস্থ ও সবল ছিল। তাহাকে উঠাইয়া ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া আনিতে বলিলাম। একটি লোক সঙ্গে লইয়া সে চলিয়া গেল।

আসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—কলেরা হয়েছে। সেই রাত্রির মধ্যে আমার আরও দুইটী পুত্র (জ্যেষ্ঠ নিতাই ও তৃতীয় মুকুন্দ) ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হইল। সকালে আসিয়া মুন্সেফ অতুলবাবু আমার মধ্যমপুত্র শচী ও চতুর্থপুত্র মুরারীকে আপন বাড়ী লইয়া গেলেন। তারপর সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রটীও ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হইল। সেই দিন সন্ধ্যার মধ্যে ক্রমে ক্রমে এই চারিটী পুত্রই আমাদের ছাড়িয়া স্বধামে চলিয়া গেল।

আমার তখন বিভোর অবস্থা। তখন আমার মনে হইতেছিল

যেন আমাদের পরলোকবাসী নিজজনেরা উহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন। আমার স্ত্রী অত্যন্ত ধৈর্য্যশীলা ছিলেন। তবুও তিনি দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া, আমি তাঁহাকে বলিলাম,—ছেলেরা ত ভাল জায়গায়ই যাচ্ছে। সেখানে আমার মার কাছে বেশ যত্নেই থাকবে। সেখানে যেয়ে আবার আমরা সকলকে পাব। কাজেই মন স্থির কর। ছেলেদের যাবার সময় হয়েছে। আর দেরী করিও না। উহাদের সাজায়ে দাও। এই বলিয়া তাহাদের প্রতি যাহা যাহা কর্ত্তব্য সমস্তই করিলাম।

এই ব্যাপার লইয়া সহরে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রভৃতি আসিয়া সংবাদ লইয়া গেলেন। বাঙ্গালী ও বিহারী বন্ধুরা সকলেই আসিয়া সহানুভূতি জানাইলেন। ডাকঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব 'তার' পাইয়া ছাপড়া জেলার শিউয়ান হইতে সস্ত্রীক আরায় আসিয়া ষ্টেশন হইতে বরাবর ডাকঘরে আসিলেন, এবং মেমকে বাড়ীর ভিতর আমার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া, সাহেব নিজে আফিসে ঢুকিলেন; আসিয়া দেখেন, আমি আমার চেয়ারে বসিয়া কাজ করিতেছি। ইহা দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া আমাকে বলিলেন,—আমি মনে করেছিলাম, আপনার সহিত আপনার শয্যার পার্শ্বে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। প্রকৃতই সকলেই আমার মনের বল দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

আমি দুর্ব্বল ও ভজনহীন। সুতরাং ঐ ভয়ানক দুর্দ্দিনে কে আমাকে বল দিয়াছিলেন? আমার মনে হয়, আমি আমার মাতুল পূজ্যপাদ মহাত্মা শিশিরকুমার ও আমার গুরুদেব শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট হইতে সেই শোকবিজয় করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলাম।

আমার বাল্যকালে যখন মামার বাড়ীতে আধ্যাত্মিক-চক্রে বসা হইত, তখন অনেক সময় আমি সেখানে মা কিম্বা মাসিমার নিকট বসিয়া থাকিতাম। বড় হইয়া সরোজকান্তি ও মাতুল বিনোদী লালের পরলোকগমনের পর যখন চক্রে বসা হইত, তখন আমিও তাহাতে যোগদান করিতাম। আমি যে 'মিডিয়ম' এ কথা তুমি ও ছোটমামা (গোলাপবাবু) ভিন্ন আর কাহাকেও বোধহয় জানিতে দিই নাই। সে শক্তি আমার এখনও আছে, কারণ মাঝে মাঝে এখনও আমি পরলোকগত নিজজনদিগের উপস্থিতি অনুভব করিয়া থাকি। সুতরাং তাঁহারা যে পরলোকে বাস করিতেছেন এবং তাঁহাদের সহিত আবার আমরা মিলিত হইব, এই বিশ্বাস আমার শৈশব হইতেই জন্মিয়াছে।

মাতুল শিশিরকুমারের ধর্ম্মমত সংক্ষেপে এই যে, (১) শ্রীভগবান্ আছেন; (২) তিনি দয়াময়, ও (৩) তাঁহাকে পাওয়া যায়। এই মত তিনি বার বার নানা প্রকারে আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি শ্রীভগবানকে দয়াময় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার, তবে পরলোকে বিশ্বাস সেই সঙ্গে আপনিই আসিবে। মনে কর, পিতামাতার কোল হইতে যদি কেহ প্রাণাধিক পুত্রকে কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে তাহাকে সকলে নির্ম্মম-পাষণ্ড বলিয়া থাকে; আর, যিনি দয়ার আকর, তিনি কি কখন এইরূপ নির্দ্দয়-নিষ্ঠুরের কাজ করিতে পারেন? বিরহে ভালবাসার আরও পুষ্টি হয়; সুতরাং নিজজনকে আবার আমরা নিশ্চয় পরলোকে দেখিতে পাইব;—এই ত গেল উপদেশ। কিন্তু আমরা চক্রে বসিয়া যে সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহাতে, দেহান্তে যে মানুষের ধ্বংশ হয় না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এত পাইয়াছি যে, তাহাতে বিনা চেষ্টায় দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে।

অমৃতবাজারের আধ্যাত্মিক-চক্রে আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতেছে শুনিয়া কৃষ্ণনগরে একটী চক্র স্থাপিত হয়। ইহার সভ্যদিগের মধ্যে মাতুল বাবু মতিলাল ঘোষ (তিনি তখন কৃষ্ণনগর-কলেজে পড়িতেন), তাঁহার সহাধ্যায়ী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আমার গুরুদেব প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ছিলেন। শুনিয়াছি, আমার গুরুদেব প্রথম হইতে একজন ভাল মিডিয়ম ছিলেন। আর দেখিয়াছি যোগসিদ্ধ অবস্থায় যখন তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, কিম্বা সমাধি অবস্থায় থাকিতেন, তখন তাঁহার আত্মা দেহত্যাগ করিয়া দিব্যলোকে যাইত। আবার কখনও কখনও তাঁহার নিকট কোন কোন আত্মা আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। ধ্যানভঙ্গের পর তিনি বলিতেন,—অমুক আসিয়াছিলেন, এবং এই এই কথা বলিলেন। গুরুদেবের নিকট এই সমস্ত শুনিয়া, আমার বাল্যকাল হইতে পরলোক সম্বন্ধে যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা দৃঢ়তর হয়। গোলোকগত হইয়াও আমার গুরুদেব ও নিজজনেরা যে আমাকে সদাসর্ব্বদা সাহায্য করেন, তাহা আমি বেশ অনুভব করি। সেই জন্যই এই পত্রের প্রথমে বলিয়াছি,—শোকবিজয়ের একমাত্র ঔষধ শ্রীভগবানকে দয়াময় বলিয়া বিশ্বাস করা, আর দেহান্তে আত্মার ধ্বংশ হয় না এবং নিজজনের প্রতি মায়ামমতা ও ভালবাসা কমে না,—এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা।—তোমার স্নেহের রঞ্জন।

পরমবান্ধু ঘোষ

২৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

১২ই বৈশাখ ১৩১৬ সাল (ইং ২৫।৪।০৯

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

৫৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন। ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল

[পৃঃ—৯

মৃতের প্রতিচ্ছবি

কোন ব্যক্তির চিত্র আঁকিতে হইলে, তাহাকে কিম্বা তাহার কোন রকম ছবি না দেখিয়া চিত্রকর উহা আঁকিতে পারে না। সেইরূপ, কাহারও ফটোগ্রাফ তুলিতে হইলে, তাহাকে কিম্বা তাহার কোন রকম অঙ্কিত চেহারা 'ক্যামেরা' যন্ত্রের সম্মুখে রাখা আবশ্যক। কিন্তু কেহ পরলোকগত হইলে, যদি তাহার ফটো কিম্বা অন্য কোন প্রকার ছবি না থাকে, তবে তাহার ছবি কি আঁকিতে পারা যায়? সকলেই বলিবেন—ইহা অসম্ভব। কিন্তু ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে 'অসম্ভব' বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না। মৃতব্যক্তির ছবি যে ঐভাবে আঁকা যাইতে পারে, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে জানা যাইবে।

পয়সকান্তির তৈলচিত্র

পয়সকান্তি মহাত্মা শিশিরকুমারের তৃতীয় পুত্র। পয়সের পরলোকপ্রাপ্তির কিছুকাল পরে তিনি শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের ষষ্ঠখণ্ড লিখিয়াছিলেন। এই খণ্ড তিনি পয়সকান্তিকে উৎসর্গ করেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমার বয়ঃক্রম সত্তর, তোমার পঁচিশ,—এইরূপ সময়ে তুমি আমাকে হঠাৎ একদিনের পীড়ায় ছাড়িয়া গেলে। তোমার বিরহ যে সহ্য করিতে পারিব, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, কিন্তু তবু সহ্য করিয়াছি। ইহা কিরূপে করিলাম বলিতেছি। আমি বৃদ্ধ জীর্ণ রুগ্ন;

আমার দ্বারা ভজনসাধনের সম্ভাবনা ছিল না। তুমি আমার সে অভাব পূরণ করিতে। তুমি সঙ্গে থাকিয়া আমাকে অনুক্ষণ ভগবৎগুণসুধা পিয়াইতে। সুতরাং তুমি যখন ছাড়িয়া গেলে, তখন তোমার বিরহের সঙ্গে সঙ্গে আমার আর এক বিপদ উপস্থিত হইল,—আমার ভজন একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। তবুও তুমি যখন আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে, তখন আমি শ্রীভগবানকে মনের সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়াছি। ইহা যদিও শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তিনি (শ্রীভগবান্) জানেন ইহা সত্য কি না। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ জগতে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যে সকল পদ রচনা করেন, তাহা ভাবে ও তাল-লয়ে অদ্বিতীয়। তাহা লোপ হইয়া যাইতেছিল। যাহা কিছু আছে, তাহা রঙ্গপুরের শ্রীমান্ রামলাল মৈত্রের কণ্ঠে ছিল, তুমি তাহার নিকট উহা অভ্যাস করিয়াছিলে। তুমি সর্ব্বদা বলিতে, কবে আমি তানসেনের নিকট যাইয়া তাঁহার সমুদয় পদ শিখিব। এখন তোমার সেই সুযোগ উপস্থিত। তুমি এখন মহানন্দে শ্রীভগবানের ভজন করিতেছ, সুতরাং তোমার জন্য আমি স্বার্থপর হইয়া কেন দুঃখ করিব?

তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তোমার একখানি ছবি প্রস্তুত করাইবার ইচ্ছা ছিল। মার্কিনদেশের এক বিখ্যাত মিডিয়ম আমার সে মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। চিত্রখানি ২০ মিনিটে দিবাভাগে লোকের সাক্ষাতে অদৃশ্যহস্তে বিচিত্র হয়। সে এত চমৎকার যে, এ জড়জগতে বোধহয় এরূপ সূক্ষ্ম কারিকরী হইতে পারে না; অন্ততঃ কোন কারিকর একমাসের কমে ওরূপ একখানি সম্পূর্ণ ছবি আঁকিতে পারেন না।

আমি সর্ব্বদা সেই ছবিখানি দেখি, আর আমার মনে হয়, আমাদের জীবনদাতা আমাদিগকে জীবন দিয়া একেবারে ভুলিয়া যান নাই,—আমাদের কথা সর্ব্বদা তাঁহার মনে থাকে। কারণ, তিনি ভালবাসার

আকর। তিনি আমাদের জীবন দিয়া, এ জগতে কিছুকাল রাখিয়া, মৃত্যু অন্তে আর এক জগতে লইয়া যান। সেখানে শোক তাপ মৃত্যু রোগ কি অন্ধকার কিছুই নাই। সেখানে আমাদের প্রীতির বস্তু লইয়া চিরদিন বাস করিব। যখন এই সব কথা মনে হয়, তখন আমাদের জীবনের জীবন সেই শ্রীভগবানকে প্রাণের সহিত ভজনা করিতে পারি না বলিয়া মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।"

মহাত্মা শিশিরকুমার উপরে যে মার্কিনদেশীয় মিডিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নে তৎসম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ দিতেছি :—

আমেরিকার চিকাগো সহরে ব্যাঙ্গস্-পরিবারস্থ দুই ভগিনী "ব্যাঙ্গস্-ভগিনীদ্বয়" (Bangs Sisters) নামে বিখ্যাত। ইহারা কি এক অদ্ভুত শক্তিবলে ফটো কিম্বা অন্য কোনরূপ ছবির সাহায্য না লইয়া, অনেক মৃতব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া দিয়াছেন,—ইহা আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকজন শিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত মিঃ সুবা রাও নামক মান্দ্রাজের জনৈক ভদ্রলোক স্বয়ং চিকাগো যাইয়া, ব্যাঙ্গস্-ভগিনীদ্বয়ের নিকট হইতে তাঁহার মৃতা স্ত্রীর ছবি আঁকিয়া আনিয়া, ইহার অলৌকিক বিবরণ তাঁহার সম্পাদিত 'ওয়েষ্ট-কোষ্ট স্পেক্টেটর' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন।

এই অদ্ভুত ঘটনা পাঠ করিয়া, আপন মৃতপুত্রের ছবি ব্যাঙ্গস্-ভগিনীদ্বয়ের নিকট হইতে আঁকিয়া আনিবার বলবতী ইচ্ছা শিশিরকুমারের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি তখন ইহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমেরিকার চিকাগো সহরে এক পুরাতন বন্ধুকে পত্র লিখিলেন। বন্ধুবর পরলোক অথবা আত্মার অস্তিত্ব আদপে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি এই বলিয়া পত্রের উত্তর দিলেন যে, হুজুগে মাতিয়া মিছামিছি

অর্থব্যয় করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু শেষে শিশিরবাবু যখন বিশেষ জিদ করিয়া লিখিলেন, তখন তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বন্ধুবর ব্যাঙ্গস্-ভগিনীদ্বয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া শিশিরবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

তখন বন্ধুবরের নিকট আবশ্যকীয় অর্থ ও পয়সকান্তির একখানি ফটো পাঠান হইল, এবং তাঁহাকে এই মর্ম্মে পত্র লেখা হইল যে,—ব্যাঙ্গস্-ভগিনীদ্বয় যে ছবি আঁকিয়া দিবেন তাহা পয়সকান্তির চেহারার অনুরূপ হয় কিনা ইহা মিলাইয়া দেখিবার জন্য এই ফটো পাঠান হইল। তবে ছবি প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে উক্ত ভগিনীদ্বয় কিম্বা তাঁহাদের পরিচিত কেহ যেন এই ফটো দেখিতে অথবা ইহার কথা জানিতে না পারেন, সেই সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

এই পত্র ও অর্থাদি পাইয়া বন্ধুবর ভাবিলেন, যখন ছবির জন্য ব্যাঙ্গস্-ভগিনীদের নিকট যাইতেই হইতেছে, তখন তাঁহারা কি ভাবে ছবি প্রস্তুত করেন, তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। সেইজন্য তিনি তাঁহার ন্যায় অপর একজন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন সহচরকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্যাঙ্গস্-ভগিনীদের গৃহে গমন করিলেন।

সে দিবস ব্যাঙ্গস্-ভগিনীদ্বয়ের মধ্যে একজন মাত্র গৃহে ছিলেন। তিনি বন্ধুদ্বয়কে কক্ষমধ্যে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে যখন তাঁহাদিগের সহিত শিশিরবাবুর বন্ধু সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন ভগিনীদ্বয় অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর বলেন যে,—একখানি ক্যাম্বিসের উপর ছবি আঁকা হইবে, সেখানি তাঁহারা দিতে পারেন, এবং ইচ্ছা করিলে বন্ধুবরও আনিতে পারেন। সেই কথা অনুসারে বন্ধুবর দ্বিতীয়বার ব্যাঙ্গস্-ভগিনীদের নিকট যাইবার সময়

একখানি ক্যাম্বিস্ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই ক্যাম্বিস্ খানি উপস্থিত ব্যাঙ্গস্-ভগিনীকে দিলে, তিনি উহা কক্ষের একমাত্র জানালার সম্মুখে ঝুলাইয়া দিলেন। এই জানালার নীচে সদর রাস্তা। সুতরাং এই দিনের বেলা কেহ যে গুপ্তভাবে সেখানে আসিয়া ছবি আঁকিয়া যাইবে বা বন্ধুদ্বয়কে প্রতারণা করিবে, সেরূপ কোন সুযোগ বা সুবিধা ছিল না। সে সময় কক্ষমধ্যে তাঁহারা তিন জন ভিন্ন অপর কেহই যে ছিলেন না, কিম্বা থাকিবার সম্ভাবনাও ছিল না, তাহা তাঁহারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছিলেন।

তখন বেলা প্রায় ১১টা। প্রখর রৌদ্রের তেজ। সুতরাং ক্যাম্বিস্ ভেদ করিয়া প্রচুর আলো গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কি ভাবে ছবি আঁকা হয় তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বন্ধুদ্বয় বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ক্যাম্বিসের উপর কোনরূপ রেখাপাত হইবামাত্র উহা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না, তাহা সুনিশ্চিত।

ব্যাঙ্গস্-ভগিনী তখন ক্যাম্বিস্ হইতে কিছুদূরে বন্ধুদ্বয়ের সন্নিকটে উপবেশন করিলেন, এবং দেয়ালের দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল তিনি যেন সাধনভজন করিতেছেন। তৎপরে বলিলেন যে, তিনি একটী যুবকের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন, এবং সেই যুবকের চেহারাও তিনি বর্ণনা করিলেন। বন্ধুদ্বয় ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কারণ এই বর্ণনার সহিত পয়সকান্তির ফটোর চেহারা ঠিক মিলিয়া গেল। তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এমন কি, এই অভাবনীয় ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া বন্ধুদ্বয়ের জীবনব্যাপী অবিশ্বাস টলিয়া গেল। এখন সেই অদ্ভুত ঘটনাটি বলিতেছি।

ব্যাঙ্গস্-ভগিনী তৎপরে উঠিয়া সেই ক্যাম্বিসের কাছে গেলেন, এবং উহা স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা যাহার ছবি লইতে আসিয়াছেন, তাহার কোন্ মূর্ত্তির ছবি লইতে ইচ্ছা করেন?—পার্থিব-মূর্ত্তির, না পারলৌকিক-মূর্ত্তির? তাঁহারা পার্থিব-মূর্ত্তির ছবিই চাহিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ কথা বলিবার পরেই দেখা গেল যে, ঐ ক্যাম্বিসের কিছু উপরে কুয়াশা বা ধূমের ন্যায় একরূপ পদার্থের আবির্ভাব হইল, কিন্তু পরক্ষণেই উহা অদৃশ্য হইয়া গেল; আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্বিসের উপর একখানি মুখের ছায়াপাত হইল, এবং ক্রমে উহার চোক মুখ কাণ ও নাক ফুটিয়া উঠিল। তখন বন্ধুদ্বয়ের মনে হইল যেন কোনও অশরীরী আত্মা বা ছায়ামূর্ত্তি শূন্যপথে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া এইরূপ করিয়া ছবি আঁকিতেছেন।

তাঁহারা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, মুখখানি ক্যাম্বিস্ হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আবার উহা ক্যাম্বিসের উপর ফুটিয়া উঠিল। এইরূপ কয়েক বার মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইবার পর যখন ছবিটী সম্পূর্ণ হইল, তখন দেখা গেল উহা পয়সকান্তির ফটোর ঠিক অনুরূপ! বন্ধুবর এই সম্বন্ধে যে বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন তাহা হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে বাহির হয়, তাহা হইতেই ইহা গৃহীত হইল।

পয়সকান্তির এই ছবিখানি এখনও আমাদের বাটীতে রহিয়াছে; এবং যদিও পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা অঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু এখনও দেখিলে মনে হয় যেন ইহা এখনই আঁকা হইয়াছে। সেই ছবির ব্লক এই পুস্তকে দেওয়া হইল

মহাত্মা শিশিরকুমারের পরলোক ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিরূপ দৃঢ়বিশ্বাস ছিল তাহা কতকগুলি ঘটনাদ্বারা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে ; এবং পয়সকান্তির এই ছবির ব্যাপার হইতেও বিশেষভাবে জানা যাইবে।

স্বপ্নের সফলতা

অমৃতময়ীর অদ্ভুত স্বপ্ন

১২৬২ সালের ১৫ই পৌষ পূর্ণিমার রাত্রে আমার পিতামহী অমৃতময়ী নিদ্রিতাবস্থায় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখেন যে, দুইটী দেবকন্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনি সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। ইহাতে কনিষ্ঠা—দেবকন্যা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—তোমার আর আদর-অভ্যর্থনা করিতে হইবে না। আমি তোমার স্বামী ও পুত্রদের আজ রাত্রেই পোড়াইয়া মারিব।

এখানে বলা আবশ্যক, সেই সময় আমার পিতামহ হরিনারায়ণবাবু যশোহরে ওকালতী করিতেন, এবং তাঁহার তিন পুত্র—বসন্তকুমার হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার—পিতার নিকট থাকিয়া যশোহর গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়াশুনা করিতেন। দেবকন্যা ঐ কথা বলিবামাত্র অমৃতময়ী দেখিতে পাইলেন, যশোহরে যে ঘরে তাঁহার স্বামী ও পুত্রেরা শুইয়াছিলেন তাহাতে আগুন ধরিয়া গেল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া ঐ দেবকন্যার পদতলে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া জ্যেষ্ঠা দেবকন্যার হৃদয় দয়ার্দ্র

হইল। তিনি কনিষ্ঠা দেবকন্যাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া এবার ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। কনিষ্ঠা তাঁহার কথা ফেলিতে পারিলেন না; পরিশেষে বলিলেন,—আচ্ছা, এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু তুমি অতিশয় সংসারী হইয়া শ্রীভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি যদি নিজের কল্যাণ কামনা কর, তবে ধর্ম্মে মন দাও,—সাধনভজন কর। ভবিষ্যতে যদি এই বিষয়ে অবহেলা কর, তাহা হইলে একদিন এইরূপ দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

পরদিবস যশোহর হইতে সংবাদ আসিল যে হরিনারায়ণবাবু পুত্রগণ সহ যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘরে অধিক রাত্রিতে আগুন লাগিয়াছিল। পৌষমাসের দারুণ শীতে তাঁহারা লেপমুড়ি দিয়া অকাতরে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন,—ঘরের কতকাংশ পুড়িয়া গেলেও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। শেষে অন্য ঘরে কোন লোকের দৈবাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়, এবং তিনি ইহা জানিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। ইহাতে ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তিনি তখন তাড়াতাড়ি পুত্রদিগকে উঠাইয়া অনেক কষ্টে নিজেদের প্রাণরক্ষা করেন।

শিশিরকুমারের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত

মহাত্মা শিশিরকুমার পঞ্চম বর্ষের মাসিক "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা"য় একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। স্বপ্নটি তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার পরলোকগত জ্যেষ্ঠভ্রাতা বসন্তকুমারের আত্মা আসিয়া স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। ঘটনাটি পরপৃষ্ঠায় বিবৃত করিতেছি।

জ্যেষ্ঠভ্রাতার পরলোকগমনে শিশিরকুমার অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং দাদার অভাবে সমস্ত জগৎ শূন্যময় বোধ করিতে লাগিলেন। কারণ বসন্তকুমার কেবল যে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন তাহা নহে, তিনি সকল বিষয়েই তাঁহার গুরুস্থানীয় ছিলেন। শিশিরবাবু লিখিয়াছিলেন,—যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, দাদা আমাকে তেমনি করিয়াই গড়িয়াছিলেন। তবে শিশিরকুমার ছিলেন বড় তেজস্বী পুরুষ; দারুণ আঘাত পাইয়াও মনের ও যৌবনের শক্তিতে তিনি তাঁহার অন্তঃকরণের আসল ভাব বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিতেন না,—অনেকটা অভ্যাসবশতঃ কাজকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেন। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময় সর্ব্বদা তিনি এরূপ অন্যমনস্ক থাকিতেন যে, জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর তারিখ, এমন কি মাস পর্য্যন্তও, তাঁহার স্মরণ ছিল না।

এই সময় একদিন শেষরাত্রিতে তিনি স্বপ্নে তাঁহার দাদাকে দেখিলেন। বসন্তকুমার তাঁহার কাছে আসিয়া যেন বলিতেছেন,—শিশির, আজ আমার মৃত্যুতারিখ, তাই তোমাকে দেখা দিতে আসিয়াছি। তারপর দুই ভাইয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল, উভয়েই শোকে অভিভূত হইলেন, শেষে শিশিরকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

তখন বেশ সকাল হইয়াছে, শিশিরকুমার উঠিয়া পড়িলেন। স্বপ্নের কথা তাঁহার তখন স্মরণ ছিল না; তবে বোধ হইতেছিল যেন কি একটা ঘটনা হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে না, তাই মনের মধ্যে কি এক রকম তোলপাড় করিতেছিল।

মনের এইরূপ অবস্থা লইয়া শিশিরকুমার তাঁহার এক প্রিয় সঙ্গীর সহিত রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলেন। পথে হঠাৎ স্বপ্নের কথা পরিষ্কার ভাবে তাঁহার স্মরণপথে পতিত হইল।

তিনি সঙ্গীকে বলিলেন,—কাল রাত্রে দাদা আসিয়া আমাকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন; সকল কথা এখন স্মরণ নাই, তবে এইটুকু মনে আছে, তিনি বলিলেন,—আজ আমার মৃত্যুতারিখ, তাই তোমাকে দেখা দিতে আসিয়াছি।

সঙ্গীটি বলিলেন,—তাহা কি করিয়া হইবে? তিনি মারা গিয়াছেন ফাল্গুন মাসে, আর এ যে চৈত্র মাস।

শিশিরবাবুর কিন্তু মনে হইতেছিল বৈশাখ মাসে তাঁহার দাদার মৃত্যু হইয়াছে। যাহাহউক সঙ্গীর কথা শুনিয়া এবং সময়ের এইরূপ গরমিল দেখিয়া, জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানিবার জন্য, শিশিরবাবু সঙ্গীসহ সত্বর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়ের নিকট বসন্তকুমারের মৃত্যুর তারিখ জিজ্ঞাসা করিলেন। আত্মীয় বলিলেন,—চৈত্র মাসের ১৫ই তারিখে তিনি মারা গিয়াছেন।

শিশিরকুমারের বিশ্বাস ছিল যে, এই আত্মীয়ের নিকট সঠিক সংবাদ পাইবেন। কিন্তু ইনি বলিলেন ১৫ই, আর বসন্তকুমার বলিয়াছেন ১২ই; ইহাই বা কি করিয়া হয়? তবে কি ইহলোকের ও পরলোকের দিন গণনার মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান থাকে? মনের মধ্যে এইভাবে আলোচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছুই হইল না। শেষে শুনিলেন পঞ্জিকাতে বসন্তকুমারের মৃত্যুতারিখ লেখা আছে।

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তখনই পঞ্জিকা বাহির করা হইল। তাহাতে যাহা দেখিলেন, তাহাতে শিশিরকুমারের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। পঞ্জিকায় লেখা আছে—বসন্তকুমার মারা গিয়াছেন চৈত্রমাসের ১২ই তারিখে !!!

ইচ্ছা মৃত্যু

মহাত্মা শিশিরকুমার

শিশিরবাবু ১৯১১ সালের ১০ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বেলা ১টার সময় এই মরজগৎ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করেন। সে সময় শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের ৬ষ্ঠখণ্ড ছাপা হইতেছিল। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হইতেছিল বলিয়া, উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিলেন,—মৃণাল, ৬ষ্ঠখণ্ড শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত যাহাতে আমি শেষ করিয়া যাইতে পারি তাহার বন্দোবস্ত কর। তখন আমরা জানিতাম না যে, তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন।

প্রকৃতই তাঁহার পরলোকগমনের তিনদিন পূর্ব্বেও, অর্থাৎ শনিবারে, ঘোড়ার গাড়ী করিয়া তিনি ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয়ের শিয়ালদহস্থ বাটীতে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার্থে গমন করিয়াছিলেন। পরদিবস রবিবারে সর্দ্দি লাগিয়া তাঁহার সামান্য জ্বরবোধ হয়। সোমবারে অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন। মঙ্গলবার প্রাতে জ্বর ছিল না। কাজেই অতি প্রত্যুষে উঠিয়া শৌচাদি শেষ করিয়া, ভজনকীর্ত্তনাদি ও পরে স্নানাহার করিলেন। তারপর ৬ষ্ঠ খণ্ড শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের শেষফর্ম্মার শেষ প্রুফ সংশোধন করিলেন এবং প্রুফটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—আজ আমার এখানকার কাজ শেষ হইল। আর আমার কোন বন্ধন রহিল না। এখন আমি সচ্ছন্দচিত্তে ইহজীবন ত্যাগ করিতে পারিব।

এই সময় একজন চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন,—আজ ত আপনি

ভালই আছেন। শিশিরবাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—আমি ভাল আছি বটে, তবে তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

ইহার কিছুক্ষণ পরে তাঁহার কনিষ্ঠাকন্যা সুহাসনয়নাকে তাঁহার কাছে রাখিয়া, সকলে আহারাদি করিতে গেলেন। শিশিরবাবু তখন ঘরের এক কোণে একটী তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিলেন, এবং তাঁহার চির অভ্যাস মত ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন; নিদ্রাও সামান্য হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—পরিবারস্থ সকলের আহারাদি হইয়াছে কি না? যখন শুনিলেন সকলেরই আহার হইয়াছে,' তখন তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে, উপবেশন অবস্থাতেই একবার "নিতাইগৌর" বলিয়া তর্জ্জনী উর্দ্ধে উঠাইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠাকন্যা নিকটে ছিলেন। তিনি পিতার ঐরূপ ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া সকলকে ডাকিলেন। আমরা যাইয়া দেখি তিনি নয়ন মুদিয়া বালিসে ঠেস্ দিয়া যেন ঘুমাইতেছেন। অনেক সময় এইভাবে বসিয়া তিনি ঘুমাইতেন। তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে, ঠিক বেলা একটার সময়, তাঁহার আত্মা দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া গেলেন।

সে সময় তাঁহার বদনের অপরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে সেই উপবেশন অবস্থাতেই তাঁহার একখানি ফটো লওয়া হইয়াছিল। এই ফটো দেখিয়া কেহ বলিতে পারেন নাই যে, এ দেহে প্রাণ নাই। বোধ হইতেছিল যেন তিনি অতি আরামে ঘুমাইতেছেন। যিনি ফটো তুলিয়াছিলেন, তিনিও বলিলেন যে, মৃতদেহের অনেক ফটো তিনি লইয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণত্যাগের পর বদনের এমন সুন্দরভাব তিনি কখনও দেখেন নাই।

পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন

ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদান্তরত্নও মহাত্মা শিশিরকুমারের ন্যায় ১৯১১ সালে জানুয়ারী মাসে পরলোকগমন করেন। তিনি যে পরমভগবদ্ভক্ত ছিলেন, তাহা সে সময় এই অঞ্চলের অনেকেই জানিতেন। যাহাহউক তিনি স্ব-ইচ্ছায় কেমন সহজ ভাবে জড়দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তাহা বলিতেছি।

শ্রাবণ মাসে ঝুলনের পর তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়। ইহার পর তিনি আরোগ্যলাভ করেন বটে, কিন্তু আবার অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই সময় একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি বলিলেন,—ইহজীবনের কালপূর্ণ হইবার আর বেশী দেরী নাই।

ইহার কয়েকদিন পরে, এক সোমবার প্রাতে কয়েক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তখন তিনি শ্রীগোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখস্থ আপনার শয়নকক্ষে বসিয়া শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। বেলা কিছু অধিক হইলে তিনি একজনকে চণ্ডীপাঠ করিতে বলিলেন। চণ্ডীপাঠের সময় পাঠকের উচ্চারণ অশুদ্ধ হইতেছে দেখিয়া তিনি উহা সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন।

চণ্ডীপাঠ শেষ হইলে তিনি ভক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে গীতার ১১শ ও ১২শ অধ্যায় পাঠ করিতে বলিলেন। গীতাপাঠ শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার বদনমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ হইল। তিনি ভক্তিভরে পুলকিত হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। গীতাপাঠ শেষ হইলে তাঁহার সুন্দর বদন যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তিনি প্রেমোচ্ছ্বাসিত প্রাণে প্রায় ১৫ মিনিটকাল সুমধুর স্বরে পবিত্র প্রণবধ্বনি উচ্চারণ

করিতে লাগিলেন। তৎপরে—'জয় গুরু, জয় গুরু, জ-য়-য়' বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং তিনি তনুত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার দেহের কোন বিকৃতিই হয় নাই। বদনমণ্ডল যেন ভাবে ও সৌন্দর্য্যে উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে, কেবল ভাবাবিষ্ট নয়নের দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে ধাবিত হইয়া আছে—এই মাত্র।

পদ্মলোচন ঘোষ

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ১২৭০ সালের পৌষমাসে আমার পিতামহ হরিনারায়ণবাবুর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ইহার ঠিক একবৎসর পরে সেই পৌষ মাসেই তাঁহার পিতা পদ্মলোচন ঘোষ মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যু একটী অদ্ভুত ঘটনা, —ইচ্ছামৃত্যু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যে সর্ব্বগুণধর পুত্র হরিনারায়ণ হইতে তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য, এত পদগৌরব, এত সুখভোগ, তাঁহাকে হারাইয়াও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পুত্রের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের সময় তিনি বলিয়াছিলেন,—আমি হতভাগা, কিন্তু সে ত ভাগ্যবান্ ছিল, কেন তাঁহার কাজ ভালরূপে করিব না?

এখন আমার প্রপিতামহ পদ্মলোচনের মৃত্যুর কথা বলিতেছি। একদিন কর্ত্তার (১) সামান্য জ্বর হইল। তিনি বলিলেন,—আমাকে তীরস্থ কর। এইকথা শুনিয়া তাঁহার এক ভাইঝি বলিলেন,—

(১) আমার প্রপিতামহ পদ্মলোচন ঘোষ মহাশয়কে সকলে "কর্ত্তা" বলিয়া ডাকিতেন।

জেঠামহাশয়, একবার তোমাকে গঙ্গাতীরস্থ করিয়া কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ ? (২)

ভাইঝির কথা শুনিয়া কর্ত্তা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি দুঃখ করিয়া কহিলেন,—তোরা কি ভাবিয়াছিস্ আমি মরিব না, চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব ? যাক্ যদি মা কালীর চরণে আমার মন থাকে, তাহা হইলে এইখানেই আমার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইবে। এই বলিয়া আমাদের পুরোহিত ৺দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়কে ডাকিয়া কহিলেন,—ভট্টাচার্য্য, তুমি যদি সত্যকার ব্রাহ্মণ হও, আর মা কালীর চরণে যদি আমার দৃঢ়ভক্তি থাকে, তাহা হইলে কল্য এই সময় এই পৃথিবীর সহিত আমার সম্বন্ধ লোপ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া নিজের একখানি ভাল শাল পুরোহিতকে দান করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন।

পরদিবস সকালে উঠিয়া কর্ত্তা হাতমুখ ধুইতে বসিলেন। এই সময় আমার পিতাঠাকুর হেমন্তকুমার তাঁহার নাড়ী দেখিয়া

(২) উপরে যে ঘটনার উল্লেখ করা হইল, তাহা আমার পিসিমাতা ঠাকুরাণী স্বর্গীয়া স্থিরসৌদামিনী লিখিত "আমাদিগের পারিবারিক প্রসঙ্গ" হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাবা যাইবার নয় মাস পূর্ব্বে ঠাকুরদাদার অত্যন্ত অরুচি হওয়ায় ও ইহার কিছুদিন আগে ঠাকুরমার মৃত্যু হওয়ায়, তিনি মরিব বলিয়া গঙ্গাতীরে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। কাজেই বাবা তাঁহাকে চাকদহে পাঠাইলেন। সেখানে যাইয়া তিনি বেশ সুস্থ হইলেন। বাবার ইচ্ছা ছিল তিনি আর বাটীতে না আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। কিন্তু তাহা না শুনিয়া তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে বাবা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—এত নিষেধ সত্ত্বেও বাবা যখন বাটীতে ফিরিলেন, তখন এবার আমার মৃত্যু নিশ্চয়। প্রকৃত তাহাই হইল, ইহার কয়েক মাস পরে বাবা মারা গেলেন।"

বলিলেন,—আপনার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে, একটু কুইনাইন খাইতে হইবে। এই কথা শুনিয়া পদ্মলোচন বিরক্তির স্বরে পৌত্রকে বলিলেন,—শালা, যে প্রাণ গেলে আমি বাঁচি, তাই আবার ঔষধ খাইয়া বাঁচাইব ?

যাহাহউক হাতমুখ ধোয়া হইলে তিনি বস্ত্রত্যাগ করিয়া আহ্নিকপূজা সমাধা করিলেন। তারপর আঙ্গুর বেদানা কমলানেবু প্রভৃতি ফলাদি খাইয়া পান চিবাইতে লাগিলেন। ৮২ বৎসর বয়স হইলেও তখন তাঁহার দাঁত একটীও পড়ে নাই।

তাহার পর ঘরে শুইতে আসিলে আমার মেজঠাকুরদাদা দেবনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র উমেশচন্দ্র বলিলেন,—তক্তপোষে শুইতে আপনার কষ্ট হইবে, মেঝের উপর বিছানা করিয়া দিউক। তাহা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন,—এখন মেঝের উপর বিছানা কর, একটু পরে ভূমিই আমার শয্যা হইবে।

যাহাহউক তাঁহাকে শয়ন করাইয়া এবং চাকর পাঁচকড়িকে সেখানে রাখিয়া, সকলে নীচে আহারাদি করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে মেজঠাকুরদাদার মধ্যমা পুত্রবধু উপরে আসিয়া কর্ত্তার ঘরে যাইয়া দেখেন, লেপে ঢাকা তাঁহার মুখ নড়িতেছে। ইহা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া তিনি পাঁচকড়ি চাকরকে তাঁহার মুখের লেপ খুলিয়া দিতে বলিলেন। লেপ উঠাইয়া দেখা গেল তাঁহার দিব্যচক্ষু হইয়াছে। তখন সকলকে ডাকিয়া তাঁহাকে নীচে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি গলার তুলসীমালা অঙ্গুলিতে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিলেন ও জপ করিতে লাগিলেন। এদিকে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইতে শুনাইতে তাঁহার ইহলীলা শেষ হইয়া গেল।

দীনবন্ধু মিত্র
৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন
১৭ই কার্ত্তিক ১২৮০ সাল (ইং ১।১১।৭৩)

পৃ—১১৪

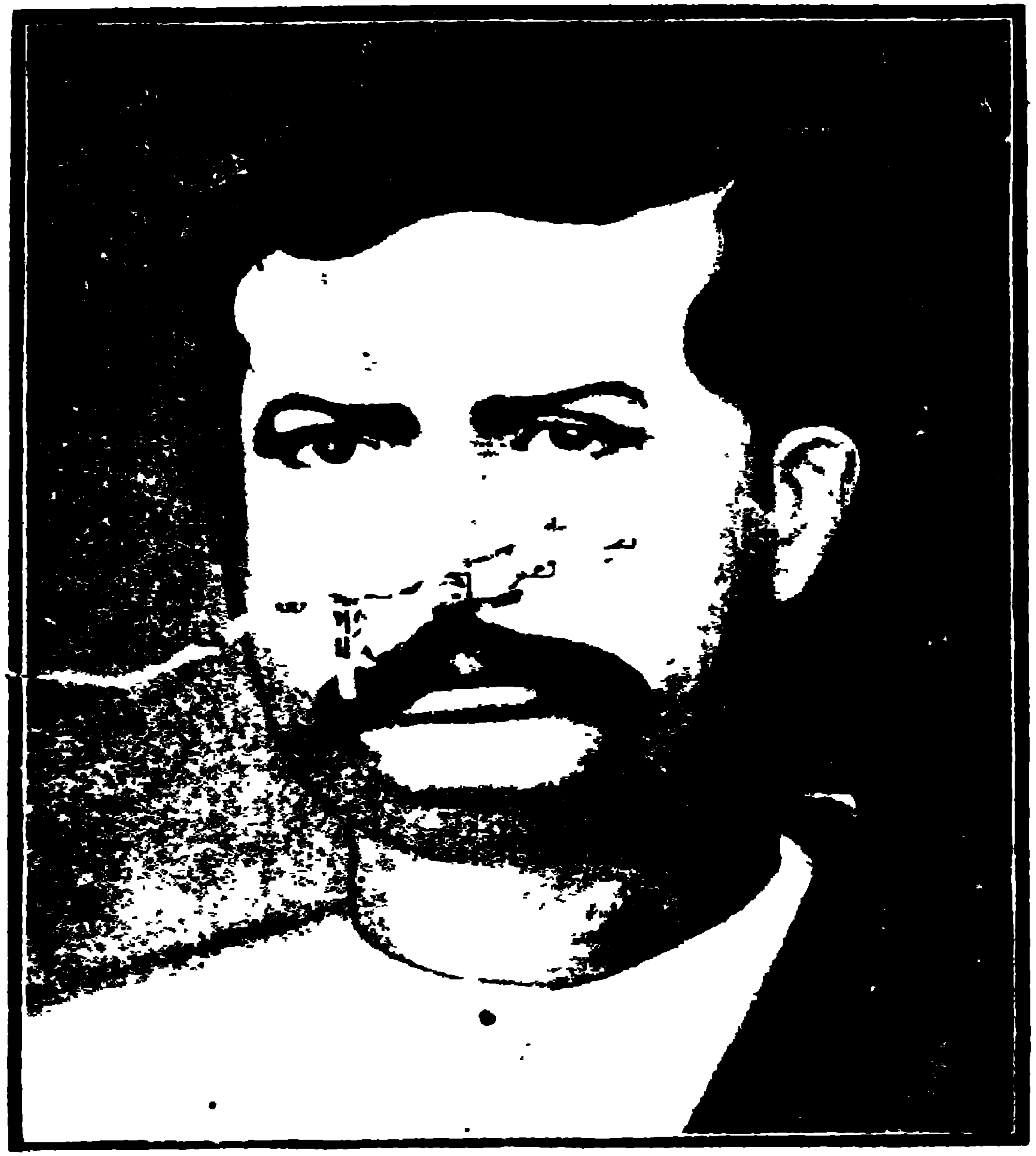

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

দ্বিতীয় অধ্যায়

যশোহরে আধ্যাত্মিক চর্চ্চা

প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে মহাত্মা শিশিরকুমার লিখিয়াছেন যে, নিজেদের পারিবারিক চক্র ব্যতীত অন্য কোন চক্রে তিনি যোগদান করিতেন না, কেবল একবার যশোহরে একটি চক্রে উপস্থিত ছিলেন। যশোহরে একদিন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র, যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদ্বয় পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাবডিনেট জজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ চৌধুরি, ম্যাজিষ্ট্রেটের হেডক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন চক্র করিয়া বসেন। শিশিরকুমারও এই চক্রে যোগদান করেন। কিছুকাল পরে দীনবন্ধু টেবিলের উপর হস্তদ্বয় পরিচালনা করিতে লাগিলেন। শেষে বোধ হইল তিনি যেন কিছু লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি কাহারও কাহারও মনে হইতে লাগিল হয়ত দীনবন্ধু চতুরতা করিতেছেন। এই বিষয় লইয়া একটু ঠাট্টা তামাসাও চলিতে লাগিল।

শিশিরকুমার তাঁহাদের পারিবারিক চক্রে এই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কাহারও উপর আত্মার আবির্ভাব হইলে তাঁহার দেহে কিরূপ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, তাহা তিনি জানিতেন। দীনবন্ধুর হাবভাব দেখিয়া তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার উপর প্রকৃতই কোনও আত্মার ভর হইয়াছে,

এবং ইহার ভিতর কোনরূপ তঞ্চকতা নাই। কাজেই শিশিরকুমার রাজকৃষ্ণ প্রভৃতিকে মৃদু তিরস্কার করিলেন; এবং শেষে মিডিয়মের হস্তে একটি পেন্সিল দিয়া, টেবিলের উপর একখণ্ড কাগজ রাখিলেন। মিডিয়ম তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে কাগজে হিজিবিজি কাটিতে লাগিলেন। তারপর অস্পষ্টভাবে হঠাৎ 'কূড়ন সরকার' কথাটী লেখা হইল। উপস্থিত কেহই এই লেখার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তৎপরে দীনবন্ধু বাবুর আবিষ্ট ভাব কাটিয়া সহজ অবস্থা হইলে, তিনি হিজিবিজি কাটা কাগজখানি দেখিতে লাগিলেন; সেই সময় 'কূড়ন সরকার'এর নাম তাঁহার নজরে পড়িল। তিনি ইহা দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—কূড়ন সরকার যে আমাদের বাড়ীর গোমস্তা ছিলেন। তিনি ত অনেকদিন মারা গিয়াছেন। তাহার নাম হঠাৎ লেখা হইল কেন? তাঁহার কথা ত বহুকাল আমি ভাবি নাই।

আর একদিন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র চৌধুরী, যশোহর স্কুলের হেডমাষ্টার উমাচরণ দাস প্রভৃতি কয়েকজন চক্রে বসিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের উপর আত্মার ভর হইল। তাঁহার হাতে পেন্সিল দিবামাত্র তিনি দাগ কাটিয়া কতকগুলি কাগজ নষ্ট করিলেন। শেষে মিল্‌টনের নাম লেখা হইল। মহাকবি মিল্‌টনের নাম দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। তখন তাঁহাকে একটি লাটিন কবিতা লিখিতে অনুরোধ করা হইল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া মিডিয়মের দক্ষিণহস্ত দ্বারা টেবিলের উপর সজোরে ঠক্‌ঠক্ করিয়া আঘাত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে হাত অবশ হইয়া পড়িল। তারপর দ্রুতগতিতে লাটিনভাষায় একটী কবিতা লেখা হইল। উপস্থিত কেহই লাটিনভাষা জানিতেন না। সেই সময় বিভাগীয় স্কুল ইনেস্পেক্টর সুপণ্ডিত ক্লার্কসাহেব কার্য্যোপলক্ষে যশোহরে

আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঐ লেখাটি দেখান হয়। তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন যে, ইহা একটি অসম্পূর্ণ লাটিন কবিতা, ইহাতে অনেক ভুল আছে।

রাজকৃষ্ণ মিত্রের "শোকবিজয়"

রাজকৃষ্ণ মিত্র যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট মন্‌রো সাহেবের অফিসের হেডক্লার্ক ছিলেন। এই সময় হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলালের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। শেষে কোন কারণে তাঁহার চাকুরী যায়। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবসা সুরু করেন। অল্পবয়সে তাঁহার অনেকগুলি আত্মীয়স্বজন মারা যাওয়ায় তিনি বিশেষ শোকগ্রস্ত হন। সুতরাং আমাদের পারিবারিক আধ্যাত্মিক চক্রের কথা শুনিয়া তিনি সেখানে কয়েকবার গিয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতায় যাইয়া ১৮৮১ খৃঃ অব্দে "শোক-বিজয়" নামক আধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে যশোহরের উল্লিখিত ঘটনা দুইটীর উল্লেখ আছে।

'শোকবিজয়' গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার সংকল্প তাঁহার মনে সর্ব্বপ্রথম কেন উদিত হয় তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আজ ১৭ বৎসরের (১৮৬৫) কথা, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় বাবু হেমন্তকুমার ঘোষ ও বাবু শিশিরকুমার ঘোষের অনুজ (হীরালাল) পরিবারবর্গকে শোকাভিভূত করিয়া পরলোকগত হন। সম্পাদকদ্বয় আমার পরমবন্ধু ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের দুঃখে আমিও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের

জননী—আহা! সেই বুদ্ধিমতী সুচতুরা পুণ্যবতী আর্য্যা-আদর্শ-নারী অমৃতময়ী,—পুত্রশোকে পাগলিনী-প্রায় হইয়াছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন না, কিন্তু শোকানল গুমিয়া-গুমিয়া তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিয়া একেবারে ছারখার করিতেছিল। শিশিরকুমার তাঁহাদিগের বাটীতে একটি আধ্যাত্মিক চক্র স্থাপন করেন। সেই চক্রে তাঁহারা কয়েক ভ্রাতা ভগিনী ও জননী প্রত্যহ বসিতেন। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহাদের দুই ভ্রাতা (হেমন্তকুমার ও মতিলাল) মিডিয়ম হন। এই চক্রে প্রথমে পরলোকগত হীরালালের আত্মার আবির্ভাব হইল। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মাতাঠাকুরাণীর শোকবেগ ক্রমে কমিয়া আসিল। তখন, কতক্ষণে সন্ধ্যা হইবে, কতক্ষণে চক্রে বসিয়া প্রাণাধিক পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে সারাদিন কাটিয়া যাইত। আমি জানিতাম শোকের কোন ঔষধ নাই। কিন্তু সেই পুত্রশোকসন্তপ্তা রমণীর শোকের বেগ দমন হইতে দেখিয়া আমি 'শোকবিজয়' লিখিবার সংকল্প প্রথমে করিলাম।"

অমৃতবাজারে আমাদের পারিবারিক চক্রে বসা সুরু হইতেই তাহার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। ইহা পাঠ করিয়া যশোহর কলিকাতা কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে নিয়মমত চক্রে বসা আরম্ভ হয়। যশোহরের চক্রে একদিন শিশিরকুমার বসিয়াছিলেন, এবং সেইদিন রাজকৃষ্ণও সেই চক্রে উপস্থিত ছিলেন, এ কথা উপরে বলিয়াছি। দীনবন্ধু মিত্রের উপর আত্মার ভর হইলে তাঁহার হাত নড়িতে থাকে। ইহা দেখিয়া রাজকৃষ্ণ প্রথমে উহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মনে হইল দীনবন্ধু চাতুরী করিতেছেন। কিন্তু শিশিরকুমারের মৃদু তিরস্কারে তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া

গেল। তখন তিনি বুঝিলেন, দীনবন্ধুর ন্যায় সুশিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ চাতুরী করা সম্ভবপর হইতে পারে না, সুতরাং ইহার মধ্যে কিছু সারসত্য নিশ্চয় আছে।

রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন,—পরদিন হইতে আমি নূতন চক্র স্থাপন করিলাম। সেই চক্রে ক্রমান্বয়ে দুই বৎসরকাল বসিয়া যে অদ্ভুত-ব্যাপার দেখিয়াছি তাহার ফলে, হৃদয়ের যে স্থানে এক সময় শোকশেল বিদ্ধ হইয়া গভীর গহ্বর হইয়াছিল, তথায় এখন মনোহর আশালতা ফলফুলে সুশোভিত করিয়াছে। জন্ম ও মৃত্যু, ইহকাল ও পরকাল—এ-বাড়ি ও-বাড়ি ব্যতীত যে আর কিছুই নহে, তাহা এক্ষণে বেশ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি।

'শোকবিজয়' গ্রন্থ অধুনা একেবারে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় রাজকৃষ্ণবাবুদের চক্রে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(ক) প্রথমদিনের চক্রে ২৩।২৪ বৎসরের একটি কায়স্থযুবক ১০।১৫ মিনিট বসিবার পরে যেন ঘুমাইয়া পড়িল। একটু পরে তাহার ডান হাতের আঙ্গুলগুলি অল্প অল্প নড়িতে লাগিল। তাহার হাতে পেন্সিল দিবামাত্র প্রথমে কাগজে হিজিবিজি কাটা হইল। তারপর প্রশ্নোত্তরে পারলৌকিক আত্মার নাম ধাম, ষাট বৎসর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যুর বিবরণ, তাহার কন্যার একমাত্র বিধবা কন্যার কথা, ইত্যাদি অনেক বিষয় লেখা হইল।

এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য পরদিবস সেই স্থানের থানার দারোগার নিকট পত্র লেখা হইল। ছয়দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল। দারোগা লিখিলেন যে, অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নামে একজন বর্দ্ধিষ্ণু চাষা ঐ গ্রামে বাস

করিত। এখন তাহার বাড়ীর চিহ্নমাত্রও নাই। অনুসন্ধান করিবার সময় একটী আধাবয়সী স্ত্রীলোক বলিল যে, সে ঐ ব্যক্তির কন্যার দৌহিত্রী। এই সংবাদ পাইয়া রাজকৃষ্ণবাবুদের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল এবং সেইদিন হইতে তাঁহারা যত্নসহকারে নিয়মমত সপ্তাহে ৩।৪ দিন করিয়া চক্রে বসিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য অনেক পদস্থ ব্যক্তি উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহেবেরা ইহা পছন্দ করিতেন না বলিয়া অনেকে প্রকাশ্যভাবে ইহাতে যোগ দিতে সাহসী হইতেন না।

(খ) একদিন চাঁচড়ার রাজা বরদাকণ্ঠ রায় সন্ধ্যার পর অতি গোপনে এই চক্র দেখিতে আসিলেন। সেদিন যশোহর নর্ম্মাল স্কুলে চক্রে বসা হয়। এই চক্রে ছয় বৎসরের একটি ব্রাহ্মণ বালকের উপর আত্মার ভর হইয়াছিল। রাজা আসিয়া দেখিলেন বালক জ্ঞানশূন্য ও তাহার চক্ষু মুদ্রিত। রাজার প্রশ্নোত্তরে মিডিয়মের হাত দিয়া, যে আত্মা ভর করিয়াছে তাহার নাম লেখা হইল। পাঠ করিয়া জানা গেল, উহা রাজার একজন অনুগত ব্যক্তির নাম, ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে সে মারা যায়। রাজা তখন সেই আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন। তুমি যদি সেই ব্যক্তিই হও, তবে বল দেখি তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার কি কথা হইয়াছিল ?

উত্তর। মৃত্যুর পর আপনাকে দেখা দিব বলিয়াছিলাম, এবং উহার জন্য চেষ্টাও করিয়াছি, কিন্তু আপনি দেখিতে পান নাই।

প্র। (বিস্মিত হইয়া) আচ্ছা, আমার শয়নকক্ষের প্রবেশপথে সিঁড়ির উপর কি আছে বল দেখি ?

উ। একখানা ছবি।

প্র। কাহার ছবি ?

উ। কেমন করিয়া বলিব ? তখন তো ও ছবি ছিল না।

প্র। ছবির নীচে নাম লেখা আছে, পড়িয়া দেখ।

উ। নী-ল-ক। আলো টিপটিপ করিয়া জ্বলিতেছে, ভাল পড়া যাইতেছে না।

প্র। ঠিক হইয়াছে। রাজা নীলকণ্ঠেরই ছবি বটে।

(গ) আর একদিন চক্রে বসিয়া মিডিয়মের হাত দিয়া বাহির হইল,—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মজুম—

প্রশ্ন। আপনি কি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ? তিনি ত মজুমদার ছিলেন না।

উত্তর। হাঁ আমি সেই বটে। মজুমদার আমাদের উপাধি। (১)

প্র। আপনি কেমন আছেন ?

উ। ভাল নয়।

প্র। কিসে ভাল নয়, কোন বিশেষ কষ্ট আছে কি ?

উ। বিশেষ কষ্ট নাই, তবে জড়জগৎ ছাড়িয়া আসা পর্য্যন্ত আজ এখানে কাল সেখানে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

প্র। আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিছু কবিতা লিখুন না ?

উ। আচ্ছা চেষ্টা করিয়া দেখি।

তৎক্ষণাৎ মিডিয়মের হাত বিদ্যুদ্বেগে চলিতে লাগিল, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে ১৩ ছত্র কবিতা লেখা হইয়া গেল। এই সময় দেখা গেল টিন বাঁধান শ্লেটে আঘাত লাগিয়া মিডিয়মের ডান হাত ২।৩ স্থানে কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। মিডিয়মের তখন একেবারে অচেতন অবস্থা, এবং

(১) পরে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, প্রকৃতই 'মজুমদার' তাঁহাদের উপাধি ছিল, এবং কবিবর ঐ ভাবে নাম সহি করিতেন।

হাতও অসাড় ও বোধশূন্য হইয়া গিয়াছে। আরও ক্ষতবিক্ষত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তখন তাহার হাত চাপিয়া ধরা হইল, এবং চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়া, তাহার আবিষ্টভাব ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। পরে জানা যায়, ঠিক এই সময় আটক্রোশ দূরে অন্য এক স্থানে চক্রে বসা হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয়ের আত্মা তৎক্ষণাৎ সেই চক্রের মিডিয়মের উপর ভর করিয়া ১৪ হইতে ২৪ ছত্র লিখিয়া কবিতাটি সম্পূর্ণ করেন। কবিতাটি অতি চমৎকার। ইহার ভাব যেমন সুন্দর, ভাষাও সেইরূপ সুমিষ্ট, আর অনুপ্রাসের ছড়াছড়িও ঠিক গুপ্তকবিরই ন্যায়। যাঁহারা গুপ্ত কবিবরের কবিতার গোঁড়া, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতারই অনুরূপ। দুঃখের বিষয় কবিতাটি রাজকৃষ্ণ তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করেন নাই; সম্ভবতঃ হারাইয়া গিয়াছিল।

(ঘ) আর একদিন এই চক্রে রাজকৃষ্ণের পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতৃদ্বয় একসময়ে উপস্থিত হন। রাজকৃষ্ণ তাঁহার শোকবিজয়ে লিখিয়াছেন,—তাঁহারা যেরূপভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা যে আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মা, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। তাঁহারা সেদিন অধিকক্ষণ ছিলেন না বটে, কিন্তু তেমন সুখের দিন আমার জীবনে আর কখনও আসে নাই। তারপর তাঁহারা, বিশেষতঃ মধ্যমভ্রাতা, আরও কতবার আমাকে দেখা দিয়াছেন ও কত সৎপরামর্শ দিয়াছেন। সেই দিন হইতে আমার জরাগ্রস্ত শরীর নবীন হইয়াছে, আর, আমার মন হইতে অন্ধকার ও সন্দিগ্ধতা দূর হইয়া সেই স্থানে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে ও অনিশ্চিততার কোলাহল স্থলে আনন্দের স্থির বারি চির অধিকার করিয়াছে।

(ঙ) একদিন সাহেবদিগের ভয়ে মিডিয়মের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে

চক্রে যাইতে দিবেন না বলিয়া ঘরে বন্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহারা যে এইরূপ করিবেন ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া, চক্রের উপস্থিত সভ্যগণ মিডিয়মের জন্য অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাই চক্রে বসিলেন, এবং বাহিরের লোক আসিয়া পাছে তাঁহাদের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটায় এইজন্য ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের বসিবার কিছুক্ষণ পরে সজোরে কপাট ভাঙ্গিয়া কে একজন ঘরে প্রবেশ করিল এবং চক্রে আসিয়া বসিল। ঘর অন্ধকার ছিল বলিয়া লোকটীকে দেখা গেল না। সেইজন্য টেবিলের নীচে যে আলো ছিল তাহা উঠাইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদের মিডিয়মই আসিয়া চক্রে বসিয়াছে।

চক্রে বসা শেষ হইয়া গেলেও মিডিয়ম অচেতন অবস্থায় বসিয়া রহিল। তখন দেখা গেল, মিডিয়মের চক্ষুর তারা উপরে উঠিয়াছে; আর দেহ এরূপ অসাড় হইয়াছে যে, আগুন চাপিয়া ধরিলে কি সূচ বিদ্ধাইয়া দিলেও তাহার দেহে সাড় বোধ নাই। নানারূপ চেষ্টা করিয়া তাহাকে সহজ অবস্থায় আনা হইল। পরে জানা গেল, চক্রের কাজ আরম্ভ হইলে, মিডিয়ম তাহার আবদ্ধ-ঘরে অজ্ঞান হইয়া পড়ে, এবং সেই অবস্থায় সজোরে কপাট ভাঙ্গিয়া ঘর হইতে বাহির হয়, এবং মাঠঘাট খানাখন্দ ভাঙ্গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া চক্রে যোগদান করে। ইহা যে কোন অদৃশ্য শক্তির বলে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

(চ) প্রথম বৎসর এই চক্রে যে সকল আত্মা আসিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নস্তরবাসী। তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তায় জানা যাইত তাঁহারা অশান্তিতে আছেন। পরবৎসর বসন্তকালের প্রারম্ভে একদা এই চক্রে একটী উচ্চস্তরের পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হইল। তখন ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ থাকায় ঘর বেশ অন্ধকার ছিল।

হঠাৎ মনে হইল দরজার ফাঁক দিয়া গৃহমধ্যে একটি স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি প্রবেশ করিল। সেই আলোকে ঘরের মধ্যস্থিত সমস্ত দ্রব্য আব্ছায়ার মত দেখা যাইতে লাগিল। সেই সময় গৃহমধ্যস্থিত সকলেরই মন বেশ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। মিডিয়ম দেখিতে কুৎসিৎ ছিল, কিন্তু সে সময় মনে হইতে লাগিল যেন তাহার মুখের চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহার চোখ মুখ দিয়া জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। মিডিয়মের তখন স্পন্দনহীন অচেতন অবস্থা, চক্ষু চাহিয়া আছে কিন্তু তারা দুটী উপরে উঠিয়া গিয়াছে, বদন সহাস্য। সে কখন কোনরূপ বাজনা বাজাইতে জানিত না, কিন্তু সেই আবেশ অবস্থায় দুই হাত দিয়া টেবিলের উপর চৌতাল বাজাইতে ও দুই পায়ে তাল দিতে লাগিল। একটু পরে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—বা! বা! কি সুন্দর! কি আনন্দ!

তখন সেই পারলৌকিক পবিত্র আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি কবিতা ছন্দে উত্তর দিলেন—

আজ নিজ পরিচয় নাহি দিব ভাই।
নাম জানিবার কোন প্রয়োজন নাই॥

বা! বা! কি আনন্দ! কি আনন্দ! (বাজনা)

প্রশ্ন। আপনি কেমন আছেন?

উ। পৃথিবীতে আমি কোন দোষ করি নাই।
সেই জন্য হেথা এত সুখে আছি ভাই॥

বা! বা! কি আনন্দ! কি আনন্দ! (বাজনা)

প্র। ঈশ্বরকে কি করিয়া পূজা করা উচিত?

উ। প্রেম-পুষ্প শ্রদ্ধা-নীর ভাব-বিল্বদল।
সবে মাত্র এই কর্ব্বা পূজার সম্বল॥

বা! বা! কি আনন্দ! কি আনন্দ! (বাজনা)

এক ঘণ্টাকাল এইরূপ নানাপ্রকার প্রশ্ন করা হইল। প্রশ্ন মুখ দিয়া বাহির না হইতেই, তিনি কবিতা-ছন্দে সমুচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। উপদেশও অনেক দিলেন। পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহার অদ্ভুত মত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন,—

জন্মকালে আত্মা সকল বিষয়ে মূর্খ থাকেন, কলেবর বৃদ্ধির সহিত জ্ঞানের সমৃদ্ধি হইয়া থাকে। চিরোন্নতি উঁহার ভাগ্য; কোনকালে কতদিনে সম্পূর্ণ হইয়া জ্ঞানময় হইবেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। অসম্পূর্ণ কালের কার্য্যের নাম পাপ; মস্তিস্কের গঠন তরবিং বা সংসর্গ দোষে অনেকে অনেক অন্যায় কার্য্য করে, তজ্জন্য পাপী বলিয়া তাহাদের অনন্ত নরকভোগ কখন হইতে পারে না। অসম্পূর্ণ দেহ দিয়া সম্পূর্ণ ফল প্রত্যাশা করা ন্যায়বান্ পুরুষের কার্য্য নহে। অতএব আমাদের পরম কারুণিক জগৎ-পিতা যে ন্যায়বান্ নহেন তাহা কোনমতে স্বীকার করিতে পারি না। সন্তান অজ্ঞানতাবশতঃ দুষ্কর্ম্ম করিলে সুবিজ্ঞ পিতা দণ্ড না দিয়া তাহার অজ্ঞানতা দূর করিবার চেষ্টা করেন। অতএব আমাদের জ্ঞানময় পিতা যে সুবিজ্ঞ নহেন, তাহাও কোনমতে স্বীকার করিতে পারি না। তৎপরে তিনি আরও বলিলেন,—যে ব্যক্তি আত্মার উন্নতির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইয়া আত্মাকে অধোগামী করাইবার চেষ্টা করে, সে নরহত্যাকারী অপেক্ষাও অধিক দোষী। শেষে বলিলেন,—তোমরা এইরূপ ভাবে চক্রে বসিতে থাক, আমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া তোমাদের উপদেশ দিব। শেষে 'আনন্দময় আনন্দে রাখুন' বলিয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সমস্ত জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইল। আবেশ ভাঙ্গিয়া গেলে মিডিয়ম বলিলেন,—চক্রে বসিবার কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম সুদীর্ঘ আলোকময় এক ব্যক্তি

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর আমি ঘুমাইয়া পাড়লাম, আর কিছু জানি না।

(ছ) একদিন চক্রে বসিতে বসিতেই মিডিয়মের হাত নড়িতে লাগিল। হাতে পেন্সিল দিবামাত্র ইংরাজিতে একজন পদস্থ লোকের নাম লিখিত হইল। নাম পড়িয়া রাজকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার নিবাস কোথায় ছিল ?

উত্তর। অমুক সহরে'।

প্র। আপনার বংশে কেহ কি জীবিত আছেন ?

উ। হাঁ, আমার বৃদ্ধমাতা ও স্ত্রী (অমুক) জীবিত আছেন।

প্র। আপনি আমাকে কি কখন দেখিয়াছেন ?

উ। তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও ? তোমার ভাই নবীন 'আমার সঙ্গে আছেন। আমার শরীর ত্যাগের চারি বৎসর পূর্ব্বে তোমাদের বারাসাতের বাটীর আটচালা-ঘরে তোমাকে কাছে বসাইয়া ভূগোলের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, এবং তুমি তাহার যে উত্তর দাও তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। ইহাই বলিয়া সেই প্রশ্ন ও তাহার উত্তরগুলি বলিলেন।

রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন,—ইহা ২৫।২৬ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। আমি ভিন্ন আর কেহ ইহা জানিত না। ইনি আমার মধ্যমভ্রাতা নবীনবাবুর পরমবন্ধু ছিলেন। এমন কি, ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা দুইজনে দিবানিশি একত্রে ভোজন শয়ন ভ্রমণ করিতেন, আর আমাকে দেখিলেই কাছে বসাইয়া আমোদ করিতেন। কাজেই তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ রহিল না।

অন্যান্য কয়েকটী প্রশ্নের পর রাজকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, দেহ হইতে যখন আপনার আত্মা বহির্গত হইল, তখন আপনার কিরূপ

বোধ হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য আমরা বিশেষ উৎসুক; অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

তখন মিডিয়মের মুখ দিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি বাহির হইল :—

আমি দেখিলাম আমার দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, আর আমি তাহার কিঞ্চিৎ উপরে দাঁড়াইয়া আছি। মনে ভাবিলাম, এ কি! যেন জ্ঞানবুদ্ধি একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, লোকজনেরা ও ডাক্তার সেই দেহটা নাড়াচাড়া করিতেছে ও ঘাড় নাড়িতেছে। এই সময় দুইটী মুক্তাত্মা আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। কিন্তু কোন্ স্থান দিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছেন তাহা আমার আদপে বোধ ছিল না। এইরূপ আচ্ছন্ন অবস্থায় যে কতদিন ছিলাম তাহাও বলিতে পারি না। এইভাবে কিছুকাল কাটিবার পরে ক্রমে আমার হুঁস হইতে লাগিল। যে দুইজন আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বদা আমাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আমার স্ত্রীকে বড় ভালবাসিতাম ও জ্যেষ্ঠাকন্যাকে বড় স্নেহ করিতাম। সেইজন্য তাহারা সকলে কোথায় গেল, প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। ক্রমে মায়ার টানে তাহাদের সন্ধান পাইলাম এবং সর্ব্বদা তাহাদের নিকট যাইতাম। সেই পবিত্র আত্মাদ্বয়ের উপদেশ মত আমার স্ত্রীর মতিগতি সৎপথে লওয়াইতাম। ইহার ফলে আমার স্ত্রী আমার অর্থ যে পরিমাণে সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন, সেই পরিমাণে আমার চক্ষুর ঝাপ্সা কাটিয়া যাইতে লাগিল। তোমার ভাই নবীনের এখানে আসিবার দুই বৎসর পর হইতে আমরা পূর্ব্বমত একত্র সুখে আছি।

কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ কাটিল, শেষে **"মানুষের মৃত্যু নাই"** —এই কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিও বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কলিকাতায় আধ্যাত্মিক চর্চ্চা

কোন্ সময় হইতে এবং কাহার দ্বারা কলিকাতায় পারলৌকিক চর্চ্চা প্রথম আরম্ভ হয় তাহা ঠিক জানা যায় না। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, প্রাচীন অধ্যাত্মতত্ত্ববাদীদিগের মধ্যে রাজা দিগম্বর মিত্রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজনারায়ণ বসু একটী প্রবন্ধে বলেন যে, রাজা দিগম্বর পরলোকবাদী ছিলেন, এবং এই সম্বন্ধে চর্চ্চা করাই ছিল তাঁহার মুখ্যকর্ম্ম। পরলোক ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বলিতেন, —এখানে যেমন বন্ধুবান্ধব লইয়া আহারাদি করি, পরজগতে যাইয়াও ঠিক সেইরূপ করিব; তবে বিভিন্নতা এই যে, এখানকার ন্যায় সেখানকার খাদ্যদ্রব্য জড়ীয় নহে, সবই ইথারের ন্যায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। একবার তাঁহার একটী পৌত্র তাঁহার উচ্চপ্রাসাদের উপর হইতে পড়িয়া আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরলোকগত পুত্র গিরিশচন্দ্রই আপন পুত্রের জীবনরক্ষা করিয়াছেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনও পারলৌকিক তত্ত্বের আলোচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, এই সম্বন্ধে চর্চ্চা করিলে আমাদের কুসংস্কার দূরীভূত হইবে। তিনি আমেরিকায় যাইয়া কয়েকজন প্রসিদ্ধ পরলোকবাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এ সংবাদও জানা যায়।

রাজা দিগম্বর মিত্র

৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

১৬ই বৈশাখ ১২৮৬ সাল (ইং ২৯।৪।৭৯)

[পৃঃ—১২৮

পরলোকের কথা

প্যারীচাঁদ মিত্র

৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

৭ই অগ্রহায়ণ ১২৯০ সাল (ইং ২৩।১।৮৩)

[পৃঃ—১২৯

পরলোকবাদী প্যারীচাঁদ মিত্র

এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মধ্যে রাজা দিগম্বরের মত ২।৪ জন আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসী থাকিলেও, প্যারীচাঁদ মিত্রই এই সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও আলোচনা আরম্ভ করেন বলিয়া মনে হয়। প্যারীচাঁদ তাঁহার "On the Soul" নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, উপর্য্যুপরি কয়েকটী শোক পাইয়া শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার মন অধিকতর আকৃষ্ট হয়। শেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, তিনি নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন।

সেই সময় আমেরিকায় ও ইউরোপে পারলৌকিক চর্চ্চা বিশেষভাবে চলিতেছিল; নানা স্থান হইতে এই সম্বন্ধে পুস্তকাদি বাহির হইয়াছিল, এবং সংবাদপত্রেও আলোচনা হইত। প্যারীচাঁদ তখন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক ছিলেন। এই লাইব্রেরীতে এই সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক ছিল তাহা কিছু কিছু তিনি পড়িয়াছিলেন। কিন্তু উপর্য্যুপরি কতকগুলি প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক পাইয়া পরজগতের সংবাদ জানিবার প্রবল বাসনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে, এবং তখন হইতে তিনি ঐ সকল পুস্তক পাঠে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এরূপ নিদারুণ শোক না পাইলে, হয়ত এই গ্রন্থাদি পাঠ করিবার আগ্রহ আদৌ তাঁহার হইত না, এবং পরলোক সম্বন্ধে চর্চ্চা করিয়াও এরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না।

১৮৬১ সালের মে মাসে আমেরিকার সুবিখ্যাত অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত জজ ডবলিউ এড্‌মণ্ডস্ (W. Edmunds) সাহেবের নিকট পরলোক সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় জানিবার জন্য প্যারীচাঁদ মিত্র পত্র লেখেন। প্রত্যুত্তরে তিনি যে সকল সদুপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা প্যারীচাঁদ তাঁহার Stray Thoughts on Spiritualism নামক পুস্তকে প্রকাশ করেন। এড্‌মণ্ডস্ সাহেব ব্যতীত তিনি জেমস্ বার্নস্, জে জে মোর্স, বিবি এম্মা এইচ বৃটেন প্রভৃতি পরলোকতত্ত্ববাদীদিগের সহিতও পত্র ব্যবহার করিতেন।

১৮৬৩ সালে ডাঃ বেরিগ্‌নী নামক একজন ফরাসী হোমিওপ্যাথ অষ্ট্রেলিয়া হইতে কলিকাতায় আসেন। তিনিই এখানে প্রথমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রচলন করেন বলিয়া প্রকাশ। অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিষয়েও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার সংসর্গে আসিয়া তাৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই দুই বিষয়ের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। ডাঃ বেরিগ্‌নীর বাটীতেই প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বপ্রথম চক্র করিয়া বসিতে সুরু করেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা নিয়মমত এই চক্রে বসিতেন, এবং এই চক্রে বসিয়াই তিনি প্রথমে মিডিয়ম হন। কিছুকাল এই সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ ও চর্চ্চা করিয়া তাঁহার দৃঢ়ধারণা হয় যে, যোগসাধনের ও পারলৌকিক চর্চ্চার ফল এক প্রকারই হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই উভয়বিধ চর্চ্চাদ্বারাই আমাদের পাশবিক বৃত্তিগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

রাজকৃষ্ণ মিত্র তাঁহার 'শোকবিজয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্যারীচাঁদ মিডিয়ম হইবার পর হইতে তাঁহার পরলোকগতা

কেশবচন্দ্র সেন

নরেন্দ্রনাথ সেন

[পৃ—১৩০

পত্নী সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিয়া অন্তরীক্ষে পতিসেবা ও আপদ বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেন। প্যারীচাঁদ চক্ষু বুঁজিয়াও তাঁহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইতেন। এই সময় হইতে তাঁহারা নিজবাড়ীতে চক্র করিয়া বসিতেন, এবং ক্রমে তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূরাও মিডিয়ম হন। এই চক্রে তাঁহাদিগের পরলোকগত নিজজনের ও অন্যান্য লোকের আত্মার আবির্ভাব হইত।

১৮৬৯ সালে বিশেষ কোন কারণবশতঃ রাজকৃষ্ণ মিত্রের যশোহর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ডাঃ বেরিগ্নীর নিকট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও পারলৌকিকতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, এবং যশোহরে অবস্থানকালীন এই দুই বিষয়েরই বিশেষ চর্চ্চা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বিডন উদ্যানের পশ্চিম পার্শ্বস্থ চিৎপুর রোডের ৩৪৯নং বাটীতে বাস করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ এবং প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া পারলৌকিক চর্চ্চা করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় মরাণ কোম্পানির অফিসের ম্যানেজার জে জি মিউজেন্স সাহেব অধ্যাত্মতত্ত্ববাদী ছিলেন। চার্চ্চলেনস্থ ৩নং বাটীতে তাঁহাদের অফিস ছিল। ডাঃ বেরিগ্নীর পসার ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি নিয়মমত চক্রে বসিতে পারিতেন না। সেইজন্য মিউজেন্স সাহেবের অফিসে সমিতির কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয়, এবং এখানে প্রতি রবিবার অপরাহ্নে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন মিলিত হইয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করিতেন, এবং নিয়মমত চক্রে বসিতেন।

কলিকাতায় পারলৌকিকতত্ত্ব সভা

এখানে কিছুকাল এইভাবে আধ্যাত্মিক চর্চ্চা চলিবার পর, ধারাবাহিকরূপে অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিবার জন্য, ১৮৮০ সালের '৩০শে মে তারিখে একটী সমিতি গঠিত হইল, এবং ইহার নামকরণ করা হইল,—"ইউনাইটেড এসোসিয়েসন অফ স্পিরিচুয়ালিষ্টস্"। জে জি মিউজেন্স এই সমিতির সভাপতি, নরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদক, এবং কয়েকজন শিক্ষিত বাঙ্গালী ইহার সদস্য মনোনীত হন। কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী ও "ইণ্ডিয়ান মিরার" কাগজের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন সময় অভাবে কিছুকাল পরে সভার সম্পাদকীয় ভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, এটর্নী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন।

১৮৬৩ সালে ডাঃ বেরিগ্নীর বাটীতে আধ্যাত্মিক চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এখান হইতে মিউজেন্স সাহেবের অফিসে কোন্ সময় এই সমিতি স্থানান্তরিত হয়, তাহা জানা যায় না। তবে ১৮৬৩ সাল হইতে ১৮৮০ সালের মে মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৭ বৎসর যাবৎ সমিতির সদস্যেরা নিয়মমত চক্রে বসিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে যাঁহারা মিডিয়ম হন, তাঁহারা আবিষ্ট অবস্থায় কথা বলিয়া ও লিখিয়া পরলোক সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে কেহই সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। এই কারণে বিলাত হইতে একজন ভাল মিডিয়ম আনিবার জন্য মিউজেন্স সাহেব বিলাতে তাঁহার এক বন্ধুর নিকট টেলিগ্রাম করেন।

সেখান হইতে একজন মিডিয়ম এখানে আসিতে স্বীকৃতও হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে দৈবদুর্বিপাকে তাঁহার আর আসা হইল না।

সমিতির সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়া পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগান বাটীতে উক্ত সমিতির অধিবেশনের ও আধ্যাত্মিক চক্রে বসিবার স্থান নির্দিষ্ট করেন। ইহার এক বৎসর পরে মিউজেন্স সাহেব বিলাতের "লাইট" নামক অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদপত্রে তাঁহাদের সমিতির কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একখানি পত্র লেখেন।

মিউজেন্স সাহেব এই পত্রে বলেন যে, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাগানবাড়ী সমিতির কার্য্যের জন্য দিয়াছেন। এখানে গত বারমাস প্রায় প্রত্যেক রবিবারে তাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু চক্রে বসিয়া আশানুরূপ ফল পান নাই। যখন সাফল্য লাভের আশা আঁদপে নাই ভাবিয়া তাঁহারা একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন, ঠিক সেই সময় সমিতির অন্যতম সদস্য ডাঃ রাজকৃষ্ণ মিত্র তাঁহার একজন রোগীকে একদিন তাঁহাদের চক্রে আনিলেন। এই যুবক রাজকৃষ্ণের আত্মীয়, এবং ইহার নাম নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ। ইঁহার উপর-আত্মার ভর হইত এবং পরে ইনি একজন ভাল মিডিয়ম হন।

মিডিয়ম নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ

রাজকৃষ্ণ মিত্রের 'শোকবিজয়' গ্রন্থে নিত্যনিরঞ্জনের পরিচয় এইরূপ আছে,--বারাসতনিবাসী নিত্যনিরঞ্জন ঘোষকে 'নিশি'তে পাইয়াছিল। একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় হঠাৎ 'যাইরে' বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া শ্মশানে যাইয়া বসিয়াছিল। আর এক দিন রাত্রে ঐ ভাবে আমাদের বাগানের ঝিলে যাইয়া এক

গলা জলে বসিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যহ এইরূপ করিতে থাকায়, তাহার অভিভাবকেরা তাহাকে কলিকাতায় আমার কাছে চিকিৎসার্থে পাঠাইয়া দেন।

নিত্য আসিবামাত্র আমি একগ্লাস জল মেস্‌মেরাইজ করিয়া, ঐ জলের দিকে তাহাকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে বলিলাম। অল্পক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে বলিল যে, গ্লাসের মধ্যে দুইখানি ছোট হাত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে হাত দুইখানি ক্রমে বড় ও তেজোময় হইল। ইহা দেখিয়া সে অত্যন্ত ভয় পাইল, ও গ্লাস ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া বাটীর বাহিরে চলিয়া গেল। সেখান হইতে ৪।৫ জন লোক তাহাকে ধরিয়া আনিলে দেখা গেল, তাহার সর্ব্বশরীর স্পন্দনহীন ও লোহার মত শক্ত, চক্ষু মুদিত অথচ তারা উপরে উঠিয়া গিয়াছে, এবং চোয়াল বন্ধ রহিয়াছে। তখন তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ৭।৮ বার ও চোয়ালে কয়েক বার 'পাস' দিলে, তাহার দাঁতকপাটি ছাড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ আউ আউ করিয়া শেষে সে বলিল,—কেন আমাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছ ?

পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে, তাহার নাম ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, বাড়ী যশোহর জেলায়। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া একদিন রাস্তা দিয়া যাইবার সময় ৪।৫ জন লোক বিষমাখান শড়কি মারিয়া তাহাকে হত্যা করে। অপর কেহই ইহা জানে না। ঐ টাকা কেহ লইতে পারে নাই, দেওয়ালে পোতা আছে। হত্যাকারীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে প্রেতাত্মা কিছুতেই বলিল না।

পরদিন অর্থাৎ ১৮৮১ সালের ৫ই জুন রবিবার রাজকৃষ্ণ

নিত্যনিরঞ্জনকে লইয়া বেলগাছিয়ার বাগানে গেলেন, এ কথা উপরে বলিয়াছি। মার্কিনদেশীয় অনারেবল ক্রস্, মিউজেন্স সাহেব এবং প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি আরও ১৫।১৬ জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিত্যনিরঞ্জনকে লইয়া তখনই চক্রে বসা হইল। অল্পক্ষণ পরে তাহার উপর এক প্রেতাত্মার ভর হইল। সে তৎক্ষণাৎ চক্র হইতে উঠিয়া নক্ষত্রবেগে ঘরের বাহির হইয়া গেল ও দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল। ইহা দেখিয়া সকলে চক্র হইতে উঠিয়া বাগানের গেটের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সময় ক্রস্ সাহেবের পরামর্শ মত রাজকৃষ্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে আদেশ করিলেন যে, নিত্য যেখানে যে ভাবে আছে ঠিক সেইভাবে থাকুক। তারপর নিত্যর অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠান হইল। একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নিত্য আবিষ্ট অবস্থায় কিছু দূরে রাস্তার ধারে একটা খেজুর গাছের কাছে, সাহেবদিগের 'পল্কা' নাচের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে, অনবরত খেজুরগাছে উঠিতেছে ও নামিতেছে। একজন হিন্দুস্থানী তাহাকে ধরিতে গিয়াছিল, কিন্তু নিত্য তাহাকে বামহাত দিয়া এমন ধাক্কা দিল যে, সে দুই তিন হাত দূরে যাইয়া পড়িল।

এই কথা শুনিয়া রাজকৃষ্ণ তাহার নিকট গেলেন, এবং ক্রস্ সাহেবের কথামত তাহাকে স্পর্শ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল ও তাঁহার আদেশে নিতান্ত ভালমানুষের মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাগানে ফিরিয়া আসিল। তখন তাহাকে বৈঠকখানায় শোয়াইয়া, তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কয়েকবার পাস দেওয়ায়, সে স্থির হইয়া রহিল। তৎপরে আরও কয়েকবার পাস দেওয়ায়, যে প্রেতাত্মা ভর করিয়াছিল, সে মিডিয়ম দ্বারা আপনার পরিচয়

দিল। ইহাতে জানা গেল, ইহজগতে থাকিতে সে সর্ব্বদা অসৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকিত, কখনও ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত স্মরণ করে নাই। এই অবস্থায় পরজগতে যাইয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং এক্ষণে বারাকপুর ট্রাঙ্করোডের ধারে একটী বটগাছ আশ্রয় লইয়া আছে এবং বড়ই কষ্টভোগ করিতেছে। কিন্তু সেই দিন চক্রে আসিয়া শ্রীভগবানের নাম গান শুনিয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিল।

এই সময় "বৃটিশ ন্যাসনাল এসোসিয়েসন অফ স্পিরিচুয়ালিষ্টস্" নামক বিলাতের এক পারলৌকিক সমিতির সভাপতি আলেক্জেণ্ডার কল্ডার সাহেব কলিকাতায় আসেন। তিনি কলিকাতার আধ্যাত্মিক সমিতির পরবর্ত্তী দুইটী (অর্থাৎ ১২ই ও ১৯শে তারিখের) অধিবেশনে ও চক্রে যোগদান করিয়াছিলেন। মার্কিনদেশীয় অনারেবল ক্রস্ ও বিলাতের কল্ডার সাহেবের উপস্থিতিতে জুন মাসের চারিটী রবিবারের অধিবেশনের ও চক্রের কার্য্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

১২ই জুন তারিখে বেলগাছিয়ার বাগানে বেলা ৪॥ টার সময় চক্রে বসা হয়। তাহাতে,—এ কল্ডার, জে জি মিউজেন্স, প্যারীচাঁদ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। শেষোক্ত দুই জন মিডিয়ম ছিলেন। চক্রে বসিবার প্রায় ১৫ মিনিট পরে ইহাদিগের দুইজনের উপরই আত্মার ভর হয়। সত্যচরণের আবেশ অবস্থা বেশীক্ষণ ছিল না, কিন্তু নিত্যনিরঞ্জন বিশেষ ভাবে আবিষ্ট হয়। মিউজেন্স ও প্যারীচাঁদ তাহাকে ইংরাজিতে প্রশ্ন করেন। মিডিয়মের মুখ দিয়া বাঙ্গালায় ইহার যে সকল উত্তর বাহির হয় তাহার মর্ম্ম পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

যথা—আমার নাম মধুসূদন মিত্র। আমি প্যারীচাঁদের ভাই। এখানে বিশেষ অশান্তিতে আছি। প্যারীচাঁদকে গোপনে কিছু বলিব।

এই কথা শুনিয়া মিডিয়ম ও প্যারীচাঁদ ব্যতীত অপর সকলে ঘরের বাহিরে গেলেন। ৮।১০ মিনিট পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে, প্যারীচাঁদ বলিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতাই যে নিত্যের উপর ভর করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ তিনি পাইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার নিজের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

এই আত্মা ছাড়িয়া গেলে, আর একজন নিত্যের উপর ভর করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার নাম শরৎচন্দ্র মিত্র। তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। এক বৎসর পূর্ব্বে পীড়িত অবস্থায় তিনি তাঁহার নিকট-আত্মীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কালীচরণ ঘোষের মির্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে ছিলেন। এখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই।

তৎপরে তিনি বলিতে লাগিলেন,—এখানে আমি বেশ আনন্দে আছি। ভগবানের ভজনা ভিন্ন আমার এখন আর অন্য কোন কাজ নাই। এখানে জাতিগত বা বর্ণগত কোন পার্থক্য নাই। দেহত্যাগের সময় এখানে আসিয়া পরলোকগত আত্মীয়স্বজনদিগকে দেখিয়া প্রথমে আমি ভয় পাইয়াছিলাম। এখন তাঁহাদের সঙ্গে বেশ আনন্দে আছি। আমি যেখানে আছি, এখানে সবই আনন্দময় ও সুখময়। আমার পিতামাতা আমার বিরহে শোকে অভিভূত হইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে আমার কথা জানাইবার জন্য আমি আজ এখানে আসিয়াছি। কিন্তু আপনারা তাঁহাদিগকে জানেন না বলিয়া আমার আত্মীয় কালীচরণ ঘোষের নাম করিলাম।

যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই শরৎকে চিনিতে পারিলেন না। এই সময় রাজকৃষ্ণ মিত্র সেখানে আসিলেন। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন যে, শরৎকে তিনি জানিতেন, এবং সে তাঁহারই চিকিৎসাধীন ছিল। তাহার সকল কথাই ঠিক।

১৯শে জুন তারিখের চক্রে নিত্যনিরঞ্জনের উপর এক আত্মার ভর হয় তিনি বলেন যে, তাঁহার নাম দেবেন্দ্রনাথ তর্করত্ন। বারাকপুরে তাঁহার বাড়ী ছিল। ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরজগতে গিয়াছেন। এই চক্রেও কল্ডার সাহেব ও সমিতির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৬শে জুন তারিখে চক্রে বসিয়া মিউজেন্স সাহেব প্রথমে নিত্যকে মেস্‌মেরাইজ্ করিতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ মেস্‌মেরাইজ করিবার পর নিত্য ভয় পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল; তারপর বলিল—ঐ আর্শির মধ্যে দুইজন যোগী দাঁড়াইয়া আছেন। আরও কিছুক্ষণ মেস্‌মেরাইজ করিবার পর সে টেবিলের উপর অচেতন হইয়া পড়িল। তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শয়ন করান হইল। একটু পরে তাহার ডান হাত অল্প অল্প নড়িতে লাগিল। তখন মিডিয়মের হাতে পেন্সিল দিয়া, যে আত্মা ভর করিয়াছিলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল,—আপনি কে? ইহার উত্তরে নিম্নের অদ্ভুত ঘটনাটী মিডিয়মের হাত দিয়া লেখা হইল:—

আমার নাম গঙ্গাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। পশ্চিম অঞ্চলে আমাদের বাড়ী ছিল। ২২ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। তখন আমার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। আমার পিতামাতা কাশীধামে বাস করিতেন। আমার বয়স যখন ১৮ বৎসর তখন প্রথমে বাবা ও তিনসপ্তাহ পরে মা দেহত্যাগ করেন।

তখন ঐ পৃথিবীতে আমার আপনার বলিতে আর কেহই ছিলেন না। পিতামাতার অভাবে আমি জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। আমার তখন আর বাঁচিবার একবিন্দুও ইচ্ছা ছিল না,—আমি বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়া বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

এই সময় এক সাধুর দর্শন পাইলাম। প্রথমে তিনি আমাকে বিদায় করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িলাম না। তখন তিনি সে স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিলেন,—আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। এইভাবে কিছুকাল কাটিয়া গেল। পরে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বার বৎসর কাছে রাখিয়া তাঁহার সকল বিদ্যা শিখাইলেন। শেষে আমাকে সেই স্থানে থাকিয়া ভজনসাধন করিতে বলিয়া, সেই যে তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন আর তাঁহার কোন খোঁজখবর পাইলাম না। সেখানে আরও কয়েক বৎসর থাকিয়া শেষে আমি বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলাম এবং কিছুকাল পরে দেহত্যাগ করিলাম।

পরজগতে আসিয়া ক্রমে অনেক পবিত্র আত্মার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে এক স্থানে এক পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দর্শন পাইলাম। তিনি বলিলেন যে, ইহাই পুণ্যাত্মাদিগের স্থান। ইহার নাম ষষ্ঠস্বর্গ। এখানে থাকিয়া সাধনভজন কর। তাঁহার আদেশ মত আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। সেখানে যে সমস্ত মনোহর বস্তু নয়নগোচর হইল, তাহা দেখিয়া আমি আত্মহারা হইলাম এবং মন প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। সে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার নাই।

প্রথম প্রথম নিত্যের উপর নিম্নস্তরের প্রেতাত্মার ভর হইত বলিয়া সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িত। ক্রমে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের আত্মার

ভর হওয়ায়, তাহার কষ্ট কমিতে লাগিল। তখন সে সুস্থির ও শান্তভাবে কথা বলিতে ও লিখিতে পারিত। ক্রমে যতই সে অধিক শক্তি অর্জ্জন করিতে লাগিল, ততই তাহার উপর উচ্চস্তরের মুক্তাত্মাদিগের ভর হইতে লাগিল। নিত্য সেরূপ শিক্ষিত বা বুদ্ধিমান ছিল না। সুতরাং আবিষ্ট হইয়া সে যে সকল উপদেশ দিত, সে সব যে তাহার নিজের কথা নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইত।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

নিত্যনিরঞ্জনের এই ক্রমোন্নতির একমাত্র কারণ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা। প্রথমে যখন তাহার উপর ভোলানাথের আত্মার ভর হইত, তখন ভোলানাথ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। কাজেই তাঁহার ভর হওয়ায়, নিত্যনিরঞ্জনের কষ্টের একশেষ হইত। চক্রে আসিবার পর হইতে ভগবানের প্রার্থনা সঙ্গীত শুনিয়া ও উচ্চস্তরের পবিত্র আত্মাদিগের সংসর্গে আসিয়া, ক্রমে ভোলানাথের উন্নতি হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশ শান্তি ও আনন্দ পাইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় ভোলানাথের আত্মার ভর হইলে মিডিয়মের পূর্ব্বের ন্যায় আর ক্লেশ হইত না। পরন্তু এইরূপ বার বার ভর করিয়া নিত্যের উপর তাঁহার বাৎসল্যভাবের উদয় হইল। তখন ভোলানাথের আত্মার প্রধান কার্য্য হইল দুষ্ট প্রেতাত্মাদিগের কবল হইতে নিত্যকে রক্ষা করা।

আপনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরোপকারের প্রবল ইচ্ছা ভোলানাথের আত্মাতে প্রকাশ পাইল। সেই সময় নিত্যনিরঞ্জন কয়েকদিন ধরিয়া পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিল। নানারকম ঔষধ ব্যবহার করিয়াও

তাহার কোন উপকার হইল না। তখন ভোলানাথের আত্মা একদিন ঝাড়িয়া দেওয়ায় নিত্য আরোগ্যলাভ করিল। রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহার 'শোকবিজয়' গ্রন্থে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া শেষে লিখিয়াছেন,—"সেই সময় আমরা ৭।৮ জন সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই অবিকল বর্ণনা করিলাম।" ভোলানাথের আত্মার মেস্‌মেরাইজ করিয়া রোগ মুক্ত করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবু আরও কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ভোলানাথ পরোক্ষে থাকিয়া নিজে ঝাড়িতেন, কিংবা মিডিয়মের উপর ভর করিয়া তাহার দ্বারা ঝাড়াইতেন, তাহা রাজকৃষ্ণবাবু খোলসা করিয়া বলেন নাই। মহাত্মা শিশিরকুমার একবার কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। তখন উচ্চস্তরের এক পবিত্র মুক্তাত্মা মতিলালের উপর ভর করিয়া ও তাঁহার দ্বারা মেস্‌মেরাইজ করাইয়া, শিশিরবাবুকে ব্যাধিমুক্ত করেন। এই ঘটনা তিনি হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে লিখিয়াছেন এবং এই গ্রন্থেও উহা আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

'শোকবিজয়' হইতে আর একটী ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। কলিকাতা রামবাগানের ব্যারিষ্টার সি দত্তের বাড়ীতে ১০।৮।৮১ তারিখে চক্র করিয়া বসা হয়। এই চক্রে নিত্যও উপস্থিত ছিল। একটা পাগ্‌লীর প্রেতাত্মা আসিয়া নিত্যর উপর ভর করে এবং তাহাকে নানাপ্রকার কষ্ট দিতে থাকে। পর দিবস রাজকৃষ্ণবাবুর বাড়ীর চক্রেও নিম্নস্তরের এক প্রেতাত্মা আসিয়া ঐরূপ গোলযোগ করে। ভোলানাথের আত্মা এই দুই দিনই ঐ প্রেতাত্মাদের তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ভোলানাথের আত্মার এত উন্নতি হইয়াছিল এবং পরোপকারের ইচ্ছা ও চেষ্টা তাঁহার এত প্রবল হইয়াছিল যে, রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহার

আত্মার উদ্দেশে 'শোকবিজয়' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—"পরমপূজনীয় ৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের মুক্তাত্মা মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু। মহাশয়, আপনার নিকট বিস্তর ঋণে আবদ্ধ আছি। ঐহিক সম্বন্ধে আপনার প্রগাঢ় যত্নে ও নিষ্কাম চেষ্টায়, উচ্চশ্রেণীর মুক্তাত্মাগণ আমাদের আধ্যাত্মিক-চক্রে তাঁহাদের জ্যোতি বিস্তার এবং 'মেস্‌মেরিক পাশ' দ্বারা আমার পরিবারকে জীবনশঙ্কট রোগের বিষম যন্ত্রণা হইতে কয়েকবার মুক্ত করিয়াছেন। পারত্রিক সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রদত্ত জ্ঞানশিক্ষা দ্বারা আমরা মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধে অনেক গুপ্তকথা অবগত হইয়াছি। আমরা জানিয়াছি, পরের দুঃখ বিমোচন করা আপনার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যখন কোন পতিপ্রাণা রমণী বা পুত্রশোক-কাতরা জননী এই পুস্তক পাঠ করিয়া আপন শোক সম্বরণ করিবেন, তদ্দৃষ্টে আপনার মন অবশ্য আনন্দে পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। এইজন্য আপনার অনুমতি লইয়া আমার এ 'শোকবিজয়' পুস্তকখানি আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।"

সুবিখ্যাত মিডিয়ম ডবলিউ এগ্‌লিণ্টন্

সে সময় ইউরোপ ও আমেরিকায় যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মিডিয়ম ছিলেন, এগ্‌লিণ্টন্ তন্মধ্যে অন্যতম। কলিকাতায় পারলৌকিক-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু কতিপয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে এগ্‌লিণ্টন্ কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিয়া তিনি প্রকাশ্য স্থানে কয়েকবার তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু ইহার বিস্তারিত বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন

তিনি কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি বিবরণ 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'সাইকিক্ নোটস্' নামক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিনি যে কয়েক রকম অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতেন, তন্মধ্যে —শ্লেটে লেখা, সাদাকার্ডে লেখা, আত্মার মূর্ত্তিধারণ, মিডিয়মের শূন্যে ভাসিয়া বেড়ানও কঠিন দ্রব্য ভেদ করিয়া যাতায়াত, আত্মা কর্ত্তৃক লণ্ডন হইতে কলিকাতায় মুহূর্ত্ত মধ্যে পত্র আনয়ন,—এই কয়েকটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সম্বন্ধে কতিপয় ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হইল।

অলৌকিক ঘটনাবলী

কর্ণেল গর্ডনের গৃহে

এগ্‌লিণ্টন্ সাহেবের কলিকাতায় পৌছিবার পরের রবিবারে, অর্থাৎ ২০শে নভেম্বর তারিখে, "সাইকিক্ নোটস্" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক কর্ণেল গর্ডনের হাবড়ার বাড়ীতে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে লইয়া চক্রে বসা হয়। এই চক্রে সস্ত্রীক কর্ণেল গর্ডন, মিউজেল, এগ্‌লিণ্টন্ এবং আরও চারিজন পদস্থ ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতলের ড্রয়িংরুমের পার্শ্বে একটি ১৮ বর্গ ফিট ঘরে চক্রে বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হয়। এই ঘর হইতে দুইটী খালি আলমারী ও একটা ড্রেসিং টেবিল ব্যতীত আর সমস্ত জিনিষই স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই ঘরের সংলগ্ন কোন বারান্দা ছিল না। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের বসিবার জন্য একখানি টেবিলের চারিপার্শ্বে আটখানি চেয়ার এবং ঐ

টেবিলের উপর প্রায় দশ সের ওজনের বাদ্যযন্ত্রের বড় বাক্স (musical box), ঐ ছোট বাক্স, সেতার (zither harp), ঘণ্টা, পাখা, বাতি, বাতিদান ও দেশলাই বাক্স প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্য একটী করিয়া রাখা হইয়াছিল। তৎপরে দরজা ও জানালাগুলি ভালরূপে বন্ধ করিয়া এবং আলমারী প্রভৃতি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, উপস্থিত সকলেই পরস্পরে হস্তস্পর্শ করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন। মিডিয়মের ইচ্ছামত অপরিচিত দুই ব্যক্তি দুই পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার দুইখানি হাত দৃঢ়ভাবে ধরিলেন,—একবারও ছাড়িলেন না। তারপর আলো নিভাইয়া দেওয়া হইল।

কিছুক্ষণ পরে টেবিলের উপরিস্থিত জিনিষগুলি সামান্য নড়িবার ও বড় বাদ্যযন্ত্রের বাক্সটীর ডালা খোলা ও বন্ধের শব্দ শোনা গেল। তারপর টেবিলের উপর টোকার শব্দ মৃদু হইতে ক্রমে সজোরে হইতে লাগিল। শেষে বাদ্যযন্ত্রের বাক্স দুটী আপনি স্প্রিংয়ে দম দিয়া বাজিতে লাগিল। যে অদৃশ্যশক্তি দ্বারা এই সকল কার্য্য হইতেছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদ্য বন্ধ করিতে বলিবামাত্র উহা বন্ধ হইল। কেবল যে একবার এইরূপ হইল তাহা নহে; যতবারই এবং যে মুহূর্ত্তেই উহা বাজাইতে বা বন্ধ করিতে বলা হইল, ততবারই তৎক্ষণাৎ সেইরূপ হইল। ক্রমে পাখার বাতাসের, ছোট ঘণ্টা বাজিবার ও টেবিলের উপরিস্থিত জিনিষগুলি সজোরে নড়িবার শব্দ হইতে লাগিল। বাজনার বড় বাক্সটি বাজিতে বাজিতে ক্রমে কয়েকজনের মাথার উপর যাইয়া উঠিল। কতকগুলি ছোট ছোট দ্রব্য ড্রেসিং টেবিল হইতে চলিয়া আসিল। পরলোকে বিশ্বাসী যে তিন জন এই চক্রে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল গর্ডন সাহেবের হাতে উহার একটী দ্রব্য আসিয়া পড়িল। ইহার পরে তাঁহাদিগকে

আর কিছু বলা হইল না,—তখন যত শক্তি দেখান হইতে লাগিল তাহা অপর সকলের উপর, অর্থাৎ যাঁহারা কেবল পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সেতারটি সকলের মাথার উপর ভাসিতে ভাসিতে উহাতে Home, Sweet Home গীতটি বাজিতে লাগিল, তখন এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। তারপর বোধ হইতে লাগিল, সেতারটি যেন ক্রমে দূরে যাইয়া শেষে ড্রয়িংরুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাজিতেছে। তখন উহার আওয়াজ এরূপ ক্ষীণ হইয়াছিল যে, বিশেষ মনোযোগ দিয়া না শুনিলে উহার শব্দ কাণে প্রবেশই করিতেছিল না। কিন্তু উহার শব্দ ক্রমে আবার নিকটে অর্থাৎ ড্রয়িংরুমের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াছে মনে হইল। তারপর বাজনার শব্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই একেবারে সকলের নিকটে আসিল, এবং জোরে বাজিতে বাজিতে আলমারীর উপর যাইয়া পড়িল। ড্রয়িংরুমে যাইবার দরজাটি তখন বন্ধ ছিল এবং সেই ঘরে আলোও জ্বলিতেছিল। সুতরাং ঐ দরজা যদি খোলা হইত, তাহা হইলে চক্রে বসিবার অন্ধকার ঘর হইতে ঐ ড্রয়িংরুমের আলো বেশ দেখা যাইত।

চক্রে কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ যেমন শীতল বাতাস বহিতে থাকে, সেইরূপ শীতল সমীর প্রবাহে ঘরটি পূর্ণ হইল। তখন এই সম্বন্ধে আলোচনাও চলিতেছিল, এবং সে সময় অনেকে জড়ীয় হস্তের স্পর্শও অনুভব করিয়াছিলেন। একজনের বসিবার চেয়ারখানি টানিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি পা দিয়া সজোরে চেয়ারখানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন বলিয়া উহা সরাইতে পারে নাই। তাঁহার বোধ হইয়াছিল যেন একখানি সবল হাত তাঁহার কাঁধ চাপিয়া ধরিয়াছে, এবং কিছুপরে

একখানি সরু কচি হাত তাঁহার বুকের উপর ঘুরিতেছে। বাতি জ্বালিয়া দেখা গেল বাজনার বড় বাক্সটি বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু উহাতে চাবি লাগান নাই। চাবিটি লুকাইবার জন্যই হয়ত ঐরূপ করা হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে মিডিয়ম উপরে উঠিতে লাগিলেন। যে দুইজন তাঁহার হাত ধরিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে প্রথম দাড়াইতে হইল, ক্রমে যতদূর সম্ভব হাত উচ্চ করিতে হইল, কিন্তু তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। উপরে উঠিয়া তাঁহার দেহ ভাসিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া বোধ হইল। কারণ মিডিয়মের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির কাঁধে তাঁহার পা স্পর্শ করিয়াছিল। সেই সময় মিডিয়ম অত্যন্ত জোরের সহিত নিশ্বাস ফেলিতে ছিলেন। ইহাতে মনে হইল যে, এই অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শিত করা অতিশয় কষ্টসাধ্য বলিয়া, মিডিয়মের দেহ হইতে অতিরিক্ত তেজ বাহির হইতেছে। ইহাতে তাঁহার দেহের অনিষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া তখনই আলো জ্বালিয়া উহা বন্ধ করা হইল।

তখন দরজা জানালা ও আলমারী পুনরায় ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হইল। দেখা গেল, যে আটজন চক্রে বসিয়াছিলেন তদ্ব্যতীত অপর কোন লোক ঐ ঘরে নাই। এই ঘটনার মধ্যে যে কোনরূপ তঞ্চকতা থাকিতে পারে না, তাহা কয়েকটি বিষয় দ্বারা বেশ জানা যাইতেছে। প্রথমতঃ একজন পদস্থ ভদ্রলোকের বাটীতে এই ঘটনা হইয়াছে, কাজেই মিডিয়মের পক্ষে পূর্ব্বাহ্নে কোনরূপ বন্দোবস্ত করা একেবারে অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ উপস্থিত আটজন ভদ্রলোকের মধ্যে কেবল মিডিয়মই নূতন লোক, অপর সকলেই পরস্পরের পরিচিত। তৃতীয়তঃ মিডিয়মের দুইখানি হাত—তাঁহার অপরিচিত ও পরলোক সম্বন্ধে অবিশ্বাসী দুই ব্যক্তি—বরাবর ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, একবারও ছাড়িয়া

দেন নাই। কাজেই ইহার মধ্যে কোনরূপ চাতুরী থাকিতে পারে না।

মিউজেন্স সাহেবের গৃহে

২৯শে নভেম্বর মঙ্গলবার মিউজেন্স সাহেবের বাড়ীতে মিডিয়মকে লইয়া চক্রে বসা হইয়াছিল। সেখানে দশ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে এগ্‌লিণ্টন্, মিউজেন্স ও ডগেট এই তিনজন পরলোকে বিশ্বাসী, চীথাম সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধিৎসু, এবং অপর পাঁচজন দর্শকমাত্র।

কিছুক্ষণ চক্রে বসিবার পর মিডিয়ম কয়েকখানি কার্ড বাহির করিলেন এবং উহাতে যে কিছু লেখা নাই তাহা পরীক্ষার জন্য কার্ডগুলি সকলের হাতে দিলেন। পরীক্ষার পর, মিডিয়ম উহা হইতে একখানি কার্ড এক টুকরা পেন্সিল সহ টেবিলের উপরিস্থিত একটি বাজনার বাক্সে রাখিলেন। তৎপরে আলো নিভাইয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আলো জ্বালা হইল, এবং সকলে আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কার্ডে কিছুই লেখা নাই। তখন মিডিয়ম কার্ডখানির একটী কোণ ছিঁড়িয়া, ঐ ছিন্নাংশ—পরে মিলাইয়া দেখিবার জন্য—ডগেট সাহেবের হাতে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোতে সেই কোণকাটা কার্ডখানি পেন্সিলের এক টুকরা সীস সহ একখানি বহির মধ্যে রাখিলেন।

তৎপরে ঐ পুস্তকখানি ক্রমে চারিজনের হাতে দেওয়া হইল। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কার্ডে কিছু লেখা নাই। শেষে অপর একব্যক্তির হাতে পুস্তকখানি দেওয়ামাত্র উহার মধ্যে সামান্য টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া মিডিয়ম আর একখানি সাদা কার্ড লইলেন এবং উহা পেন্সিলের এক টুকরা সীস সহ আর একখানি বহির মধ্যে রাখিয়া, সেই বহিখানি অপর একব্যক্তির হাতে দিলেন। এই দুই ব্যক্তি যে হাত দিয়া পুস্তক ধরিয়া ছিলেন, মিডিয়ম তাঁহাদের সেই দুইখানি হাতের উপর নিজের দুইখানি হাত রাখিলেন। একটু পরে প্রথম পুস্তকখানি খুলিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যস্থিত কোণকাটা কার্ডখানিতে পরিষ্কার ভাবে নিম্নলিখিত কথাগুলি ইংরাজিতে লেখা আছে—

"অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলে চিত্তে শান্তি ও শোকে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারা যায় এবং ভগবদিচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়। পরলোকে অবস্থান করা অবধি আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে মর্ত্ত্যলোকে নব নব সত্যানুসন্ধানে পরাঙ্মুখ হইয়া মানুষ নিয়ত কি ভ্রমই না করিতেছে। এই সকল সত্য কল্পনা হইতেও মধুর ও বিস্ময়কর। পরলোকে সমাসীন থাকায়"—

এই ছিন্নাংশে লেখা এই স্থানেই শেষ হইয়াছে। তৎপরে অন্য পুস্তকখানি খুলিয়া দেখা গেল, তন্মধ্যস্থিত কার্ডখানিতে উহার অবশিষ্টাংশ ইংরাজিতে এইভাবে লেখা রহিয়াছে—

"—আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে এই মহিমময় সত্য আমার নিকট প্রমাণিত হইয়াছে, এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি। অতএব, হে অবিশ্বাসী বিদ্রূপপরায়ণজনগণ, আপনারা ত্বরায় এই সত্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া চিত্তে সান্ত্বনা লাভ করুন এবং অনিশ্চিত ভবিতব্যের দারুণ সন্দেহজাল হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করুন। ইতি—

আপনাদের বন্ধু—

জন উইলিয়ামস্।"

কোণকাটা কার্ডখানি যখন প্রথম পুস্তকের মধ্যে রাখা হয়, তখন হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘরে সমভাবে আলো জ্বলিতেছিল। ছেঁড়া কার্ডখানির দুই অংশ যোড়া দিলে উহা ঠিক মিলিয়া গেল। কাজেই এই ব্যাপারে যে কোনরূপ তঞ্চকতা ছিল না, তাহা উপস্থিত সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

দীননাথ মল্লিক

দীননাথ মল্লিকের গৃহে এগ্‌লিণ্টন্ সাহেবকে লইয়া কয়েকদিন চক্রে বসা হইয়াছিল। প্রথম দিন যে কয়েকটি অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বিষয়টি নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

যেখানে সকলে চক্রে বসিয়াছিলেন তাহা হইতে ১০।১২ ফিট দূরে একটি হারমোনিয়ম্ ছিল। এইটী ক্রমে তাহাদের দিকে সরিয়া আসিল এবং ২।৩ ফিট দূরে থাকিয়া আপনাআপনিই বাজিতে লাগিল। যাঁহারা ঘরে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, কোন অদৃশ্য শক্তির সাহায্য ভিন্ন এরূপ হইতে পারে না।

দ্বিতীয় দিনের ঘটনা আরও বিস্ময়জনক। যাহাতে বাহির হইতে অপর কেহ ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে, আলো নিভাইবার পূর্ব্বে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যাঁহারা ঘরে ছিলেন তাঁহারা সকলেই নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ হইয়া চক্রে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে শুনিতে পাইলেন, ঘরের মধ্যে কয়েক জন যেন কোন গুরুতর বিষয় লইয়া ধীরভাবে আলোচনা করিতেছেন। এইরূপ কোন ঘটনা হইবে,

সম্ভবতঃ এগ্‌লিণ্টন্‌ পূর্ব্বাহ্নে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। কারণ, বহুভাষী (Ventriloquist) বলিয়া পাছে তাঁহাকে কেহ সন্দেহ করে, সেইজন্য চক্রে বসিবার পূর্ব্বেই তিনি এক মুখ জল লইয়াছিলেন এবং তাঁহার দুইখানি হাত দুই ব্যক্তি ধরিয়াছিলেন। শেষে আলো জ্বালা হইলে সকলের সম্মুখে তিনি মুখ হইতে সেই জল ফেলিয়া দিলেন। পরে এই ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, এগ্‌লিণ্টন্‌ বলিলেন যে, তাঁহার পরিচালক আত্মারা ঐ ঘরে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহারাই কোন বিষয় লইয়া আপনাদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন।

এই ঘটনার পরেই সেই ঘরে একটি এদেশীয় রমণীমূর্ত্তির অবির্ভাব হইল। ঘর অন্ধকার হইলেও তাঁহার মুখখানি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। যাঁহারা চক্রে বসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। রমণীমূর্ত্তি তাঁহাদের নিকটে আসিলে তাঁহারা তাঁহাকে আপনাদের পরলোকগতা মাতা বলিয়া বেশ চিনিতে পারিলেন। এই মূর্ত্তি যখন আদরভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিলেন, তখন এক ভাইয়ের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। কারণ তাঁহার মাতার যে কোন অস্তিত্ব আছে, এবং যদি থাকে তবে এইভাবে যে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইতে পারে তাহা তিনি পূর্ব্বে কখন মনে ধারণা করিতেও পারেন নাই।

উপরের ঘটনাগুলি অন্ধকার ঘরে হইয়াছিল। কিন্তু ঘরে আলো জ্বালা হইলে, ইতিপূর্ব্বে মিউজেন্স সাহেবের বাটীতে সাদা কার্ডে অদৃশ্য হস্তে লেখা সম্বন্ধে এগ্‌লিণ্টন্‌ যে অলৌকিক ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন, দীননাথ মল্লিকের বাটীতেও তাহাই দেখাইলেন। ঘটনাটি একটু বিস্তৃত করিয়া বলিতেছি। এগ্‌লিণ্টন্‌ সাহেব একখানি সাদা কার্ডের এক কোণ ছিঁড়িলেন, এবং সেই ছিন্নাংশ এক ব্যক্তির হাতে দিয়া উহা

তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে রাখিতে বলিলেন। তৎপরে একটি লেড পেন্সিলের এক টুকরা সীস ভাঙ্গিয়া সেই সীস সহ কোণকাটা কার্ড খানি অপর একজনের হাতে দিলেন এবং উহা একখানি পুস্তকের মধ্যে রাখিতে বলিলেন। উহা রাখা হইলে, সেই পুস্তকের মধ্যে লিখিবার মত খস্‌খস্‌ শব্দ হইতে লাগিল। এই শব্দ ঘরের সকলেই শুনিতে পাইলেন। তারপর আর একখানি সাদা কার্ড এক টুকরা সীস সহ মুড়িয়া ঘরের মধ্যে একটি জানালার কাছে নিক্ষেপ করা হইল।

কিছুক্ষণ পরে, পুস্তকের মধ্য হইতে কোণকাটা কার্ডখানি বাহির করিতে বলা হইল। উহা বাহির করিয়া দেখা গেল, উপস্থিত কোন পদস্থ ব্যক্তির পরলোকগত এক বিশিষ্ট আত্মীয়ের মুক্তাত্মার কথামত লিখিত একখানি পত্রের কিয়দংশ ঐ কোণকাটা কার্ডে আছে, এবং যে কার্ডখানি জানালার নিকট নিক্ষেপ করা হয় তাহাতে উক্ত পত্রের শেষাংশটুকু রহিয়াছে।

এগ্‌লিণ্টন্‌ সাহেব আর একদিন দীননাথ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে চক্রে বসিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনের কতকগুলি মূল্যবান দলিল হারাইয়া যায়। এগ্‌লিণ্টন্‌ সাহেবের পরিচালক আত্মাদিগের মধ্যে "ডেজী" নামক একটি "রেড ইণ্ডিয়ান" বালিকার আত্মাকে আহ্বান করিয়া এই দলিলগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, সে দলিলগুলির সন্ধান বলিয়া দিল।

এই চক্রে যে সকল ঘটনা হয় তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

চক্রে উপবিষ্ট কয়েকজন ভদ্রলোকের মধ্যে একজনকে তাঁহার কোন পরলোকগত আত্মীয়ের নাম লিখিতে বলা হয়। যে নামটি লেখা হইল তাহা এগ্‌লিণ্টন্‌ সাহেবকে দেখান হয় নাই এবং পূর্ব্বেও

এগ্‌লিণ্টন্ সাহেবের ইহা জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যে কাগজের টুকুরাটুকুতে নামটি লেখা হইয়াছিল, তাহা ভাঁজ করিয়া এগ্‌লিণ্টন্ সাহেবের হাতে দেওয়া হইলে তিনি উহা তাঁহার সম্মুখস্থ প্রদীপের শিখায় পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। তৎপর এগ্‌লিণ্টন্ ঐ ছাই লইয়া তাঁহার নিজের একখানি অনাবৃত বাহুতে লেপন করিলেন। এই অনাবৃত বাহুতে পূর্ব্বে লেখার চিহ্ন মাত্র ছিল না। কিন্তু ছাই মাখাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাহুর উপর সেই ভদ্রলোকের লিখিত তাঁহার পরলোকগত আত্মীয়ের নামটি তাঁহার নিজের লিখিত অবিকল বর্ণবিন্যাস সহ ফুটিয়া উঠিল।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চক্রগৃহ হইতে আত্মিক প্রস্থান করিলে সেই অন্ধকারপূর্ণ গৃহে দুইতিন সেকেণ্ড পর্য্যন্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লিখিবার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আলো আনিয়া দেখা গেল যে, একখানি পুস্তকের কোণে একখানি কার্ড গোঁজা রহিয়াছে। এই কার্ডখানিতে অত্যন্ত পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা অক্ষরে নিম্নলিখিত সংস্কৃত কথাটি লেখা আছে এবং তাহার নীচে ইংরেজীতে "P" এইরূপ স্বাক্ষর করা আছে। সংস্কৃত কথাটি এইরূপ:—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসিতব্যম্"—ইহার মর্ম্মার্থ এই যে তপ দ্বারা মানুষের ভগবৎ জ্ঞান লাভ হয়।"

এগ্‌লিণ্টন্ সাহেবের সহযোগিতায় ও তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে পরলোক ও আত্মিক জগতের বহু বিস্ময়কর ঘটনাবলীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং সেই জগতের অনেক বিষয়ের মধুর রসাস্বাদন করা গিয়াছে। যাঁহারা এগ্‌লিণ্টন্ সাহেবের সহিত একত্রে চক্রে বসিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছেন; এগ্‌লিণ্টনের এই অতিমানবিক শক্তির মধ্যে

লণ্ডন হইতে কলিকাতায় কয়েকঘণ্টার মধ্যে পত্র প্রেরণ ও তাহার উত্তর আনয়ন সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের গৃহে

প্যারীচাঁদ মিত্র ২৯।১২।৮১ তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রে লেখেন,—আমার স্ত্রীর পরলোকগমনের পর হইতে আমি আধ্যাত্মিক-চর্চ্চা করিয়া আসিতেছি। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র অমৃতলাল আমাদের পারিবারিক-চক্রে বসিয়া পরলোকগত নিজজনদিগের আত্মার সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। এগ্‌লিণ্টন্ সাহেব এখানে নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনা দেখাইতেছেন শুনিয়া, উহা দেখিবার প্রবল ইচ্ছা তাহার মনে জাগিয়া উঠে। এই কথা শুনিয়া মিঃ এগ্‌লিণ্টন্ আমাদের সহিত স্বতন্ত্রভাবে একদিন চক্রে বসিতে রাজী হইলেন।

২৭শে ডিসেম্বর বেলা ১২টার সময় মিডিয়মকে লইয়া অমৃতলাল ও আমি চক্রে বসিয়াছিলাম। আমরা একখানি পরিষ্কার স্লেট আনিয়া মিডিয়মের হাতে দিলাম। তিনি স্লেটখানি এক টুক্‌রা পেন্সিলের সীসসহ টেবিলের নিম্নদেশে চাপিয়া ধরিলেন। আমরা তিন জন এই টেবিলের তিনদিকে বসিবার পর, অমৃতলাল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রশ্ন করিবামাত্র স্লেটের উপর ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। শব্দ থামিবামাত্র স্লেট তুলিয়া দেখা গেল, উহাতে প্রশ্নের সঠিক উত্তর লেখা হইয়াছে। এই প্রশ্নোত্তর কাগজে লিখিয়া লইয়া, স্লেটখানি পরিষ্কার করিয়া আবার টেবিলের নীচে

ধরা হইল। এই প্রকারে যে কয়েকটি উত্তর পাওয়া গিয়াছিল তাহা প্রশ্নসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অমৃত। আমি কি মিডিয়ম?

উত্তর। হাঁ।

অ। এগ্‌লিণ্টন্ সাহেব যে ভাবে আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন, আমি সেরূপ পারি না কেন?

উ। আপনি সেরূপ শক্তিধর হন নাই বলিয়া।

অ। পরলোকগত নিজজনের সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা কি প্রকৃত, না আমার নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনামাত্র?

উ। উহা প্রকৃত।

অ। আমার মাতা স্ত্রী ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের আত্মা কি এখানে উপস্থিত আছেন?

উ। হাঁ আছেন।

অ। আমার মাতা ও স্ত্রী কি একই স্তরে আছেন?

উ। না,—আপনার মাতা পঞ্চম স্তরে এবং আপনার স্ত্রী চতুর্থ স্তরে আছেন।

অ। আমার মাতা কি কোন সংবাদ দিতে পারেন?

এই প্রশ্ন করিবার পর অমৃতলালের মাতা মিডিয়মের হাত দিয়া তাঁহার স্বামীকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন।

"স্বামিন্—এই পত্রখানি এগ্‌লিণ্টন্ সাহেবের পরিচালকের সহযোগে লিখিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা আমারই বক্তব্য। এইরূপ পার্থিব প্রণালীতে আপনার সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং আমার উপস্থিতি প্রমাণ করিতে পারিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। আপনার পিতৃদেব (রামনারায়ণ) আমার সহিত

আসিয়াছেন। আমরা উভয়েই আশা করি যে আপনার দার্শনিক হৃদয়. নিয়তই সত্যের আলোকোজ্জল রাজ্যে বিচরণ করুক। আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া এই স্বার্থগন্ধহীন মহৎ কর্ম্ম করিতে থাকুন, পরলোকে নিশ্চয়ই ইহার জন্য আপনার উচ্চ পুরস্কার লাভ হইবে। আমি নিয়তই আপনার সন্নিধানে আছি। আমার ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা গ্রহণ করুন। ইতি আপনার একান্ত অনুরক্তা

"সহধর্ম্মিণী"

(পত্রখানিতে "প্রাণকৃষ্ণ" এই স্বাক্ষরটিও আছে। খড়দহনিবাসী স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস প্যারীচাঁদের শ্বশুর ছিলেন।)

মিউজেন্স সাহেবের গৃহে

জে জি মিউজেন্স ১৮৮২ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখের 'সাইকিক নোটস্' পত্রে লিখিয়াছেন,—৩০শে ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যার পর, শ্লেটে লেখা পরীক্ষার জন্য, আমার বাড়ীর একটী ছোট ঘরে এগ্লিণ্টন্ সাহেব ও আমি অপর দুইটি বন্ধুসহ একটি টেবিলের চারিপার্শ্বে চক্র করিয়া বসিয়াছিলাম। প্যারীচাঁদের বাড়ীতে যে ভাবে শ্লেট ধরা হইয়াছিল, এখানেও সেই ভাবে ধরা হইল। ক্রমে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সঠিক উত্তরও পাওয়া গেল।

তৎপরে মিডিয়ম দুই খানি পরিষ্কার শ্লেট লইলেন, এবং উহার মধ্যে এক টুক্‌রা পেন্সিল রাখিয়া শ্লেট দুইখানি যোড়া দিলেন। শেষে এই যোড়া শ্লেটের এককোণ নিজে ও অপর কোণ অপর এক

জন ধরিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। অমনি শ্লেটের মধ্যে ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতে লাগিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে লেখা শেষ হইয়াছে ইহা জানাইবার জন্য তিনটি টোকার শব্দ হইল। তৎক্ষণাৎ শ্লেট দুইখানি খুলিয়া দেখা গেল, উহার একখানিতে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনকে উদ্দেশ করিয়া ১৩ লাইন লেখা হইয়াছে। ঘরে বরাবরই উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। অদৃশ্য হস্তে প্রকৃতই শ্লেটে লেখা হয় কি না তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল; কাহাকেও বঞ্চনা করা, কি চক্ষুতে ধাঁধাঁ দেওয়া, কি ভেল্‌কি দেখান, কাহারও মতলব ছিল না। কাজেই অদৃশ্য হস্ত দ্বারাই যে শ্লেটে লেখা হইয়াছিল তাহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

বিবি চীথামের গৃহে

আর এইচ চীথাম নাম্নী জনৈক ইংরেজ মহিলা ১৬।১।৮২ তারিখের 'সাইকিক্ নোটস্'এ লিখিয়াছেন,—৪ঠা জানুয়ারী বুধবার অপরাহ্ন ৩টার সময় কয়েকটি বন্ধুবান্ধব ও মিডিয়মকে লইয়া আমি শ্লেটে লেখা পরীক্ষা করি। প্রথমে একখানি ও পরে দুইখানি শ্লেট লইয়া পরীক্ষা করা হয়। একখানি শ্লেটে ক্রমান্বয়ে পাঁচটী প্রশ্ন করা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সবগুলিরই সঠিক উত্তর পাওয়া যায়।

দুইখানি শ্লেট লইয়া পরীক্ষা করিবার সময়, যোড়া শ্লেটের এক কোণ মিডিয়ম ও অপর কোণ আমি এক হাতে যতদূর সম্ভব উপরে তুলিয়া ধরিলাম। আমাদের অপর হাতের সহিত উপস্থিত

অন্যান্য ব্যক্তিদিগের হাত সংলগ্ন ছিল। শ্লেট উপরে উঠাইয়া ধরিবামাত্র উহার মধ্যে বেশ পরিষ্কার ভাবে ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতে লাগিল। লেখা শেষ হইবামাত্র তিনটি টোক্কার শব্দ হইল। তৎক্ষণাৎ শ্লেট খুলিয়া দেখা গেল একখানিতে ক্ষুদ্র অক্ষরে ২২ লাইন লেখা হইয়াছে। উহা দেখিয়াই আমার এক বন্ধুর লেখা বলিয়া আমি চিনিতে পারিলাম, এবং উহা পড়িয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। কারণ, এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি নিউজিল্যাণ্ডের একবন্ধুকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলাম। শ্লেটের এই লেখা আমার সেই পত্রের অবিকল নকল। আমার চিঠিতে এরূপ গোপনীয় কথা ছিল, যাহা আমি ও আমার সেই বন্ধু ভিন্ন অপর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেই চিঠিতে কি লেখা ছিল তাহা আমি কাহাকেও বলি নাই, এবং যখন শ্লেটের কোণ ধরিয়াছিলাম তখনও আমার মনে সেই পত্রের কথা একবারও উদিত হয় নাই। চক্রে বসিবার স্থরু হইতেই ঘরে সমভাবে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। এই ব্যাপারে কোনরূপ তঞ্চকতা থাকা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

কর্ণেল গর্ডনের গৃহে

৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে হাবড়ায় কর্ণেল গর্ডনের বাড়ীতে ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া শ্লেটে লেখার পরীক্ষা করা হয়। এই চক্রে লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজে এক যোড়া শ্লেট আনিয়াছিলেন। ইহা সাধারণ স্কুল শ্লেট নহে এবং ইহাতে লেখা অত্যন্ত কষ্টকর। সকলের সম্মুখে

শ্লেট উত্তমরূপে পরিষ্কার করা হয়। শেষে শ্লেট দুইখানার মধ্যে পেন্সিল রাখিয়া উহার এক কোণ লর্ড বেরেসফোর্ড স্বয়ং এবং অপর কোণ যথানিয়মে মিডিয়ম ধরেন। লর্ড বেরেসফোর্ড অনেকগুলি প্রশ্ন করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার যথাযথ উত্তর পাওয়া যায়। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবামাত্র শ্লেটের মধ্যে ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতে থাকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই তিনটি টোকার দ্বারা লেখা শেষ হওয়ার সংবাদ জানান হইল এবং তৎক্ষণাৎ যোড়া শ্লেট খুলিয়া দেখা গেল ঠিক উত্তর লেখা হইয়াছে। লেখা অতি পরিষ্কার, যেন মুক্তা সাজান রহিয়াছে। অদৃশ্য হস্তে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে লেখা হয়। এইভাবে লিখিতে যে সময় লাগে, অন্য যে কোন প্রকারে সেইরূপ লিখিতে তদপেক্ষা অধিক সময় আবশ্যক হয়। লর্ড বেরেসফোর্ড এই লেখার প্রণালী দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে দেখাইবার জন্য লেখা সমেত শ্লেটখানি লইয়া যান।

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে

ইহার পর একদিন বেলা ১টার সময় কলিকাতা পারলৌকিক তত্ত্ব সমিতির সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১নং কমার্সিয়াল বিল্ডিংএ এগ্‌লিণ্টন্ সাহেবকে লইয়া শ্লেটে লেখার পরীক্ষা করেন। প্রথমে একখানি শ্লেটে পূর্ণবাবুকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হয়,—আশা করি আপনার ছেলে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক ভাল আছে। তাহার আরোগ্যলাভের জন্য যতদূর চেষ্টা করা সম্ভব তাহা আমরা করিব। আপনার স্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন।

তৎপরে যোড়া শ্লেটে লেখা হইল,—প্রিয় পূর্ণচন্দ্র, তুমি পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছ, তজ্জন্য আমরা বিশেষ সন্তোষের সহিত তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আশা করি এই সম্বন্ধে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে তুমি কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না। প্রত্যেক লোক যদি এই সম্বন্ধে চেষ্টা করে, তাহা হইলে আশাতীত ফল পাওয়া যাইতে পারে। তোমার ভ্রাতা অতুলচন্দ্রের আত্মা এখানে উপস্থিত। তিনি জড়দেহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তুমি বিশেষ যত্ন ও আন্তরিকতার সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলে, তজ্জন্য তিনি যে তোমার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, তাহাই তোমাকে জানাইবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন।—ইতি তোমার বন্ধু জোয়ী (Joey)।

পূর্ণবাবু 'সাইকিক্ নোটস্'এ উল্লিখিত ঘটনাটি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্লেটে লিখিত পত্র দুইখানি সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, পত্রে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

মুহূর্ত্ত মধ্যে কলিকাতা ও লণ্ডনে পত্র পরিচালন

মিউজেন্স সাহেব 'সাইকিক্ নোটস্' পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—বিগত ২০শে নভেম্বর তারিখে কর্ণেল গর্ডনের বাড়ীতে অলৌকিক ঘটনার পর আমি এগ্‌লিণ্টন্‌কে লইয়া কলিকাতায় আমার বাড়ীতে আসিলাম। রাত্রি তখন সাড়ে দশটা। আমি শয়ন করিতে যাইতেছিলাম, এমন

সময় এগ্‌লিণ্টন্‌ আমাকে বলিলেন,—চলুন, বারান্দায় যাইয়া একটু বসি। অলৌকিক কিছু ঘটিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

কিছুক্ষণ বসিবার পর এগ্‌লিণ্টন্‌ আবিষ্ট হইলেন। এই অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল,—আমার নাম ডেইজি (Daisy)। আমরা আপনার বিলাতের কোন বন্ধুর নিকট হইতে এখনই কোন জিনিষ আনিয়া আমাদের শক্তির পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। বলুন, আপনি কি জিনিষ চান? এই ডেইজি এগ্‌লিণ্টনের একজন প্রেতাত্মা-পরিচালক।

আমি বলিলাম,—এরূপ কোন জিনিষ আমি চাই, যাহা দেখিলেই বুঝা যায় ইহা আমার বন্ধুর নিকট হইতে আনা হইয়াছে। তাঁহার হাতের লেখা পত্র হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়।

ডেইজি তখন পাশের ঘর হইতে আমাকে একখানি বই আনিতে বলিলেন। আমি উঠিয়া পাশের ঘরে গেলাম, এবং প্রথমেই যে বইখানি হাতে পাইলাম তাহাই আনিয়া মিডিয়মের হাতে দিলাম। তিনি উহা লইয়াই পাশের একখানি চেয়ারের উপর রাখিলেন। তারপর আমার হাত দুই খানি তাঁহার হাতের মধ্যে লইয়া কিছুক্ষণ রহিলেন; মধ্যে কয়েকবার সজোরে কাঁপিয়া উঠিলেন; এবং শেষে ঐ পুস্তকের মধ্যে কি আছে আমাকে দেখিতে বলিলেন।

আমি পুস্তকখানি লইয়া মলাট খুলিলাম এবং উহার মধ্যে একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি আমার এক বন্ধু লণ্ডন হইতে লিখিয়াছেন। পত্রে তারিখ ও সময় দেওয়া আছে—২০।১১।৮১ সন্ধ্যার সময়।

এই লেখা আমার বিশেষ পরিচিত; কারণ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার পর, দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত আমার নিয়মমত পত্র

ব্যবহার চলিতেছে। বিশেষতঃ পত্রের লিখিত বিষয় তিনি ভিন্ন অপর কাহারও লেখা সম্ভবপর নহে। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—আমি পত্র লিখিতেছি, আর এগ্‌লিণ্টনের পরিচালক আত্মা আর্ণেষ্ট (Earnest) ইহা আপনার নিকট লইয়া যাইবার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছেন।

এখানে একটী ভাবিবার বিষয় আছে। লণ্ডন সহরে ১৮৮১ সালের ২০ সে নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যার সময় পত্র লেখা হইল, আর তাহা সেই দিনই রাত্রি ১১টার সময় কলিকাতা আমার হাতে আসিয়া পৌছিল। এই সময়ের ব্যবধান হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, লণ্ডনে যে সময় পত্র লেখা শেষ হইল, ঠিক তাহার পর-মুহূর্ত্তেই সেই পত্র কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল।

এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে হঠাৎ একদিন এগ্‌লিণ্টন্ আবিষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার এক আত্মিক বন্ধু তাঁহার উপর ভর করিয়া আমাকে বলিলেন যে, যদি আমি একখানা সাদা চিঠির কাগজ চিহ্নিত করিয়া মিডিয়মকে দিই, এবং তিনি যদি উহা ২।১ দিন তাঁহার পকেটে রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার দেহের বৈদ্যুতিক শক্তি (magnetism) উহাতে সঞ্চারিত হইবে। তখন তাঁহারা ঐ চিঠির কাগজখানি লণ্ডনে আমার বন্ধুর কাছে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা উহাতে লেখাইয়া চিঠিখানি তৎক্ষণাৎ আমাকে আনিয়া দিবেন।

এই কথা শুনিয়া আমি একখানি বিলাতী চিঠির কাগজে সংক্ষেপে নাম সহী করিয়া ও এক কোণে গোপনভাবে একটা চিহ্ন দিয়া, উহা এগ্‌লিণ্টন্‌কে দিলাম ও তাঁহার পকেট বহির মধ্যে রাখিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি তাহাই করিলেন।

ইহার পর কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ২৬শে নভেম্বর শনিবার

সন্ধ্যার পর কয়েকজন বন্ধুসহ বেঙ্গল ক্লাবে আহারাদি করিয়া এগ্‌লিণ্টন্‌ ও আমি রাত্রি প্রায় ১১টার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। সে দিনও তাঁহার অনুরোধক্রমে শয়ন করিবার পূর্ব্বে আমরা বারন্দায় যাইয়া বসিলাম। তিনি তখন পকেট হইতে এক খানা চিঠির কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম, ইহা আমার চিহ্নিত সেই সাদা চিঠির কাগজই বটে।

তিনি তখন উহা লইয়া একখানি বইর মধ্যে রাখিলেন, এবং টেবিলের নীচে বইখানি চাপিয়া ধরিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে বইখানি তিনি আমার হাতে দিলেন। আমি খুলিয়া দেখি চিঠির কাগজ খানি উহার মধ্যে নাই। এগ্‌লিণ্টন্‌ তখন ঐ বইখানি আমাকে ধরিয়া থাকিতে বলিলেন, এবং আমি যেন উহা কিছুতেই না ছাড়িয়া দিই এইরূপ অনুরোধ করিলেন।

একটু পরে মিডিয়ম বলিলেন,—তিনি দেখিতেছেন যে, তাঁহার পরিচালক এক আত্মিক জল স্থল অতিক্রম করিয়া লণ্ডনে পৌঁছিলেন, এবং ক্রমে আমার বন্ধুর বাড়ী গেলেন। তারপর আমার বন্ধু যে ঘরে আছেন সেই ঘরের দ্রব্যাদির বর্ণনা করিলেন। আরও বলিলেন যে, ঘরটি আত্মিক-আলোকে (spirit-light) পরিপূর্ণ; সেখানে বসিয়া আমার বন্ধু পত্র লিখিতেছেন, আর আত্মা-আর্ণেষ্ট পত্রের জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি বলিলেন যে, পত্র লইয়া আর্ণেষ্ট এইমাত্র কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

এতক্ষণ আমি পুস্তকখানা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ছিলাম। মিডিয়মের কথামত বইখানি খুলিয়া তাহার মধ্যে আমার চিহ্নিত চিঠির কাগজখানি পাইলাম। খুলিয়া দেখি কাগজখানি আমার বিশেষ পরিচিত হাতের লেখায় পরিপূর্ণ। বন্ধুবর লিখিয়াছেন,—আর্ণেষ্ট এই চিঠির কাগজ

খানি আনিয়াছেন। তাঁহারই অনুরোধে আমি আপনাকে ইহাতে পত্র লিখিলাম। তিনি এখানে আসা পর্য্যন্ত ঘরটি আত্মিক আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। পত্র শেষ করিয়া এখনই তাঁহাকে দিতেছি।

মিউজেন্স শেষে লিখিয়াছেন,—আমি আবার বলিতেছি, আমার বন্ধুবরের হাতের লেখা আমার অত্যন্ত পরিচিত। আমার নিজের লেখা দেখিলেই যেমন চিনিতে পারি, তাঁহার লেখা চিনিতেও আমার সেইরূপ কোন কষ্ট হয় না। তাঁহার হাতের লেখা এরূপ অভিনব ধরণের যে, সহজে কেহ তাহার অনুকরণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহা তিনি ও আমি ভিন্ন আর কেহই জানিতেন না। তারপর পত্রখানির মাথায় লেখা ছিল,—লণ্ডন ২৬ নভেম্বর ১৮৮১, শনিবার সন্ধ্যাবেলা; এবং যে কাগজে এই পত্র লেখা হইয়াছে, তাহা আমার চিহ্নিত সেই চিঠির কাগজখানি, যাহা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও বইর মধ্যে দেখিয়াছিলাম। সুতরাং এই ঘটনাটিও অপরটীর ন্যায় অলৌকিক ও বিস্ময়জনক। আমার দৃঢ়বিশ্বাস আত্মিক শক্তি (spirit-power) ভিন্ন একখানি চিঠির কাগজ এইরূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে ১৬ হাজার মাইল পথ লইয়া যাওয়া আসা একেবারেই অসম্ভব। কারণ পত্রখানি লিখিতে সাধারণতঃ যে সময় লাগিতে পারে, তদপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে উহা লণ্ডন হইতে আবার কলিকাতায় আমার হাতে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

বিখ্যাত যাদুকর হ্যারী কেল্লার

যে সময় মিডিয়ম এগ্‌লিণ্টন্ সাহেব কলিকাতা সহরে নানাপ্রকার অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়া পরলোকবাদীদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় হ্যারী কেল্লার নামক একজন বিখ্যাত যাদুকর এই সহরেই ভেল্‌কি দ্বারা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া সাধারণের মন আকৃষ্ট করিতেছিলেন; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে অবিশ্বাসী শিক্ষিত লোকদিগের মনে—ভৌতিক কাণ্ড গুলি যে বিশ্বাসযোগ্য নহে—এই ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়া তুলিতেছিলেন।

এই সময় হ্যারী কেল্লার 'ইণ্ডিয়ান্ ডেলিনিউস্' কাগজে এগ্‌লিণ্টন্ সাহেবের প্রদর্শিত ব্যাপার গুলি সম্পর্কে একখানি পত্র লেখেন; তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দিতেছি :—

আপনার কাগজে স্পিরিচুয়ালিষ্টদিগের সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ বাহির হইতেছে, আমি তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছি। বিশেষতঃ যে ভদ্রলোক সম্প্রতি এদেশে আসিয়া আপনাকে ভৌতিক মিডিয়ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহার প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনাগুলির বিবরণ আমার মন আরও অধিক আকৃষ্ট করিতেছে। অবশ্য এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন অথবা অবিশ্বাস আনয়ন করা আমার আদপে ইচ্ছা নহে। আমি ইহাও জানাইতেছি যে, যদি ঐরূপ কোন সিয়ান্সে যোগদান করিয়া আমাকে নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইব, এবং যাদুকরী বিদ্যায় আমি যেরূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, তদ্দ্বারা এগ্‌লিণ্টন্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রদর্শিত এই সকল অদ্ভুত ঘটনার একটা লৌকিক ব্যাখ্যা দিতে পারিব বলিয়া আমি বিশ্বাস

করি। আমি যদি কোন সিয়ান্সে আহূত হই, তাহা হইলে আমি যে উহার কোন নিয়ম বা বিধিব্যবস্থা ভঙ্গ করিব না, অথবা কোন অসৎ সুযোগ লইব না, তৎপক্ষে আমার মনুষ্যোচিত ভদ্রতাই জামিন স্বরূপ গৃহীত হইবে বলিয়া আমি ভরসা করি।

এই পত্রখানি প্রকাশ হওয়ায়, পরলোক বা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা একেবারে অবিশ্বাসী, তাঁহাদিগের মনে একটা জয়ের উল্লাস উত্থিত হইল। তাঁহারা ভাবিলেন যে, এই পত্র সম্বন্ধে অপরপক্ষ নিশ্চয় নির্ব্বাক থাকিবেন—কোন উচ্চবাক্য করিবেন না। কিন্তু হ্যারী কেল্লারের পরবর্ত্তী (২৫ শে জানুয়ারীর) পত্রখানি যখন ইণ্ডিয়ান্ ডেলিনিউজে প্রকাশিত হইল, তখন এই দলস্থ লোকদিগের অন্তরে ও বাহিরে একটা বিষম বিষাদের ছাপ পড়িয়া গেল। সেই পত্র খানির অনুবাদ নিম্নে দিতেছি।

হ্যারী কেল্লারের অভিমত

হ্যারি কেল্লার লিখিয়াছেন,—১৩ই তারিখের ডেলিনিউজে আমার পত্রখানি প্রকাশিত হইবার পর, মিঃ এগ্‌লিণ্টন্ এবং মিঃ মিউজেন্স আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন, আমি তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি। তাঁহাদিগের সৌজন্যেই আমি একটী সিয়ান্সে যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি যে একটা বদ্ধমূল অবিশ্বাসের সংস্কার লইয়া উহা দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমি এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, গত মঙ্গলবার (২১শে জানুয়ারী) সন্ধ্যার সময় যে অলৌকিক ব্যাপার

দেখিয়াছি, তাহা কি প্রকারে সংঘটিত হইল, তাহার লৌকিক ব্যাখ্যা করিতে আমি একেবারেই অসমর্থ। সেই দিনের ব্যাপার সংক্ষেপে বলিতেছি।

একটী উজ্জ্বল আলোকময় কক্ষে মিঃ এগ্‌লিণ্টন্, মিঃ মিউজেন্স ও আমি একখানি কাষ্ঠের সাধারণ টেবিল ঘিরিয়া বসিলাম। কয়েক মিনিট পরে টেবিলখানি অতিশয় জোরের সহিত এদিকে ওদিকে চলাচল করিতে লাগিল। সেই সময় ঠিক যেন কেহ টেবিলের নীচে মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিতেছে এইরূপ শব্দ শুনিতে লাগিলাম। টেবিলের এইরূপ গতিবিধির কারণ বাহির করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

তখন এগ্‌লিণ্টন্ দুইখানি শ্লেট বাহির করিলেন। আমি শ্লেট দুই খানি মাজিয়া ঘসিয়া তোয়ালে দিয়া মুছিয়া দিলাম। তারপর পেন্সিলের টুক্‌রা পূর্ণ একটী বাক্স এগ্‌লিণ্টন্ সাহেব আমার হাতে দিলেন। আমি উহা হইতে একটী পেন্সিলের টুক্‌রা বাছিয়া লইলাম, এবং এগ্‌লিণ্টনের কথামত একখানি শ্লেটের উপর উহা রাখিয়া অপর শ্লেটখানি দিয়া ঢাকিয়া দিলাম। তখন ঐ যোড়া শ্লেট দুইখানির একটি কোণ আমি চাপিয়া ধরিলাম, এবং অপর কোণ এগ্‌লিণ্টন্ ঐ প্রকারে ধরিলেন। আমাদের অপর হাত দুই খানি মিঃ মিউজেন্স তাঁহার দুই হাত দিয়া ধরিয়া রহিলেন।

এইরূপে যোড়া শ্লেট ধরিয়া টেবিলের নীচে নামাইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে রাখিলাম। ঘরটি তখন অবশ্য উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ ছিল। কাজেই কোনরূপ ভেল্‌কি দেখাইবার কিম্বা তঞ্চকতা করিবার সুবিধা ছিল না। ঠিক সেই সময়, শ্লেটের উপর লিখিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ ঘস্ ঘস্ শব্দ আমার কাণে গেল।

ইহার প্রায় ১৫ মিনিট পরে শ্লেটের উপর তিনটী টোকার শব্দ হইল। আমি তখন শ্লেট দুইখানি খুলিয়া ফেলিলাম, এবং দেখিলাম শ্লেটে নিম্নলিখিত কথা গুলি লেখা আছে :—

আমার নাম গিয়ারী। আমার কথা কি আপনার স্মরণ নাই? সেণ্ট জর্জ্জ হোটেলে বসিয়া পরলোক সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতাম। এখন এই সম্বন্ধে আরও ভাল রূপে জানিতেছি।

উপরের লেখা পড়িয়া আমি বলিলাম, গিয়ারী নামক কোন ব্যক্তিকে আমি জানি না। তারপর আমরা টেবিলের উপর হাত রাখিয়া বসিলাম। তখন এগ্‌লিণ্টন্‌ এ বি সি অক্ষরগুলি পর পর উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে জি অক্ষব উচ্চারিত হইবামাত্র টেবিলখানি ভীষণভাবে নড়িয়া উঠিল। এই প্রকারে ক্রমে আমরা জি ই এ আর ওয়াই (G E A R Y) এই কয়েকটি অক্ষর পাইলাম, এবং ইহা সংযুক্ত করিয়া গিয়ারী নামটি হইল। ইহাতে বুঝা গেল গিয়ারীর আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে।

এই সময় এগ্‌লিণ্টন্‌ একখানি সাদা কাগজের উপর পেন্সিলটি ধরিবা মাত্র তাঁহার হাত এরূপ বেগে কাঁপিতে লাগিল যে, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তারপর কাগজে অস্পষ্টভাবে লেখা হইল—

আমি 'ল্যাণ্টার্ণ' কাগজের আলফ্রেড গিয়ারী। আপনি আমাকে ও সেণ্ট লেজারকে অবশ্য জানেন।

এই লেখা পাঠ করিয়া হঠাৎ আমার স্মরণ হইল যে, চারি বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনের সেণ্ট জর্জ্জ হোটেলে যখন আমি বাস করিতেছিলাম, সেই সময় মিঃ গিয়ারী ও মিঃ সেণ্ট লেজারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। মিঃ গিয়ারী 'কেপ ল্যাণ্টার্ণ'

কাগজের সম্পাদক ছিলেন। আমার মনে হয় তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি মারা গিয়াছেন। আর মিষ্টার সেণ্ট লেজার ছিলেন 'কেপ টাইমস্' কাগজের সম্পাদক, এবং সম্ভবতঃ এখনও তিনি সেই কার্য্য করিতেছেন।

এই সম্বন্ধে আর বিস্তারিত না লিখিয়া এইমাত্র বলিতেছি যে, ইহার পরে শ্লেটে আরও কতকগুলি সংবাদ লেখা হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রত্যেক বারই শ্লেটখানি পুনরায় ব্যবহারের পূর্ব্বে, আমি উহা ভাল করিয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলাম।

উল্লিখিত অলৌকিক ঘটনাগুলি সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি যাহা বলিলাম তাহা সকলের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হইবে বলিয়া আমি আশা করি না। ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে কেহ যদি আমার নিকটে এইরূপ অবস্থায় এই সকল ঘটনা বর্ণনা করিতেন, তাহা আমিও তখন আদপে বিশ্বাস করিতাম না। অবশ্য এই সকল যে ভৌতিক কাণ্ড তাহা আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি আবার বলিতেছি, শ্লেটের উপর লেখা যে কোন বুদ্ধি শক্তির কার্য্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা কি প্রকারে কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইল তাহা বুঝাইয়া বলা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তবে আমার বিচারশক্তি দ্বারা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, ইহার মধ্যে কোনরূপ জুয়াচুরি বা ভেল্‌কি আদপেই নাই।

ইহার পর হ্যারী কেল্লারের ৩০শে জানুয়ারীর একখানি পত্র 'ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ' পত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি লেখেন,—কলিকাতায় পরলোকবাদীদিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা জানিবার জন্য অনেকে উৎসুক আছেন জানিয়া, গত রবিবার রাত্রে তাঁহাদিগের চক্রে যোগদান

কারিয়া যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি তাহার বিবরণ নিম্নে জানাইতেছি।

রবিবার সন্ধ্যার পর ১নং কমার্সিয়াল বিল্ডিংস্‌এর একটি বড় ঘরে মিঃ মিউজেন্স, লর্ড উইলিয়ম বেরেস্‌ফোর্ড, বিবি গর্ডন, মিঃ নিকোলাস্, তাঁহার স্ত্রী, অপর একটি ভদ্রলোক, মিঃ এগ্‌লিণ্টন্ ও আমি মিলিত হইয়াছিলাম। ঘরটীতে অতি সামান্য আস্‌বাবাদি ছিল। আমি নিজে ঘরটি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দরজাগুলি ভিতর হইতে বন্ধ করিলাম। তারপর একখানি সাধারণ কাষ্ঠের টেবিলের চারি পার্শ্বে আমরা আটজন পরস্পর হস্ত স্পর্শ করিয়া চক্রাকারে বসিলাম। টেবিলের উপর দুইটি বাজনার বাক্স, একটি সেতার ও কতকগুলি সাদা কাগজ রাখা হইল। আমি এগ্‌লিণ্টন্ সাহেবের এক পাশে তাঁহার হাত স্পর্শ করিয়া বসিবার পর, আলো নিভান হইল। একটু পরেই বোধ হইল, এগ্‌লিণ্টনের পা আমার গা ঘেঁসিয়া উপরে উঠিতেছে। আমি তাঁহার হাত অত্যন্ত শক্ত করিয়া ধরিয়াছিলাম। কাজেই একটু পরে আমার হাতে টান্ পড়িবামাত্র আমি প্রথমে চেয়ারের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু শেষে আমাকে টেবিলের উপর উঠিতে হইল। তবুও আমার হাতে টান্ পড়িতে লাগিল, কিন্তু আমি তাঁহার হাত ছাড়িলাম না। শেষে আমি টেবিল ছাড়াইয়া তাঁহার সহিত কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠিলাম। ঠিক এই সময়, যিনি আমার অপর হাত ধরিয়াছিলেন তিনি উহা ছাড়িয়া দিলেন। তাহার ফলে এগ্‌লিণ্টন্ সাহেব ধপাৎ করিয়া টেবিলের উপর পড়িয়া গেলেন এবং আমি নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া আমার চেয়ারে গড়াইয়া পড়িলাম।

আবার আমরা হাত ধরাধরি করিয়া বসিলাম। আমি, এবং একটু

পরে অপর কয়েকজন, বাদুড়ের ডানার ন্যায় ঠাণ্ডা ও নরম হস্তের স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলাম। হাতের আঙ্গুলের স্পর্শ পরিষ্কার ভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। ইহার পর টেবিলের উপর ও চারি ধারে সবুজবর্ণের ক্ষীণ আলোক দেখা গেল, কিন্তু আবার তখনই উহা অদৃশ্য হইল। তারপর বাজনার বাক্স গুলিতে দম দিবার মত শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন আমাদের মধ্যে কাহারও আদেশ মত উহা—কখনও জোরে কখনও বা আস্তে—বাজিতে লাগিল। আমি প্রথমে তিনটী এবং শেষে একটি মাত্র পর্দ্দা বাজাইতে বলিলাম। উহা তৎক্ষণাৎ সেইভাবে বাজিতে লাগিল। তৎপরে বাজনার বাক্সগুলি উপরে উঠিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে বড় বাক্সটি ধীরে ধীরে নামিয়া তিনবার আমার মস্তক স্পর্শ করিল। সেই সময় এক ব্যক্তি ঐ বাক্সটিকে লর্ড বেরেস্‌ফোর্ডের শরীর স্পর্শ করিতে ইঙ্গিত করায়, উহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক তিনবার আস্তে আস্তে স্পর্শ করিল।

একটু পরে সেতারটি আমার কপাল ঘেসিয়া চলিয়া গেল। তৎপরে জানালার খড়খড়ির একটি পাখির মধ্য দিয়া চাঁদের মৃদু আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে দেখিলাম। আমি তখনই চেয়ারে ঠেস্ দিয়া সেই আলোররশ্মির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। দেখিতে পাইলাম সেতারটি আলোররশ্মি ভেদ করিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি সেতারটি যে আপনা আপনি শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা আমি পরিষ্কার ভাবে দেখিয়াছিলাম। তখন একজন দর্শক কর্ত্তৃক Home, Sweet Home গীতটি বাজাইতে অনুরোধ করিবামাত্র উহা বাজিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ আমার চেয়ারখানি কেহ জোরের সহিত ঝাঁকি দিয়া টানিয়া

পিবল্‌স্‌

[পৃঃ—১৭০

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন
১০ই জানুয়ারী ১৯০৮ সাল

[পৃঃ—১৭১

লইল। আলো জ্বালা হইলে দেখিলাম চেয়ারখানি টেবিলের উপর রহিয়াছে।

উল্লিখিত অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান করিয়া শেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখান হইল, তাহার মধ্যে কোনরূপ ভেল্‌কির লেশমাত্র নাই, কিম্বা ঘরের মধ্যে এরূপ কোন কলকৌশল নাই যদ্দ্বারা এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে। ম্যাস্কেলীন প্রভৃতি বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিকেরা একপ্রকার কৌশলের দ্বারা কোন দ্রব্য উপরে উঠাইবার ও শূন্যে ভাসাইবার ভেল্‌কি দেখাইয়া থাকেন। এই ঘরে কৌশলের দ্বারা সেরূপ কোন ভেল্‌কি কিছুতেই দেখান যাইতে পারে না।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ ডাঃ পিবলস্

আমেরিকার ডাঃ জে এম পিবলস্ এম-এ এম-ডি পি-এইচ-ডি একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। পারলৌকিক বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি পাঁচবার সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই সকল পরিভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকের নাম দিয়াছেন—Five Journeys Around the World অর্থাৎ পাঁচবার ভূপর্য্যটন। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

এই পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন যে, এই পাঁচবারই তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা মাত্র দুইবার তাঁহার কলিকাতায় আসিবার সংবাদ পাইয়াছি। তিনি প্রথমবার আসেন ১৮৭৩ সালে। তখন প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি মিউজেন্স সাহেবের অফিস-বাটীতে প্রতি রবিবারে পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও চক্রে বসিতেন।

সেই বার কলিকাতায় আসিয়া ডাঃ পিবলস্ কি করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে, বিশেষ কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। কেবল এইটুকু বলিয়াছেন যে, এখানে আসিয়া কয়েকজন পরলোকবাদীর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্পিরিচুয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—কলিকাতায় যাইয়া সর্ব্বাগ্রে কেশবচন্দ্র সেনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র আমেরিকায় আসিয়াছিলেন। সেই বার তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সেই সময় "মিডিয়ম এণ্ড ডেব্রেক' নামক পারলৌকিকতত্ত্ব বিষয়ক সংবাদপত্রের সম্পাদক মিঃ বার্ণস্ এবং সম্ভবতঃ আরও কয়েকজন পরলোকবাদীর সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পারলৌকিক-তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা আমাদের কুসংস্কার দূরীভূত হইবে এই বিশ্বাসে কেশবচন্দ্র সেন এই সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে পছন্দ করিতেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—তাঁহার সহিত পূর্ব্ব হইতে আমার পত্রব্যবহার চলিতেছিল। এইবার কলিকাতায় যাইয়া তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি একজন সুবিখ্যাত পরলোক-বাদী এবং নিজে ভাল মিডিয়ম ছিলেন। প্রথমে আবিষ্ট অবস্থায় তিনি লিখিতেন, ক্রমে সূক্ষ্মদর্শনের ক্ষমতাও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শেষে

তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রীর উপস্থিতি বেশ অনুভব করিতেন, এবং তাঁহার মনে হইত তাঁহার স্ত্রী ঠিক যেন সশরীরে তাঁহার নিকট রহিয়াছেন।

ডাঃ পিবলস্ লিখিয়াছেন,—একদিন প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছি, এমন সময় তাঁহার এক বন্ধু সেখানে আসিলেন। তাঁহার নাম শিবচন্দ্র দেব। তিনিও একজন পরলোকবাদী। জানিলাম, ডেভিস্, টাটল্স্, সার্জ্জেণ্ট, ডেল্টন্, জজ এডমণ্ড প্রভৃতি আমেরিকার সুবিখ্যাত আধ্যাত্মবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাদিও তিনি পাঠ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালাভাষায় পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত গ্রন্থাদি হইতে অনেক বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তক একখানি তিনি আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। শেষে কথাপ্রসঙ্গে আমার "Seers of the Ages" নামক নূতন পুস্তকের কথা উঠিলে তিনি বলিলেন যে, ঐ পুস্তক তিনি পাঠ করিয়াছেন এবং তাহা হইতেও স্থান বিশেষ অনুবাদ করিয়া তাঁহার পুস্তকে ছাপিয়াছেন।

অনুসন্ধান কবিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শিবচন্দ্র দেবের বাড়ী কোন্নগরে ছিল। তিনি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্রের বৈবাহিক, তাঁহার তৃতীয়া কন্যার সহিত প্যারীচাঁদের মধ্যম পুত্রের বিবাহ হয়। শিবচন্দ্রের মধ্যমা কন্যার হঠাৎ মৃত্যু হইলে তাঁহার আত্মা প্যারীচাঁদের নিকট আসিয়া বলেন,—আপনি এখনি কোন্নগরে চলুন, আমার মাতা শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। প্যারীচাঁদ অনতিবিলম্বে কোন্নগরে যান এবং শিবচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া চক্রে বসেন। শিবচন্দ্রের স্ত্রী মিডিয়ম হইয়া আবিষ্ট অবস্থায় লিখিলেন,—মা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। আমিও অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এখন বেশ শান্তিতে আছি।

এইরূপ আরও অনেক কথা লেখার পর শিবচন্দ্রের স্ত্রীর আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তিনি কন্যার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। প্যারীচাঁদ তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইলেন,—আপনার কন্যা এই জগতে অনেক কষ্ট পাইতেছিল। এখন সে বেশ সুখশান্তিতে আছে। কাজেই তাহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে তাহাকে দুঃখ দেওয়া হইবে। সেই দিন হইতে দেব-গৃহিণীর মেয়ের শোক অনেক হাল্কা হইয়া গিয়াছিল।

ডাঃ পিবলস্ তাঁহার পাঁচবার 'ভূপর্য্যটন' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতায় অবস্থানকালে মহেন্দ্রনাথ পাল ও রমানাথ দত্ত নামক দুইজন ভদ্রবংশীয় বাঙ্গালী যুবক সর্ব্বদা তাঁহার কাছে আসিতেন, এবং আমেরিকার পারলৌকিক ঘটনাবলী, পারিবারিক চক্রে বসিবার নিয়মাবলী, পারলৌকিকতত্ত্ব এবং অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন।

ইহার ১৪ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯০৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে, ডাঃ পিবলস্ শেষবার কলিকাতায় আসেন। তাঁহার এখানে আসিবার দশমাস পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৯০৬ সালের মার্চ্চমাস হইতে, মহাত্মা শিশিরকুমার তাঁহার "হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন" নামক পারলৌকিকতত্ত্ব বিষয়ক মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম হইতে ইহা ডাঃ পিবলস্কে পাঠান হইত। ইহা পাঠ করিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং আপনার অভিমত জানাইয়া শিশিরবাবুকে একখানি পত্র লেখেন। তদবধি তাঁহাদের মধ্যে পত্রব্যবহার চলিতেছিল।

শেষবার কলিকাতায় আসিবার চারিমাস পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৯০৬ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে, তিনি মহাত্মা শিশিরকুমারকে

যে সুন্দর পত্রখানি লেখেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

প্রিয় ভ্রাতঃ! আপনার প্রেরিত গত মাসের ম্যাগাজিন পাইয়াছি। এ পর্য্যন্ত যে কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্ব বিষয়েই উত্তম। আমি ইহা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহার বিষয়গুলি যেমন সুখপাঠ্য, তেমনই শিক্ষাপ্রদ ও মূল্যবান। সম্প্রতি আমাদের একটি সভায় আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ প্রবন্ধাকারে আপনার ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম। এই শরৎকালে আপনাদের দেশে পুনরায় যাইবার আশা এখনও আমি পরিত্যাগ করি নাই। আমার চিত্ত ও আত্মা সেই আর্য্যভূমি, সেই বেদের ভূমি, সেই অবিনশ্বর ভাবি নিত্যজীবনের অস্তিত্ব শিক্ষাবিষয়ক মহামহিমান্বিত কাব্যসমূহের ভূমিতে গমন করিতে সদাসর্ব্বদা প্রয়াসী। এখন যেরূপ ভাবগতিক দেখা যাইতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে আপনাদের ভারতবর্ষে পৌছিব।—জে এম্. পিবলস্।

ডাঃ পিবলস্ কলিকাতায় আসিয়া মহাত্মা শিশিরকুমারের প্রযত্নে মহারাজবাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার ঠাকুর ক্যাসেল (Tagore Castle) নামক প্রাসাদে দুইমাসকাল অবস্থান করেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মহারাজবাহাদুরের প্রাসাদের সুবিস্তৃত হলঘরে একটি সভা আহূত হয়। এই সভায় তিনশতেরও অধিক সুশিক্ষিত হিন্দু এবং কয়েকজন ইংরেজ ও পার্শির সম্মুখে ডাঃ পিবলস্ পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সে সময়

মহারাজবাহাদুর যতীন্দ্রমোহন অসুস্থ থাকায় তাঁহার সুযোগ্যপুত্র মহারাজকুমার স্যর প্রদ্যোৎকুমার পিতার প্রতিনিধি স্বরূপ অল্প কথায় একটি সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট ডাঃ পিবলসের পরিচয় প্রদান করেন। হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের একটী প্রবন্ধে ডাঃ পিবলস্ লিখিয়াছেন,—আমি আমার জীবনের সুদীর্ঘ ৭০ বৎসর সাধারণের হিতকর কার্য্যে কাটাইয়াছি। ইহার মধ্যে এরূপ সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ শ্রোতৃবর্গের নিকট আমি পূর্ব্বে কখনও বক্তৃতা প্রদান করি নাই।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—দুইমাসকাল আমি মহারাজবাহাদুরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই সময় তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে পারলৌকিক বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হইত। তাহাতে জানিয়াছিলাম যে, তিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ কেবল যে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নহে, সমস্তগুলিই বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন এবং অনেক অলৌকিক ঘটনাও স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন।

মহাত্মা শিশিরকুমারের প্রচেষ্টায় কলিকাতা সাইকিক্যাল সোসাইটি নামক যে সমিতি গঠিত হয়, তাহার প্রথম অধিবেশনের কার্য্য মহারাজবাহাদুরের প্রাসাদস্থ সুবৃহৎ হল-গৃহে ১৯০৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটীকার সময় ডাঃ পিবলসের সভাপতিত্বে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমিতির নাম হইল—"কলিকাতা সাইকিক্যাল্ সোসাইটি", এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এই সোসাইটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। যথা—

পৃষ্ঠপোষক—মহারাজবাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

সভাপতি—ডাঃ জে এম পিবলস্।

সহঃসভাপতি—শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ ও মিঃ জে জি মিউজেন্স।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ ও মিঃ সি সি আর্মিটেজ।

ধনরক্ষক—মিঃ ডবলিউ জে মামফোর্ড।

সদস্য—মিঃ ডবলিউ এফ ক্যারোল, ডাঃ মণিয়র, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, মিঃ জে মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র চৌধুরী, ডাঃ হেমচন্দ্র সেন, মিঃ জি ডবার্ণ ও শ্রীযুক্ত প্রেমতোষ বসু।

ডাঃ পিবলস্ লিখিয়াছেন, মহারাজবাহাদুরের নিকট বিদায় লইয়া তিনি আর্মিটেজ দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করেন। বিবি আর্মিটেজ একজন শক্তিশালিনী মিডিয়ম ছিলেন। সে সময় তিনি দেহবিমুক্ত আত্মা প্রকট করার চেষ্টা করিতেছিলেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার ছিলেন কলিকাতা সাইকিক্যাল্ সোসাইটী ও হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের কর্ণধার। তাঁহার প্রযত্নে এই দুইটী অনুষ্ঠানের প্রসার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুকাল পরে শিশিরকুমার পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ১৯১১ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে তিনি এই মরজগত ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন।

এই উভয় কার্য্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পীযূষকান্তি তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। পিতার অবর্ত্তমানে পীযূষকান্তি তাঁহার খুল্লতাত মতিবাবুর সহযোগে ম্যাগাজিন খানি কয়েক বৎসর সবিশেষ কৃতিত্বের সহিত চালাইয়াছিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমারের চতুর্থ পুত্র নীহারকান্তিও এই সময় জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সাহায্য করিতেন। শিশির কুমারের মৃত্যুর পর সোসাইটীর কার্য্য কিছুকাল বন্ধ ছিল। অতঃপর

১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত সরোজকুমার চৌধুরীর সহযোগে পীযূষকান্তি সোসাইটীকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু ইহার পরে তিনি নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্রব স্থাপন করায় তাঁহার মনোযোগ বহুধা বিভক্ত হয় এবং ফলে এই সোসাইটি পুনরায় নির্জীব হইয়া পড়ে এবং শেষে পীযূষকান্তির দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কার্য্যকলাপও একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। ১৯২২ সালের মার্চ্চ মাসে সরোজকুমার বাবু ও ডাঃ সরসীলাল সরকার এই সোসাইটির সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে পুনর্জীবিত করেন। ১৯৩৫ সালে শ্রীযুক্ত অনুতোষ দাসগুপ্ত ও সরোজকুমার বাবুর উপর সম্পাদকীয় ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

ডাঃ পিবলস্ ও শিশিরকুমার

শেষবার পিবলস্ সাহেব দুইমাসেরও অধিক কাল কলিকাতায় ছিলেন। সেই সময় মহাত্মা শিশিরকুমারের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হইত। ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। শিশিরবাবু নিত্যধামে গমন করিবার পর ডাঃ পিবলস্ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক পরলোকগত শিশিরকুমারের সহিত সামাজিক ভাবে আমার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সংশ্রব স্থাপিত হইয়াছিল তাহা এ জীবনে ভুলিব না। ইহা আমেরিকা ও ভারতবর্ষের মিলন সম্বন্ধ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। তিনি চিন্তাশীল সুপণ্ডিত এবং জ্ঞানোন্নতির সমুজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা স্বরূপ ছিলেন।

নীহারকান্তি ঘোষ

৩৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

১৮ই মাঘ ১৩৩১ সাল (ইং ৩১।১।২৫)

[পৃঃ—১৭৯

পীযূষকান্তি ঘোষ

৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

৫ই কার্ত্তিক ১৩৩৬ সাল (ইং ২২।১০।২৯)

[পৃঃ—১৭৮

তাঁহার হৃদয় প্রীতি ও সরলতাপূর্ণ ছিল, এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন; কেন না, চারিত্রিক সদ্ভাব, প্রতিভা এবং সকল জাতি সকল দেশ ও সর্ব্বশ্রেণীর জনগণের হিতসাধনার্থ আত্মোৎসর্গের উপরেই প্রকৃত মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্বে এই ঋষিপ্রতিম মহোদয়ের নিকট যখন আমি বিদায় গ্রহণ করিতে যাই, তখন তিনি স্নেহপূর্ণভাবে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া দেবতার ন্যায় সুমধুর কোমল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—প্রিয় ডাক্তার, তুমি জীবনের সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছ, এবং আমার স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কাজেই এই রক্তমাংসের দেহে আর আমাদের দেখা না হইতেও পারে। কিন্তু পরলোকের সেই সুখময় নিত্যধামে আবার যে আমরা চিরদিনের জন্য মিলিত হইব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তাঁহার এই কথাগুলি শুনিয়া আমার হৃদয় বিগলিত ও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। ভগবৎপ্রদত্ত কতকটা দিব্যজ্ঞান আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার ফলে আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিয়াছি যে, আমাব এই প্রিয়তম প্রাচ্য বন্ধু মহাত্মা শিশিরকুমার মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমরধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমার সুযোগ্য পরলোকদর্শী সহকর্ম্মী মিঃ সুদাল (Mr. Sudal) টাইপরাইটার মেসিনে কাজ করিতে করিতে সহসা উহা হইতে হাত উঠাইয়া আমাকে বলিলেন,—দেখিতেছি এই লাইব্রেরীতে একজন হিন্দু আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইহার সহিত আপনার আলাপ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—ইনি কে? প্রত্যুত্তরে মিঃ সুদাল বলিলেন,—আমি ইহাকে চিনিতে পারিতেছি না। কারণ, পূর্ব্বে আমি ইহাকে কখনও দেখি

নাই। তখন আমি আমার আত্মগত-সংস্কার ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে, ইনি যে কে তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলাম; এবং আমার হৃদয় তখন দুঃখকালিমায় অত্যন্ত ম্লান হইয়া পড়িল।

মিঃ স্নুদাল্‌ আবার বলিলেন,—আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এই মহাত্মার সহিত আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ হিন্দু এই লাইব্রেরীতে উপস্থিত আছেন। ইঁহারা বলিতেছেন যে, আধ্যাত্মিক সত্য গ্রহণের জন্য ভারতবাসিগণ প্রস্তুত হইয়াছেন। এই সময় ইঁহারা অনুরোধ করিতেছেন, আধ্যাত্মিক চর্চ্চা প্রচারের জন্য আপনি কতিপয় মিডিয়ম ও আধ্যাত্মিকতত্ত্বদর্শী বক্তাসহ ভারতবর্ষে যাইয়া প্রচার করুন। ইঁহারা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক চর্চ্চা শোকাকুলের সান্ত্বনাদায়ক মৃত্যুভয়নাশক ও মানবসমাজের নিত্য উন্নতিসাধক।

ডাঃ পিবলস্‌ তাঁহার "পাঁচবার ভূপর্য্যটন" নামক পুস্তকে ভারতীয়দিগের মধ্যে কেবলমাত্র দুইব্যক্তির প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন,—ইঁহার একজন মহারাজবাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং অপর জন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ।

কলিকাতা সাইকিক্যাল সোসাইটির সম্পাদকের পত্র

কলিকাতা সাইকিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার চৌধুরী নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠাইয়াছেন :—

বিগত ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে আমার মধ্যমভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র ৩৯ বৎসর বয়সে কাশীধামে পরলোকগত হন। তিনি

১৯২০ সালে মুন্সেফ হইয়াছিলেন এবং ১৯৩৩ সালে দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত সীতামারী মহকুমায় অবস্থানকালে ৮০০ টাকা বেতনে পাটনা হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হন। এই আদেশ প্রাপ্তির পর তিনি পাটনা হাইকোর্টে যাইয়া ৭ দিন কাল রেজিষ্ট্রারের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করেন। তারপর দুর্গাপূজার অবকাশে মাতাঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্য ছাপড়ায় আমার ভ্রাতা ডাক্তার সন্তোষকুমার চৌধুরীর বাটীতে গমন করেন। সেখান হইতে মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া সপরিবারে কাশীধামে যান। আমিও সেই সময় পূজার ছুটীতে কলিকাতা হইতে কাশী গিয়াছিলাম। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া ১লা অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। সেই দিনই আমার মধ্যমভ্রাতা নির্ম্মলের সামান্য জ্বর হয়। তাহার অসুখের কথা শুনিয়া আমার ডাক্তার ভ্রাতা কাশী গমন করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার চারি দিন পরে কাশী হইতে যে পত্র পাইলাম, তাহাতে জানিলাম নির্ম্মলের জ্বর ত্যাগ পায় নাই। ইহার তিন দিন পরে কাশী হইতে আমার ডাক্তার ভ্রাতা লিখিলেন যে, নির্ম্মলের নিউমনিয়া হইয়াছে এবং অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই সংবাদ পাইয়া আমি সেই দিনই কাশী চলিয়া গেলাম; যাইয়া দেখি নির্ম্মলের বিকার হইয়াছে, এবং তাহার সামান্য জ্ঞান থাকিলেও কথা বলিবার অবস্থা নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না,—১৭ই অক্টোবর প্রাতে ৫টার সময় বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, দুইটি পুত্র, তিনটী ভ্রাতা ও অপরাপর আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া তিনি স্বধামে চলিয়া গেলেন।

নির্ম্মল চলিয়া যাইবার সময় অজ্ঞান থাকায় কোন কথা বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার বলিবার কিছু আছে কি না, এবং

সেখানে যাইয়া কেমন আছেন, তাহা জানিবার জন্য সোসাইটির একজন মিডিয়মকে লইয়া আমি চক্রে বসিয়াছিলাম; কিন্তু সে দিন কিছু হইল না।

ইহার পর একদিন সন্ধ্যা ৭টার সময় একটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি বরিশালের একজন ডাক্তার। তিনি বলিলেন, তাঁহার হাত দিয়া স্বৈরলিপি (Automatic writing) বাহির হয়। কিন্তু তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন না,—কোন আত্মা তাঁহার হাতে ভর করিয়া লেখেন, কিম্বা উহা তাঁহার নিজের মনোভাব। ইহা ঠিক জানিবার কোন উপায় আছে কি না, তাহাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি আসিয়াছেন।

আমি বলিলাম,—আপনি যদি আমার সঙ্গে ২।৪ দিন চক্রে বসেন, তাহা হইলে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায়, আমি তাঁহাকে লইয়া তখনই চক্রে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে। আমি তাঁহাকে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে বলিলাম, এবং একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে যদি কোন আত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে তিনি যেন এই ভদ্রলোকটির দ্বারা তাঁহার উপস্থিতি জ্ঞাপন করেন।

এই কথা বলিবামাত্র সেই ভদ্রলোকটির মুখ দিয়া বাহির হইল,—"আমি মণ্টু, আমি মণ্টু।" মণ্টু আমার পরলোকগত ভ্রাতা নির্ম্মলের ডাক্‌নাম। আমি তাহাকে মণ্টু বলিয়াই ডাকিতাম। ভদ্রলোকটির মুখ দিয়া ঐ নাম বাহির হইলেও, প্রকৃতই আমার ভ্রাতার আত্মা সেখানে আসিয়াছেন কি না তাহাই ঠিক জানিবার জন্য, আমি কয়েকটি প্রশ্ন করিলাম। এই সকল প্রশ্ন এবং

মিডিয়মের মুখ দিয়া উহার যে উত্তর বাহির হইল, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রশ্ন। তুমি যদি আমার ভাই মণ্ট হও, তবে বল দেখি কোথায় তোমার মৃত্যু হইয়াছিল?

উত্তর। কাশীধামে।

প্রঃ। তোমার ছোট ছেলের নাম কি?

উঃ। টুল্‌টু।

প্রঃ। তোমার বড় ছেলের নাম কি?

উঃ। নিমাই।

[এই সকল উত্তর ঠিকই হইয়াছিল।]

প্রঃ। কি রোগে তোমার মৃত্যু হইয়াছে?

উঃ। ক্ষয়রোগে।

এই উত্তর শুনিয়া আমি আমার ভ্রাতার আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম,—"ইহা ত ঠিক হইল না, মৃত্যু হইয়াছে যে নিউমনিয়া রোগে?" আমি এই কথা বলিবামাত্র মিডিয়মের মুখ দিয়া বাহির হইল,—"দাদা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ? তবে আমি চলিলাম।" ইহাই বলিয়া মিডিয়ম দুই হাত দিয়া আমার দুইখানি পা স্পর্শ করিয়া আমাকে প্রণাম করিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবেশ ভাব কাটিয়া গেল, তিনি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ রকম কেন করিলেন?" তিনি বলিলেন,—কৈ, আমি ত কিছু করি নাই?" (১)

---

(১) পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সকল আত্মাই যে সকল সময় সকল ভাবের আদান প্রদান করিবার বা সকল কথা বলিবার শক্তি লাভ করিতে পারেন তাহা নহে। আবার মিডিয়ম যদি আবিষ্ট অবস্থায় সম্পূর্ণ চেতনাশূন্য

সরোজবাবু লিখিয়াছেন,—উপরে যে ঘটনা বিবৃত করিলাম তাহাতে আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, আমার ভ্রাতার আত্মা মিডিয়মের উপর ভর করিয়াই আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাতে সকলের মনে এইরূপ বিশ্বাস হয় সেইজন্য আমি ঐ ভাবে প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই সম্বন্ধে আমার দৃঢ়বিশ্বাস কেন হইয়াছিল তাহা বলিতেছি। মিডিয়মের বাড়ী বরিশালে এবং তিনি সেখানে থাকেন। আমার কি আমার পরিবারস্থ ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহারও সহিত তাঁহার জানাশুনা ছিল না বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং আমাদের ঘরের কথা অবগত

না হন তাহা হইলেও, যে আত্মা তাঁহার উপর ভর করেন তিনি মিডিয়মকে সম্পূর্ণরূপে আপন আয়ত্তে আনিতে এবং তাঁহার দ্বারা আপনার বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারেন না। আবার যাঁহারা অতি অল্পদিন পরলোকগত হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে পরজগতের সকল বিষয় সম্যক্ প্রকারে পরিজ্ঞাত হওয়াও সম্ভবপর নহে। নির্ম্মলের আত্মা ঐ সময়ের অতি অল্পদিন পূর্ব্বে অন্য জগতে গমন করিয়াছেন। সুতরাং তখনও তিনি কোন মিডিয়মকে সম্পূর্ণরূপে আপন আয়ত্বে আনিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কাজেই মিডিয়মের দ্বারা সকল কথা ঠিক ভাবে প্রকাশ করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তারপর তখনও এই মরজগতের প্রতি তাহার আকর্ষণ ষোল আনা ছিল। কাজেই তখনও তিনি তাঁহার ভালবাসার ব্যক্তিদিগের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতে এবং তাহাদের সহিত সুখ দুঃখের কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই দিনকার চক্রেই প্রথম তিনি তাহার ভ্রাতার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। এই সময় তাহার দাদা তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তিনি বিশেষ ব্যথিত হন। সেইজন্যই তিনি বলিলেন,—"দাদা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ? তবে আমি চলিলাম।" কিন্তু সরোজবাবু যে তাঁহার ভ্রাতার আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিবার শক্তি তখন নির্ম্মলের আত্মার হয় নাই।

হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে এ কথা উঠিতে পারে, আমি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহাদের উত্তরও আমার জানা ছিল। প্রথম তিনটি প্রশ্ন সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু আমার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর মিডিয়মের মুখ দিয়া বাহির হয় যে, যক্ষ্মারোগে নির্ম্মলের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু আমি জানিতাম নিউমনিয়া রোগে সে মারা যায়। সুতরাং thought transferance বলিয়া ইহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ইহার পর কয়েকবার আমাদিগের সমিতির চক্রে আমার ভ্রাতা নির্ম্মলের আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

ঐ সনের ১৪ই নভেম্বর তারিখে সোসাইটির দুইজন মিডিয়ম সহ আমরা চক্রে বসিয়াছিলাম। উহাদিগের মধ্যে একজন দিব্যদৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। চক্রে বসিবার কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন,—আপনার ভ্রাতার আত্মা আসিয়াছেন। সেই সময় অপর মিডিয়মের আবিষ্টভাব দেখিয়া আমি প্রশ্ন করিতে লাগিলাম আর সেই মিডিয়মের মুখ দিয়া উত্তর বাহির হইতে লাগিল। যথা—

প্রশ্ন। তোমার নাম কি ?

উত্তর। নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী।

প্র। মৃত্যুর পূর্ব্বে তুমি কি কাজ করিতে ?

উ। মুন্সেফ ছিলাম।

প্র। কোথায় ?

উ। সীতামারীতে।

প্র। তোমার ছোট ছেলের ডাকনাম কি ?

উ। টুলটু।

প্র। তোমার কি কোন জীবনবীমা করা হয়েছিল ?

উ। হাঁ।

প্র। কোথায় ?

উ। সান লাইফ অ্যাস্থরেন্স কোং লিমিটেডে।

প্র। কত টাকার ?

উ। পাঁচ হাজার টাকার।

প্র। আর কোথাও কি করা হইয়াছিল ?

উ। হাঁ, ন্যাশানাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে।

প্র। কত টাকার।

উ। চারি হাজার টাকার।

আমার ভাই যে জীবনবীমা করিয়াছিলেন তাহাই আমি আদপে জানিতাম না। কাজেই কোথায় কত টাকার বীমা করা হইয়াছিল তাহা আমার জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। উল্লিখিত দুইটি জীবনবীমা কোম্পানির আফিসে অনুসন্ধান করিয়া পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, মিডিয়মের মুখ দিয়া যাহা বাহির হইয়াছে তাহা ঠিক।

আর একদিন সোসাইটির চক্রে একজন মিডিয়ম লইয়া বসা হয়। সেদিন ডাঃ সরসীলাল সরকার, প্রফেসর তুলসীদাস কর, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক প্রভৃতি সোসাইটির ৯ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। চক্রে বসিবার কিছুকাল পরে মিডিয়মের উপর নির্ম্মলের আত্মার আবির্ভাব হইল। প্রথমেই ডাঃ সরসীলাল প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি কোন্ স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাস করেন ?" মিডিয়ম লিখিলেন,—"রাভেন্সা কলেজিয়েট স্কুল হইতে।" মিডিয়ম অবশ্য এ কথা জানিতেন না। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, ইঁহাদিগের মধ্যে আমি ভিন্ন আর কাহাকেও কি তুমি জান ?

মিডিয়মের হাত দিয়া লেখা হইল,—"হাঁ, শরৎ বাবুকে চিনি।" শরৎবাবুর সঙ্গে আমার শ্বশুর বাড়ী সম্পর্কে জানাশুনা। কিন্তু মিডিয়ম তাহা জানিতেন না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ও কন্যার হাত দিয়াও নির্ম্মল অনেক কথা লিখিয়াছিল।

গত ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে অল ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্‌থ (All India Institute of Hygiene and Public Health) এর অধ্যাপক মিঃ কে সি কে ই রাজা আমাদের সোসাইটির সভ্য হন। পরলোক ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা ছিল না। সভ্য হইবার পর একদিন তিনি আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার এক ভ্রাতা সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মার সহিত কথার আদান প্রদান হইতে পারে কি না? আমি তাঁহাকে আমাদের চক্রে বসিতে বলিলাম, তিনিও সম্মত হইলেন।

প্রথম দিন তাঁহার ভ্রাতার আত্মার আবির্ভাব হইল না। দ্বিতীয় দিবস মিডিয়মের উপর তাঁহার ভ্রাতার ভর হইল, কিন্তু মিডিয়মের হাতে লেখা হইল,—আমার ভ্রাতা রাজার পুত্রের দ্বারা আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব। তৃতীয় দিবস রাজার ১১ বৎসরের পুত্রকে চক্রে বসান হইল। কিছুক্ষণ পরে ছেলেটির উপর রাজার ভাইয়ের আত্মার ভর হইল, এবং ছেলেটি ক্রমে জ্ঞানশূন্য হইয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিল ও তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইল। আমি তাহাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। কারণ মিডিয়ম ও আত্মা উভয়েই মান্দ্রাজি, বাঙ্গালা জানিত না। আর ছেলেটি ইংরেজীতেই উত্তর দিতে লাগিল।

প্রশ্ন। আপনারা কি আমাদের দেখিতে পান?

উত্তর। হাঁ, দেখিতে পাই।

প্র। কিরূপ দেখিতে পান?

উ। পরিষ্কার ভাবেই দেখিতে পাই।

প্র। আমার জামার পকেটে কি আছে বলিতে পারেন ?

উ। হাঁ, পারি।

আমি তখন আমার জামার পকেট হইতে এক গোছা চাবি ও কতকগুলি পয়সা নিঃশব্দে বাহির করিয়া ও হাতে মুঠার মধ্যে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—বলুন দেখি আমার মুঠার মধ্যে কি আছে ? উত্তর হইল,—এক গোছা চাবি ও কতকগুলি পয়সা। তখন আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—বলুন দেখি আমার ব্যাগে কি আছে ? ইহাতে ছেলেটির মুখ দিয়া রাগতভাবে বাহির হইল,—যখন একবার পরীক্ষায়ও আপনাদের বিশ্বাস হইতেছে না, তখন পুনরায় পরীক্ষা দিতে আমি রাজী নহি। তখন ক্রুদ্ধ আত্মাকে শান্ত করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—দেখুন দেখি পার্শ্বের ঘরে ঘড়িতে ক'টা বাজিয়াছে ? উত্তর হইল,—৮॥টা। ঠিক সেই সময় টং টং করিয়া ঘড়িতে ৮॥টা বাজিল।

এই সকল কথা আত্মার ভর না হইলে অপর কি প্রকারে মিডিয়ম বলিতে পারে ? কেহ হয়ত বলিবেন, মিডিয়মের সূক্ষ্মদৃষ্টি খুলিয়াছিল। তাহা যদি হইত তবে যখন এই বালকের উপর অন্য আত্মার ভর হইয়াছিল, তখন সে ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই কেন ?

বালক-মিডিয়মের উপর যে আত্মার ভর হইয়াছিল তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমার ভ্রাতার আত্মাকে কি এখানে আনিতে পারেন ? উত্তর হইল,—পারি।

২৭শে নভেম্বর সেই বালকটিকে লইয়া আমরা আবার চক্রে বসিলাম, এবং ক্রমে রাজার ভ্রাতার আত্মা তাহার উপর ভর করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমার ভ্রাতার আত্মা কি আসিয়াছে ? উত্তর হইল,—হাঁ আসিয়াছে। তখন আমি আমার ভ্রাতার আত্মাকে

উদ্দেশ করিয়া, তাহার বক্তব্য এই বালকটির হাতে লিখিতে অনুরোধ করিলাম। তখন বালকটির হাত দিয়া আমার সেই ভ্রাতার ও তাহার ছেলেদের নাম এবং অন্যান্য অনেক কথা—যাহা মিডিয়মের জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না—ঠিক ভাবে ইংরেজীতে লেখা হইল।

আমার এক বন্ধুর দিব্যদৃষ্টিশক্তি আছে। তিনি ভবানীপুরে থাকেন। একদিন আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমার এক ভাই মারা গিয়াছে, তাহার নিকট হইতে কি কোন সংবাদ (message) আনিয়া দিতে পারেন? তিনি বলিলেন,—তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিব। ইহার এক সপ্তাহ পরে পুনরায় তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন যে, আমার ভ্রাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমার ভ্রাতা বলিলেন,—দাদার সহিত আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাঁহাকে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে একটা কথা তাঁহাকে জানাইতে হইবে। আমার বড় ছেলে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়িতেছে। এবার সংস্কৃততে সে কম নম্বর পাইয়াছে। তাহার জন্য একজন ভাল পণ্ডিত রাখিতে দাদাকে বলিবেন।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। আমার এই বন্ধুটি আমাদের পরিবারস্থ আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না। বিশেষতঃ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র যে সংস্কৃততে কম নম্বর পাইয়াছে ইহা আমিই জানিতাম না, আমার বন্ধুর জানিবার ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কেহ কেহ বলেন Thought Transferance বা Telepathy দ্বারা প্রশ্নকর্ত্তার মন হইতে মিডিয়মের মনে এই সকল কথা

পরিচালিত হয়। কিন্তু বন্ধুবরের সঙ্গে যখন আমার ভ্রাতার আত্মার ভাবের আদান প্রদান হয় তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। আর আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র যে সংস্কৃততে কম নম্বর পাইয়াছিল তাহা আমি আদপে জানিতামই না। সুতরাং এখানে Telepathy বা চিন্তাপঠন কিংবা মিডিয়মের Subconscious Mindএর কথা আসিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ঠাকুর তরণীকান্ত সরস্বতী

ঢাকা জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ মৈশুণ্ডী গ্রামে ঠাকুর তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতীর আদি নিবাস। তিনি শৈশবাবধিই অতিশয় সাধুপ্রকৃতির লোক, এবং যোগ ও তন্ত্রের চর্চ্চা করিয়া ক্রমে বহু অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করেন। সে সময় তিনি ঢাকা সহরেই অধিক সময় থাকিতেন এবং সেখানেই তিনি লাট সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণ পর্য্যন্ত সকলের নিকট হিপ্‌নটিজম্, দিব্যদৃষ্টি, পরলোকগত ব্যক্তিদিগের আত্মা সূক্ষ্মদেহে আনয়ন প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিলেন।

ঢাকার তৎকালীন্ সরকারী উকিল পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ রায় বাহাদুর সকলের সুপরিচিত ও সম্মানভাজন ছিলেন। তিনি পর পর তিনবার বিবাহ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার তিনটি স্ত্রীই যথাক্রমে পরলোকগমন করেন। তাঁহার শেষ স্ত্রী

১৯১১ সালের ১৬ই জুলাই মারা যান। এই সময় হইতেই পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা বলিবার কোন্ উপায় আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য রায় বাহাদুরের অত্যন্ত আগ্রহ হয়।

ঠাকুর তরণীকান্তের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। রায় বাহাদুরের ঐকান্তিক আগ্রহে ১৯১১ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখে প্রাতে ৮টার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে একটি প্রশস্ত হলঘরে সরস্বতী ঠাকুর চক্রে বসিবার আয়োজন করিলেন। তিনি রায়বাহাদুর এবং একটি বালকসহ একখানি টেবিলে পরস্পরের হস্ত স্পর্শ করিয়া বসিলেন।

ঐ ভাবে চক্রে বসিয়া সরস্বতী মহাশয় প্রথমতঃ অস্ফুটস্বরে কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কিছুকাল শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে সঙ্গীদ্বয়কে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিয়া নিজেও চক্ষু মুদিলেন। ইহার কয়েক মিনিট পরে তিনজনই চক্ষু চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের সম্মুখে একটি বৃদ্ধের ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। ঈশ্বরবাবু দেখিয়াই ইহা তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ছায়ামূর্ত্তি বলিয়া চিনিতে পারিলেন। অর্দ্ধমিনিট পরেই এই ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। তারপরেই একটি পরম সুশ্রী বালকের ছায়ামূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। ঈশ্বরবাবু দেখিয়াই চিনিলেন ইহা তাঁহার পরলোকগত পুত্র ত্রৈলোক্যনাথের ছায়ামূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিও আধমিনিটের বেশী রহিল না। তৎপরে ঈশ্বরবাবুর তিনটি মৃতা স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি একসঙ্গে আবির্ভূতা হইল। জীবিতকালে তাঁহারা যে ভাবে বেশভূষা করিতেন, এখানেও তাঁহাদের বেশভূষা ঠিক সেইরূপ দেখা গেল, এবং বায়স্কোপের ছবি যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়, এই মূর্ত্তি তিনটিও ঠিক সেইরূপ পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইতেছিল। প্রায় তিন মিনিটকাল অবস্থান করিয়া প্রথমা স্ত্রীর, এবং তৎপরে

দ্বিতীয়া স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। তারপর কনিষ্ঠা স্ত্রীর মূর্ত্তি সরিয়া যাইতেছে দেখিয়া, ঈশ্বরবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন,—তুমি যাইও না, আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। ঈশ্বরবাবু এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তিটি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং চক্রে উপবিষ্ট বালকের দেহে মিশিয়া গেল। বালকটি তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল, এবং তাহার হাত দুখানি ভীষণ ভাবে কাঁপিতে লাগিল। সরস্বতী মহাশয় তখন টেবিলের উপর একখানি কাগজ রাখিয়া বালকটির হাতে একটি পেন্সিল দিলেন। পেন্সিল দিবামাত্র তাহার হাত দিয়া অতি দ্রুতগতিতে তিনটি কথা লেখা হইল, যথা—

(১) ভাল, (২) শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড, (৩) অসময় হয় নাই। লেখা শেষ হইলেই বালকটি সংজ্ঞালাভ করিল। ঈশ্বরবাবু এই লেখাগুলি পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলেন, কারণ তাঁহার মনে যে তিনটি প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল এইগুলি তাহারই যথাযথ উত্তর। সেই তিনটি প্রশ্ন এই—

(১) আমার ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইবে?

(২) কি ভাবে আমি তোমাদের পারলৌকিক সুখের উপায় করিতে পারি?

(৩) তোমাদের অকাল মৃত্যু হইল কেন?

রায়বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদের পরম বান্ধব ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিয়াছিলাম। এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন,—ঠাকুর তরণীকান্ত যে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। তিনি আমার পরলোকগত পিতা পুত্র ও তিনটী স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি ইহলোকে আনিয়া আমাকে দেখাইয়াছেন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার মনে যে তিনটি প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল সেইগুলির যথাযথ উত্তরও আমার কনিষ্ঠা স্ত্রী দিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবিকই ইহা অতি আশ্চর্য্য ঘটনা। ইহাদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, এই পরলোকতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। সাধারণতঃ অন্ধকার বা ঈষৎ আলোকযুক্ত গৃহেই আত্মার অবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু উজ্জ্বল দিবালোকে মৃতব্যক্তির আত্মা আনয়ন করা যে অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা এই সম্বন্ধে সরস্বতী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি তখন বলিয়াছিলেন যে, আধুনিক কোন প্রণালীই তাঁহার জানা নাই। প্রাচীন ভারতীয় উপায় অবলম্বন করিয়াই তিনি এই সকল অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে ইহা অভিনব বটে, কিন্তু আমাদের দেশে ইহা নূতন নহে। মহাভারতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুকদেবের দেহত্যাগের পর ব্যাসদেব শোকে অত্যন্ত বিচলিত হন। শঙ্কর শুকদেবের সূক্ষ্মমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া ব্যাসদেবকে দেখান এবং পরলোক সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেদব্যাসকে জানাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। পরবর্ত্তী সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তিনি পুত্রশোকাতুরা পাগলিনীপ্রায় কৌরবমাতা গান্ধারীকে যুদ্ধে নিহত তাঁহার শত পুত্রকে দেখাইয়াছিলেন। আর এক সময় তিনি রাজা জন্মেজয়কেও তাঁহার পিতা রাজা পরীক্ষিতের ছায়ামূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন।

সরস্বতী মহাশয়ের মতে বহির্জগত হইতে মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া অন্তর্জগতে লইয়া যাইয়া একাগ্রচিত্ত হইতে পারিলে দিব্যদৃষ্টি লাভ করা যায়; এবং তাহার ফলে পরজগতের ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। এই প্রকারে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে, তখন নানাপ্রকার অদ্ভুত ও অলৌকিক কার্য্য করিতে পারা যায়; এমন কি, মনশ্চক্ষুদ্বারা পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের ছায়ামূর্ত্তিও দেখান যাইতে পারে।

তিনি এই ক্ষমতা কি ভাবে অর্জ্জন করেন তাহা সরস্বতী মহাশয় প্রকাশ করেন নাই বটে, তবে তিনি শৈশবাবধি সদাচারী ও সাধুভাবাপন্ন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারা যায় যে, কোন উচ্চশ্রেণীর পরলোকতত্ত্ববিৎ মহাপুরুষের অনুগ্রহ লাভ করিয়াই তিনি এই শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

প্রায় বিশ বৎসর যাবত ঠাকুর তরণীকান্ত কাশীধামে বাস করিতেছেন। কাশীধামে অনেক সাধুসন্ন্যাসী রাজামহারাজা এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তিনি এই সকল চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে। এই পুস্তকে তাঁহার যে প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল তাহা ১৯১২ সালের গৃহীত ফটো হইতে প্রস্তুত। তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা,—"আনন্দ আশ্রম, ৪নং বিশ্বনাথ লেন, বেনারস।

রায়সাহেব দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

রায়সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৮৫৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত সোমড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গত ১৯৩৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর, তারিখে তিনি

নিৰ্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

৩৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

১৭ই অক্টোবর ১৯৩৩ সাল

[পৃঃ—১৯৪

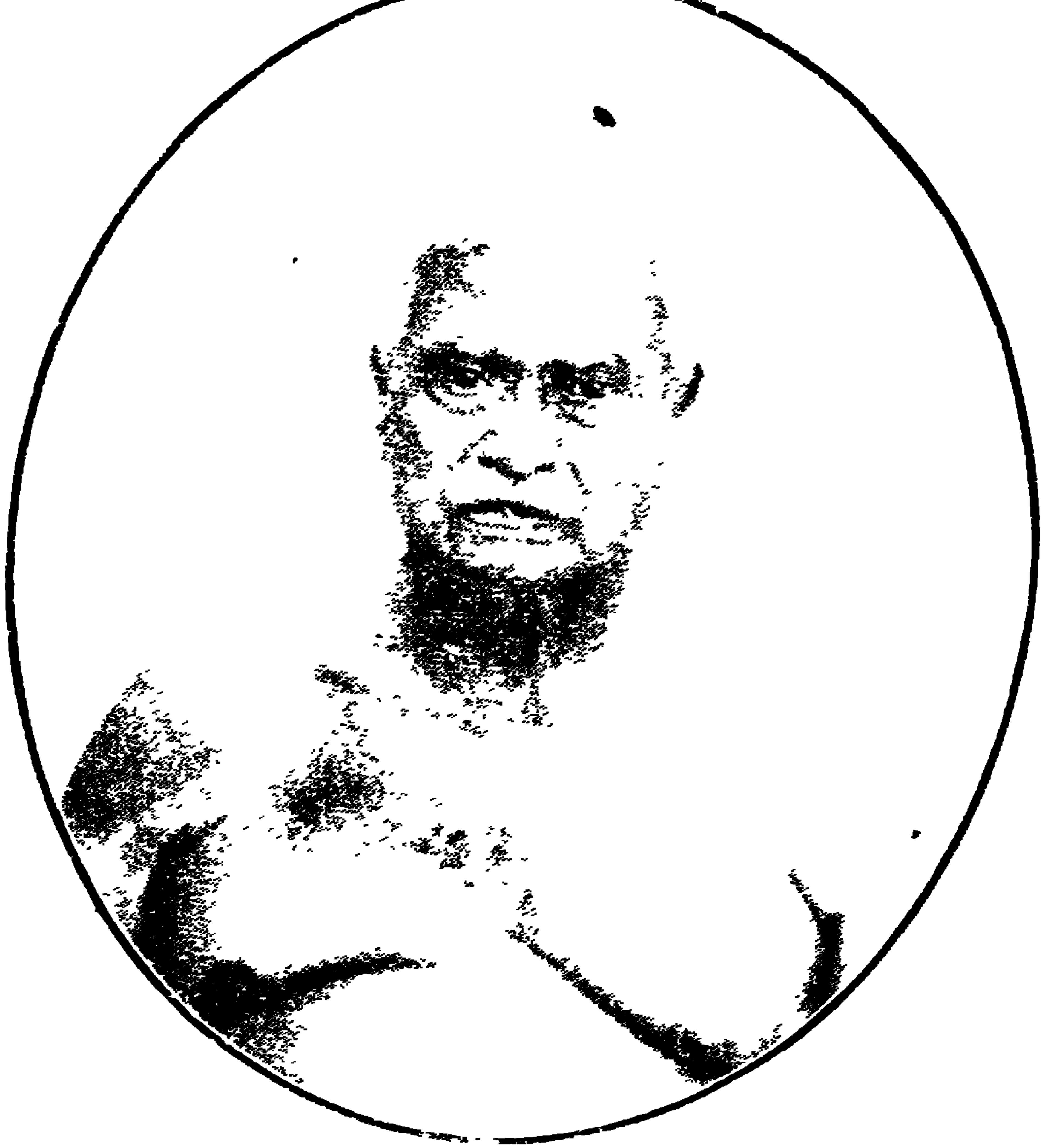

দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী
৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন
১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৫ সাল

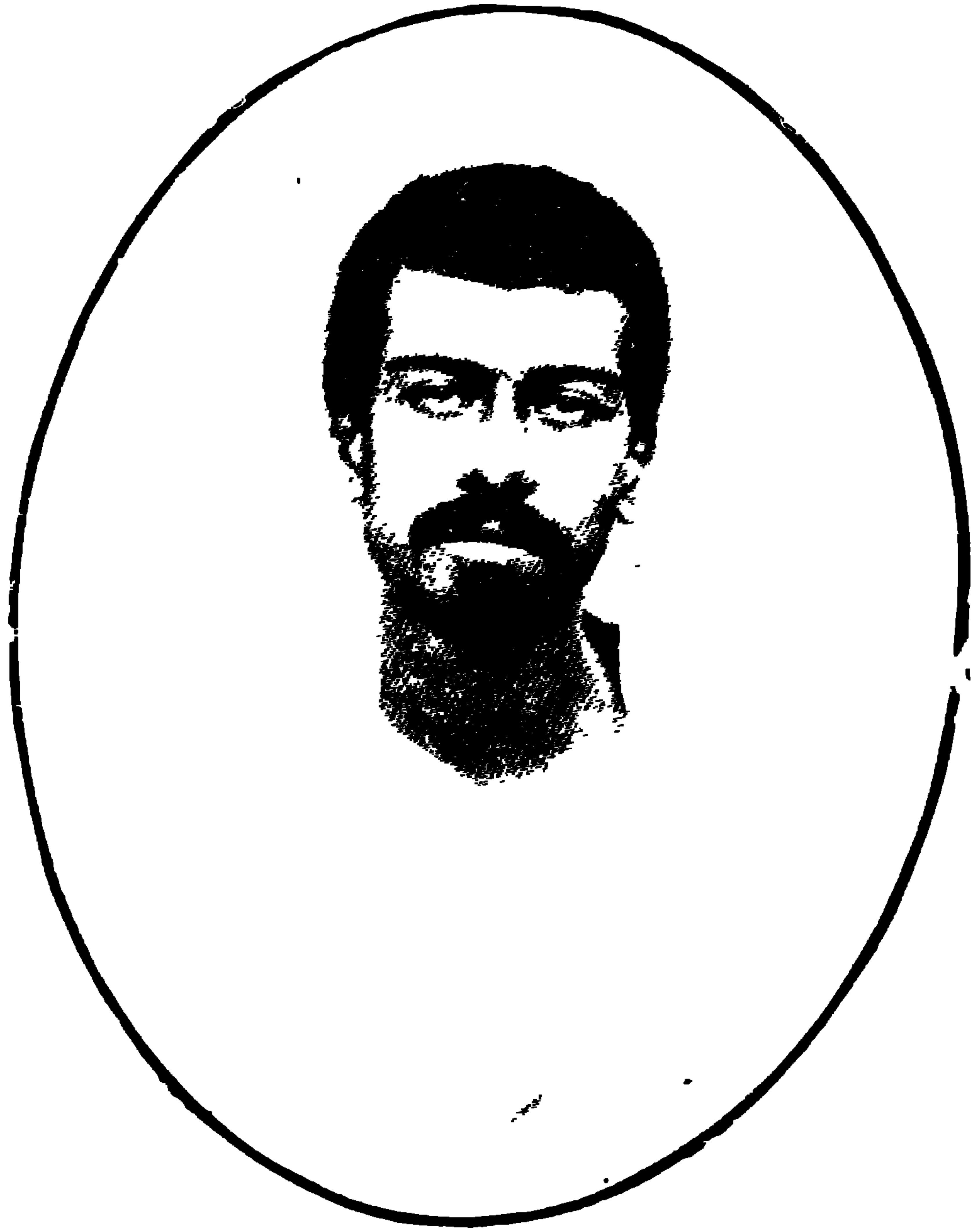

ঠাকুর তরণীকান্ত সরস্বতী
জন্ম—১৭ই অক্টোবর ১৮৭৬ সাল

তাঁহার কলিকাতাস্থ বাগবাজার বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি অতি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। তিনি কেবল নিজের বুদ্ধি ও অধ্যবসায় গুণে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ হইতে কৃতিত্বের সহিত L. C. E. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কার্য্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং ক্রমে উচ্চপদে উন্নীত হন।

সরকারী কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া বেদবেদান্তপুরাণাদি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন এবং নিয়ম মত যোগাভ্যাস ও আধ্যাত্মিক চর্চ্চা করেন। ইহার ফলে দিব্যদৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া অনেক অত্যাশ্চয্য ও অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিতে সক্ষম হন। এইরূপ নানাবিধ ভৌতিক ও অলৌকিক ঘটনা তিনি তাঁহার বিরচিত 'অলৌকিক রহস্য' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'গীতা ও তাহার যৌগিক ব্যাখ্যা', 'ষষ্ঠেন্দ্রিয় বা অলৌকিক রহস্যের যৌগিক ব্যাখ্যা', 'সপ্তমেন্দ্রিয়' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন ও সম্পাদন করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে যে সকল অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'পিশাচ দর্শন' ও 'পরলোক হইতে চিঠি' শীর্ষক ঘটনাদ্বয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পিশাচ দর্শন

১২৬৮ সালের মাঘ মাসের শেষে তাঁহাদের গ্রামস্থ এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রটন্তী কালীপূজা উপলক্ষে দুর্গাচরণদিগের বাড়ীর সকলের নিমন্ত্রণ হয়। দুর্গাচরণের খুড়া ঐ ব্রাহ্মণ বাড়ীর ম্যানেজার ছিলেন। বিকাল বেলা পূজা বাড়ীতে যাইবার সময় তিনি দুর্গাচরণ ও তাহার

জ্যেঠতুত ভাই যতুনাথকে বলিয়া গেলেন,—আমি পূজার বাড়ী যাইতেছি। তোমরা সন্ধ্যার সময় সেখানে যাইও, তোমাদিগকে ৮টার মধ্যে খাওয়াইয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দিব

দুর্গাচরণ লিখিয়াছেন,—আমার বয়স তখন ৮ ও যতুনাথের ৯ বৎসর। আমরা দুই জনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। সে সময় আমাদের গ্রামে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া মড়ক আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা বাড়ী হইতে বাহির হইতেই যতুনাথ বলিল,—আমার ভয় হচ্ছে দুর্গাচরণ। তুমি গান গাহিতে গাহিতে চল। আমার তখন 'বৌ কথা কও' গানটি মনে আসিল, এবং উহাই গাহিতে গাহিতে যাইতে লাগিলাম। পথে রামকাকাদের বাড়ী পড়িল। সেই মড়কে রামকাকা তাহাদের বাড়ীর ৫।৬টি ছেলেমেয়েসহ মারা যান। বাড়ীটি তখন প্রায় লোকশূন্য ও সদর দরজা ভাঙ্গা। গান গাহিতে গাহিতে যেমন আমরা সদর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, অমনি দেখি দীর্ঘকায় একব্যক্তি ঐ ভাঙ্গা সদর দরজা দিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিল এবং বলিল,—ছি! ছি! দুর্গাচরণ, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, পাড়ার মধ্য দিয়া ঐরূপ গান গাহিতে গাহিতে যাওয়া কি উচিত? আমি বলিলাম,—ঐ গান আর আমি গাহিব না। এই কথা বলিতেই সে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

সে যখন আমার হাত ধরিয়াছিল, তখন তাহাকে ভোয়ে (ভৈরব) গোয়ালা বলিয়া চিনিয়াছিলাম। ভৈরব আমাদের প্রজা ছিল। সে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসিত, আর আসিলেই আমাকে কাঁধে করিয়া বেড়াইত। কাজেই তাহাকে দেখিয়া আমার ভয় হয় নাই। কিন্তু যতুনাথের বেশ ভয় হইয়াছিল। সে আমাকে বলিল,—দুর্গাচরণ,

চল আমরা দৌড়িয়া পূজার বাড়ী যাই। ইহা বলিয়াই যদুনাথ ও সেই সঙ্গে আমি জোরে দৌড়াইতে লাগিলাম, এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে পূজার বাড়ীতে যাইয়া পৌঁছিলাম। খুড়া মহাশয় আমাদিগকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—অমন করে হাঁপাচ্ছিস্ কেন? আমি তাঁহাকে সকল কথা জানাইলাম। তিনি শুনিয়াই বলিলেন,—ভোয়ে গোয়ালা তোমার হাত কি করে ধর্‌লে? সে ত প্রায় একমাস আগে মারা গিয়েছে! এই কথা শুনিয়াই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল,—আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম। তখন আমার চোখে মুখে জল ও পাখার বাতাস দেওয়ায় আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। আমি ক্রমে উঠিয়া বসিলাম। তারপর খুড়া মহাশয় আমাদের খাওয়াইয়া লোকসহ বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

পরলোক হইতে চিঠি

রায়সাহেব দুর্গাচরণের সবে তিনটি কন্যা হইয়াছিল, পুত্র আদপে হয় নাই। দ্বিতীয়া কন্যা সুশীলা বেশ শান্তশিষ্ট সুশ্রী ও প্রিয়দর্শন ছিল। শৈশব হইতেই সে আদরের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাহার মাতা তাহাকে বেশ যত্ন সহকারে সমস্ত গৃহকর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু পিত্রালয়ে ঝি চাকর ও বামুন দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত বলিয়া সুশীলাকে নিজের হাতে কিছুই করিতে হইত না।

কিন্তু তাহার শ্বশুরালয়ে দাসদাসী কি পাচকব্রাহ্মণ ছিল না। সংসারের সমস্ত কাজ তাহার দুই বড়জা করিতেন। অবশ্য তাহার শাশুড়ী বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কাজেই হাত দিতেন না। সুশীলা যখন শ্বশুরবাড়ী গেল, তখন তাহার দুইজাই সন্তান সম্ভাবিতা, কাজেই সংসারের যাবতীয় কার্য্যের ভার সুশীলার উপরই পড়িল। সেও

অম্লানবদনে নিজের সুখসাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া দিবানিশি গৃহকর্ম্মে তন্ময় হইয়া রহিল।

কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ ও অতিমাত্রায় পরিশ্রম করিয়া তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং অম্লরোগের সহিত জ্বর দেখা দিল। তখন সুশীলার শ্বশুর পুত্রবধুর অসুখের কথা তাঁহার বৈবাহিককে জানাইলেন। কিন্তু যখন দুর্গাচরণ বাবু সুশীলাকে চিকিৎসার জন্য নিজের কাছে আনিবার কথা লিখিলেন, তখন সুশীলার শ্বশুর—স্বয়ং কবিরাজ এই অভিমান থাকায়—নিজেই পুত্রবধূর চিকিৎসা করিবেন বলিয়া তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইলেন না। কিন্তু শ্বশুরের চিকিৎসায় সুশীলার পীড়ার কোন উপশম ত হইলই না, বরং ক্রমে সে অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি রায়সাহেবকে তাঁহার কন্যার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহাকে লইয়া যাইতে পত্র লিখিলেন। এই পত্র পাইয়া দুর্গাচরণ বাবু সুশীলাকে তাঁহার কর্ম্মস্থল আরা জেলাস্থিত নাসিরাগঞ্জে লইয়া আসিলেন এবং পাটনা হইতে ভাল কবিরাজ আনাইয়া তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এই সময় দুর্গাচরণ বাবুর শতবর্ষ বয়স্কা পিতামহীর পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায়, তিনি চিকিৎসককে বিদায় দিয়া কন্যাসহ দেশস্থ বাড়ীতে আসিলেন, এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ করিয়া, সুশীলাকে তাহার মাতার কাছে বাড়ীতে রাখিয়া নিজে পুনরায় কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার সময় সুশীলাকে বলিলেন,—তোমাকে এখানে তোমার মাতার কাছে রাখিয়া আমাকে কর্ম্মস্থলে যাইতে হইতেছে। ভগবানের কৃপায় তুমি শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে। মাঝে মাঝে আমাকে পত্র লিখিও।

দুর্গাচরণ বাবু লিখিয়াছেন,—ইহার ৫।৬ দিন পরে একদিন রাত্রি

১০টার সময় নাসিরাগঞ্জে আমার বাঙ্গ্‌লার বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, এমন সময় ডাকপিয়ন আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া চলিয়া গেল। তখন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও নিদ্রাতুর হইয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলাম এবং চিঠিখানি খুলিয়া পাঠ করিলাম। দেখিলাম উহা সুশীলার পত্র। সে লিখিয়াছে,—বাবা আমি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছি। আমার আর কোন অসুখ নাই। কিন্তু আপনার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না। কারণ আমি ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে আসিয়াছি। চিঠিখানি পড়িয়া আমার মনে নানাভাবের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু সে সময় আমি নিদ্রার ঘোরে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, চিঠিখানি খামসমেত বালিশের তলায় রাখিয়া শয়ন করিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

পরদিবস অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইবার পরেই বালিশের নীচে হইতে চিঠিখানি লইতে গিয়া দেখিলাম সেখানে উহা নাই। চাকরকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—এখন পর্য্যন্ত আমি আপনার বিছানা স্পর্শও করি নাই। ইহা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম এবং ভাবিতে ভাবিতে নাসিরাগঞ্জ লকে ষ্টীমার ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইবামাত্র ডাকপিয়ন আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিল। উহা আমার স্ত্রী লিখিয়াছেন দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ পত্র খুলিয়া পাঠ করিলাম। এই পত্র পড়িয়া জানিলাম যে সুশীলা মারা গিয়াছে। তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম পূর্ব্ব রাত্রিতে ডাকপিয়নআমার হাতে যে পত্র দিয়া গিয়াছিল তাহা পড়িয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, উহা আমার কন্যা সুশীলার পত্র এবং সে ইহজগতে নাই। সে চিঠিখানি যে আমি বালিশের তলায় রাখিয়াছিলাম ইহা আমার বেশ স্মরণ আছে। কিন্তু

সে পত্র কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কেইবা বালিশের তলা হইতে উহা লইয়া গেল, ইহার প্রকৃত তথ্য আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পত্র

স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপর্য্যুপরি দুইটী দারুণ শোক পাইয়াছিলেন। তাহার পর বিলাতে যাইয়া পরলোকগত নিজজনদিগের আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য কয়েকবার সিয়ান্সে যোগদান করেন। ইহার ফলাফল তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক গোলোকগত গোলাপলাল ঘোষ মহাশয়কে দুইখানি পত্রে লিখিয়া পাঠান। এই পত্রদ্বয় ১৯২৩ সালের মে মাসের ২০এ ও ২৭শে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই দুইখানি পত্রের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

[প্রথম পত্র]

প্রিয় গোলাপ! তুমি জান গত বৎসর আমার উপর দিয়া কিরূপ প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। প্রথমে আমার জ্যেষ্ঠ পৌত্রটীকে হারাইলাম। সে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিল, বাঁচিয়া থাকিলে আমার বংশ উজ্জ্বল করিত। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে আমার কনিষ্ঠ পুত্র আমাদের হৃদয়ে শেল হানিয়া চলিয়া যায়। আমি প্রথমবার যখন বিলাতে গিয়াছিলাম, তখন সে আমার সহিত গিয়াছিল এবং তিন বৎসরকাল আমার সঙ্গের সাথী হইয়া ছিল। এই বৃদ্ধবয়সে সুদূর বিলাতে তাহাকে নিজের কাছে পাইয়া আত্মীয় স্বজনের অভাব ততটা অনুভব করিতে পারি নাই। উপর্য্যুপরি এইরূপ দুইটী বিষম বজ্রাঘাতে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, এবং আমি শোকে অভিভূত হইয়া পড়ি।

তুমি জান, তোমার ন'দাদা পরলোকগত মতিবাবু আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় কিরূপ ভালবাসিতেন। আমার সর্ব্বনাশের সময় তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। সেই অবস্থায়ও তিনি আমাকে ডাকাইয়া নিজের কাছে বসাইয়া মিষ্ট কথায় যে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। তারপর পরকাল সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক আমাকে দিয়া উহা পড়িবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এবং বলেন,—ইহা পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, মৃত্যু বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু তাহা নহে। এই পুস্তকগুলি আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলাম। তারপর নিজেও এই সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িয়াছি।

ইহার পর আমি আবার বিলাতে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া কোন বিশেষ বিশ্বাসী পরলোকতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্য আমার এক গণ্যমান্য বন্ধুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। বন্ধুবরের সাহায্যে হামষ্টিডনিবাসী কর্ণেল কাওলে নামক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় কর্ম্মচারীর সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি মিসেস্ জন্‌সন্ নাম্নী জনৈক মিডিয়মের সহিত আমার সিয়ান্সে বসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

১৯২২ সালের ৮ই অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ন ৩।৪৫ মিনিটের সময় সিয়ান্সে বসিবার বন্দোবস্ত হয়। নিয়মিত সময়ে আমার বন্ধু মিঃ এন সি সেন ও কর্ণেল কাওলের সহিত মিসেস্ জন্‌সনের বাটীতে গমন করি। ইনি অধ্যবসায়ী ও বেশ সহাস্যবদনা। আমরা চারিজন একটী ঘরে একখানি ছোট টেবিলের চারিপার্শ্বে চেয়ারে বসিলাম। মিসেস্ জন্‌সন্ আমার বামে, মিঃ সেন দক্ষিণে ও কর্ণেল সম্মুখে বসিলেন। তখন দরজা

জানালা ভালরূপে বন্ধ করিয়া পর্দ্দা ফেলিয়া ঘরটি গাঢ় অন্ধকারময় করা হইল। আমাদের সম্মুখে একটী চোঙ্গ (trumpet) ছিল। এটী সাধারণ গ্রামোফোনের চোঙ্গ অপেক্ষা কিছু বড়।

সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া মিসেস্ জন্‌সন্ বলিলেন,—একবার বসিয়াই সকল সময় কৃতকার্য্য হওয়া যায় না; কাজেই অকৃতকার্য্যতার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তারপর বলিলেন—যদি আমার পরিচিত প্রেতাত্মা আসে, তাহা হইলে চোঙ্গটি ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে, এবং উহার উপর টোক্কার শব্দ হইলে জানা যাইবে যে, চোঙ্গটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই সময় উহা আমাদের দেহের নানাস্থানে মৃদুভাবে স্পর্শ করিলে বুঝিতে হইবে যে, আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। তখন 'ধন্যবাদ' এই কথা বলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিতে হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে, আত্মারা সাধারণতঃ অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়। সুতরাং আমরা সকলে একসঙ্গে গান গাহিলে তাহার আকর্ষণে আত্মাদিগের এখানে উপস্থিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। তাঁহার পরিচিত আত্মাটী ল্যাঙ্কাসায়ারবাসী একটী বালকের, সে গান খুব ভালবাসে।

আমাদের স্থিরভাবে বসিবার পর, মিসেস্ জন্‌সন্ গান গাহিতে সুরু করিলেন। আমরাও তাহাতে যোগদান করিলাম। ইহার প্রায় ১৫ মিনিট পরে ঘরের নানাস্থান হইতে চলন্ত চোঙ্গের উপর টোক্কার শব্দ হইতে লাগিল। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম চোঙ্গটী ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্রমে আমাদের দেহের নানাস্থান মৃদুভাবে স্পর্শ করিয়া চোঙ্গটী জোরের সহিত ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেল। তারপর আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, কে যেন জন্‌সনের সহিত কথা বলিতেছে। ইহার কথায় যে ল্যাঙ্কাসায়ারের টান আছে তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম।

ভুপেন্দ্রনাথ বসু

৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

৩১শে ভাদ্র ১৩৩১ সাল (ইং ১৬।৯।২৪)

পৃঃ—২০২

গিরীন্দ্রনাথ বসু

২৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

৩রা আষাঢ় ১৩২৮ সাল (ইং ১৭।৬।২১

[পৃঃ—২০৩

কিছুক্ষণ পরে বিবি জন্‌সন্ আমাকে বলিলেন,—আমি দেখিতেছি আপনার পশ্চাতে একটি একহারা দীর্ঘকায় সুশ্রী যুবক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথায় বেশ কোঁকড়া চুল এবং বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর হইবে। তিনি আরও বলিলেন,—আমার পরিচিত আত্মা বলিতেছে যে, এটী আপনারই পুত্র। এখানে বলা আবশ্যক আমার পুত্রের যে মৃত্যু হইয়াছে ও মৃত্যুর সময় তাহার বয়স কত ছিল, তাহা আমি বিবি জন্‌সন্ ও কর্ণেল কাওলেকে জানাই নাই। জন্‌সন্ আরও বলিলেন যে, আমার পুত্রের আত্মা আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার সেরূপ শক্তি না থাকায় পারিতেছে না।

আমার ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি ভাল আছ ত? তখনই চোঙ্গের উপর তিনটী টোকার শব্দ শোনা গেল। জন্‌সন্ বলিলেন যে, উহার অর্থ,—হাঁ, সে ভাল আছে। তারপর মিডিয়ম আমাকে বলিলেন যে, আমার ছেলে আমার জন্য চিন্তিত আছে। তিনি আরও জানাইলেন যে, আমার পার্শ্বে একজন দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছেন তাহার মাথায় টাক। আমি কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। ইহার পর আমার সম্বন্ধে আর কিছু হইল না।

তখন বিবি জন্‌সন্ মিঃ সেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আপনার কাছে খর্ব্বাকৃতি একজন দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মাথায় পাগড়ি ও গায়ে জরীর কোট আছে। মিঃ সেন তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। বিবি তাঁহাকে আবার বলিলেন,—আপনার সম্মুখে একটী রমণী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পরিচ্ছদ নূতন ধরণের ও মাথায় ঘোমটা। তাঁহার নিকট একটী যুবককেও দেখিতেছি। ইহারা আপনার মাতা

ও ভ্রাতা। স্ত্রীলোকটী আপনার সহিত কথা কহিতে চাহেন। এই সময় চোঙ্গ হইতে একজনের কণ্ঠস্বর বাহির হইল, কিন্তু তাহা এরূপ অস্পষ্ট যে বোঝা গেল না। তারপর বিবি জন্‌সন্ মিঃ সেনকে বলিলেন,—আপনার মাতার প্রিয় কোন গান যদি আপনার জানা থাকে ও তাহা আপনি গাহিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার মাতার আত্মাও আপনার সহিত গাহিবেন। তখন সেন মহাশয় একটী বাঙ্গালা প্রার্থনা-সঙ্গীত গাহিলেন। তাঁহার সহিত আর একজনের গলার স্বর শুনিতে পাইয়া আমি বিস্মিত হইলাম, তবে কথা গুলি অস্পষ্ট।

আমরা এক ঘণ্টা সিয়ান্সে বসিয়াছিলাম, কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটে নাই। আমার ছেলেকে মিঃ সেন ভাল রকমই জানিতেন। বিবি জন্‌সন্ আমার ছেলের চেহারার যেরূপ অবিকল বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া আমরা উভয়েই অবাক্ হইলাম। হোটেলে আসিয়াই সমস্ত ঘটনা আমার নোটবহিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং সেই নোটবহি হইতে আজ এই বিবরণ লিখিতেছি।

সিয়ান্স হইতে উঠিয়া আসিবার সময় বিবি জন্‌সন্ বলিলেন যে, প্রথম দিনই যে এতটা সফলতা লাভ করা যাইবে তাহা তিনি আশা করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস কয়েক দিন চক্রে বসিয়া চেষ্টা করিলে আত্মাদিগের কথাবার্ত্তা নিশ্চয়ই স্পষ্ট শোনা যাইবে। আমি কিন্তু প্রথম দিন বসিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না, আমার পুত্রের সম্বন্ধে আরও সন্তোষজনক প্রমাণ পাইবার জন্য আমার মন উৎসুক হইয়া রহিল।

কিন্তু তখন আর সিয়ান্সে বসিবার সময় করিতে পারিলাম না। কারণ পরবর্ত্তী সপ্তাহেই জেনেভায় ইণ্টার ন্যাশানাল লেবর কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য আমাকে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে হইল।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর সাহায্যে অপর কোন সুদক্ষ মিডিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় হল্যাণ্ডপার্কের সাইকিক্ সোসাইটি গৃহে উহার সেক্রেটারী বিবি মেকেঞ্জির সহিত আমার আলাপ হইল। দেখিলাম, এই বাড়ীটি লণ্ডনের এক উত্তম পল্লীতে অবস্থিত। এখানে অধ্যাত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত আছে। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, ২৯শে নভেম্বর অপরাহ্ন ৩৷৷টার সময় তিনি মিসেস্ কুপার নাম্নী জনৈক বিখ্যাত মিডিয়মের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি দ্বিতলের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত একটি প্রকোষ্ঠে আমাকে লইয়া গেলেন। সেখানে বিবি কুপার বসিয়াছিলেন। 'এই ভদ্রলোকের কথাই বলিয়াছিলাম,'—এই কথা মিডিয়মকে বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। দেখিলাম, এই ঘরের মধ্যস্থলে এক খানি ছোট টেবিল, তাহার উপর একটি বাদ্যযন্ত্র আর তাহার দুই পার্শ্বে দুই খানি মাত্র চেয়ার আছে।

ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করা হইলে আমি একখানি চেয়ারে বসিলাম, আর একখানি চেয়ারে বিবি কুপার আমার দক্ষিণ হস্ত তাঁহার বাম হস্ত দ্বারা ধরিয়া বসিলেন। আমি বাম হস্ত দ্বারা বাদ্যযন্ত্রের হাতল ঘুরাইয়া দিলাম অমনি বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল। আমার সম্মুখে একটী চোঙ্গও ছিল।

কিছুক্ষণ পরে মিডিয়ম বলিলেন যে, তাঁহার পরিচিত এক আত্মা আসিয়াছে। এই আত্মা একটি ইণ্ডিয়ান বালিকার। ইহাকে তিনি 'নাদা' বলিয়া ডাকেন। চোঙ্গের ভিতর দিয়া রমণীকণ্ঠের আনন্দপ্রদ সুমিষ্ট স্বর আমার কাণে গেল। এই স্বর মৃদু হইলেও সুস্পষ্ট। এখানেও

চোঙটি আমার দেহের নানা স্থান স্পর্শ করিল। তৎপরে অপর এক আত্মা চোঙের মধ্য হইতে আমাকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই সময়ে নাদা স্পষ্টস্বরে বলিল,—আপনার ভ্রাতার আত্মা আসিয়াছেন।

আমি। কি করিয়া বিশ্বাস করিব আমার ভাই কথা বলিতেছেন?

উত্তর। আমরা এক সঙ্গে তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলাম।

আমি। অনেকের সঙ্গেই ত অনেকবার আমি তাজমহল দেখিতে গিয়াছি?

তখন আমার ভ্রাতা যে রোগে মারা গিয়াছিলেন তাহা তিনি বলিলেন। তারপর তিনি বলিলেন যে, তিনি এখন বেশ সুখে আছেন। কথাবার্ত্তা ইংরেজিতেই হইতেছিল। আমার ভ্রাতার আত্মা আমাকে লিখিবার চেষ্টা করিতে বলিলেন। কারণ তিনি বলিলেন যে আমি লিখিতে পারিলে তিনি অনেক বিষয় জানাইতে পারিবেন। আমি বলিলাম,—পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু লিখিতে পারি নাই। তিনি তখন বলিলেন যে, তাঁহার কথাগুলি লিখিয়া লইবার শক্তি যাহাতে আমি পাই তিনি তাহার চেষ্টা করিবেন।

তারপর চোঙ হইতে শব্দ হইল,—তোমাকে দেখিয়া বেশ আনন্দলাভ করিয়াছি। এখানে আত্মীয়স্বজন সকলের সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং আমরা সকলেই বেশ সুখে আছি। তারপর তিনি বলিলেন,—সাগরের পরপারে আমার স্ত্রীকে আমার ভালবাসা জানাইও। এখানে বলা প্রয়োজন, আমার ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী সন্তানসন্ততিসহ আমাদের কলিকাতার বাড়ীতেই বাস করিতেছেন।

তখন আমি আমার ভ্রাতার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রথমে কয়েক বার স্পষ্টভাবে উত্তর হইল—'ইন্দ্র'। তারপর শব্দ হইল—'হিতেন্দ্র'। কিন্তু ইহাও ঠিক হইল না, কারণ তাঁহার নাম—'উপেন্দ্র'।

তিনি পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিলেন। ইহার পর সে দিনের মত সিয়াম্সে বসা শেষ হইল।

আমার বিশ্বাস বিবি জন্‌সন্‌, বিবি কুপার অথবা ইংলণ্ডের অপর কেহই আমার ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ কিম্বা কি রোগে তিনি মারা গিয়াছেন তাহা জানিতেন না। এই সিয়াম্সে আসিবার সময় অথবা ইহাতে যোগদান করিয়া আমার ভ্রাতার কথা একবারও আমার মনে হয় নাই। কারণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি মারা যান, সেইজন্য তাঁহার বিয়োগজনিত শোকের বেগ ক্রমে কমিয়া আসিয়াছিল। বিশেষতঃ সম্প্রতি যাহারা গত হইয়াছে তাহাদের কথাই আমার সমস্ত হৃদয়খানি জুড়িয়া ছিল। কাজেই আমার ভ্রাতার কথা সে সময় মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পুত্রের আত্মা এই দিবস সিয়াম্সে না আসাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম।

[দ্বিতীয় পত্র]

আমার মৃতপুত্রের আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার জন্যই গত ২৯শে নভেম্বর তারিখে আমি হলাণ্ডপার্কের সাইকিক্ সোসাইটির সিয়াম্সে গিয়াছিলাম এবং সে নিশ্চয় আসিবে বলিয়া আশাও করিয়াছিলাম, কিন্তু সে না আসাতে আমার মন ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সেই জন্য ৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার বেলা ১১॥টার সময় পুনরায় ঐ সোসাইটির সিয়াম্সে বসা স্থির করা হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি সোসাইটির গৃহের দ্বিতলে উঠিয়া বরাবর বিবি কুপারের ঘরে উপস্থিত হইলাম। আমি যাইবামাত্র ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ও পর্দ্দা ফেলিয়া ঘর অন্ধকার করা হইল। পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আজও আমি মিডিয়মের বাম

পার্শ্বস্থ চেয়ারে বসিয়া তাহার বাম হস্ত আমার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধরিলাম এবং আমার বামহস্ত দ্বারা বাদ্যযন্ত্র চালাইয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে চোঙ্গের মধ্য হইতে নাদার গলার স্বর শোনা গেল। সে বলিল,—আপনার ভাই আবার আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—সে দিন ত নাম বলিতে পার নাই, আজ পারিবে কি? চোঙ্গের ভিতর হইতে শব্দ হইল,—হাঁ, আমার নাম 'উপেন্দ্র'।

তারপর নাদা বলিল,—আপনার পিতা আসিয়াছেন। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলিতে চা'ন। আমি বাবাকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি এখন কোথায় আছেন? উত্তর হইল,—তৃতীয় স্তরে। আমি তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি নাম বলিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন যে, আমার মাতা তাঁহার সঙ্গেই আছেন এবং তাঁহারা বেশ সুখেই আছেন।

সিয়ান্সে যাইবার সময় বাবার কথা আমার আদপে স্মরণ হয় নাই। আমার বয়স যখন ছয় বৎসর তখন তিনি দেহত্যাগ করেন। কাজেই তাঁহার কথা আমার অতি সামান্যই মনে পড়ে।

তারপর আমি নাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমার ছেলের আত্মাকে কি এখানে আনিতে পার? উত্তর হইল,—আপনার ছেলে ত লম্বা একহারা? সে এখানেই উপস্থিত আছে, আপনার সহিত কথা কহিতে চাহে।

বিবি কুপারের সহিত পূর্ব্বে যে দিন সিয়ান্সে বসিয়াছিলাম, সে দিন কিম্বা অদ্যকার সিয়ান্সে তাঁহার সহিত আমার পুত্রের সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই। অবশ্য নাদাকে আমার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় বিবি বুঝিতে পারিলেন যে, সে মারা গিয়াছে। তবে তাহার চেহারার কথা আমি কিছুই প্রকাশ করি নাই।

যাহা হউক আমি আমার পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম,—কেমন করিয়া জানিব যে তুমি আমার পুত্রের আত্মা? চোঙ্গের মধ্য হইতে শব্দ হইল,—Father, heart, heart, heart—অর্থাৎ বাবা, হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ড। আমার পুত্র প্রকৃতই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা যায়। হার্ট (heart) কথাটি তিনবার উচ্চারিত হওয়ায় বিবি কুপার জানিতে চাহিলেন যে, আমার পুত্র হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় পরলোকে গমন করিয়াছে কি না? আমি সে কথার কোন উত্তর দিলাম না। কারণ আমার পুত্র সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বিবিকে জানিতে দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না।

আমি আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আর কোন প্রমাণ কি দিতে পার? সেই সময় চোঙ্গের মধ্য হইতে দুইবার '১৭ই নভেম্বর' কথাটি উচ্চারিত হইল। ইহা শুনিয়া কুপার জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার পুত্র কি কোন মাসের ১৭ই তারিখে মারা গিয়াছিলেন? আমি বলিলাম,—ঠিক তারিখ আমি বলিতে পারিব না। কারণ আমার ধারণা এই ব্যাপার ১৬ই তারিখে ঘটিয়াছিল। তারপর আমার ছেলের আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—মাস ও বার কি বলিতে পার? উত্তর হইল,—শনিবার জুন মাস।

আমি। তোমার নাম বলিতে পার?

উত্তর। ইহা বলা বড় শক্ত। সেরূপ শক্তি আমার নাই, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি, অন্ততঃ আমার নামে কয়টি অক্ষর আছে তাহা বলিতেছি।

অতঃপর চোঙ্গ হইতে দুইবার 'থ' কথা বাহির হইল। আমার পুত্রের নাম ছিল 'গিরিন্দ্রনাথ'।

আমি। আর কোন প্রমাণ দিতে পার কি?

উত্তর। হাঁ, আমাদের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে একখানা ঘোড়ার ছবি আছে।

এই ছবি কোন দিন আমার নজরে পড়ে নাই। যাহা হউক আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—ওখানে তুমি কেমন আছ ?

উত্তর। বেশ সুখে আছি।

আমি। আমাদিগকে ছাড়িয়া আছ বলিয়া কষ্ট হয় না কি ?

উত্তর। বাবা, অনেক সময়ই আমি তোমার কাছে থাকি। এখানে আমার দুই পিসির কাছে আমি আছি।

আমি। তাহাদের নাম বলিতে পার ?

পরিষ্কার ভাবে উত্তর হইল,—'সেজ'।

আমার দুই ভগিনী মারা গিয়াছেন। আমার তৃতীয়া ভগিনী আমার চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁহাকে আমি সেজদিদি বলিয়া ডাকিতাম। আমার ছেলের মৃত্যুর প্রায় এক মাস পূর্ব্বে তিনি মারা যান। তিনি আমার এই পুত্রকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি আমাদের বাটীতে বাস করিয়া ছিলেন। 'সেজ' কথাটি বাঙ্গালা ভাষায় সুস্পষ্ট শোনা গিয়াছিল।

তারপর চোঙ্গের মধ্য হইতে শব্দ হইল,—বাবা, শোক করিও না। মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই, কারণ আত্মা অমর। আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাই, কিন্তু মুখে বলিবার শক্তি আমার নাই। তুমি হাতে লিখিবার চেষ্টা কর তাহা হইলে অনেক কথা জানাইতে পারিব। পুনরায় যখন আসিবে কিছু ফুল আনিও, ফুলের আকর্ষণে আমরা শক্তি পাইতে পারি।

এই সময় নাদা জানাইল যে, তাহাদের শক্তি শেষ হইয়াছে।

কাজেই সে দিনের মত সিয়ান্সে বসা শেষ করিতে হইল। আমরা প্রায় এক ঘণ্টা সিয়ান্সে বসিয়াছিলাম।

আমার পুত্রের দেহত্যাগের তারিখ সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল সে দিন জুন মাসের ১৬ই তারিখ। বাসায় আসিয়া আমার ডায়েরী খুলিয়া দেখিলাম, ১৭ই জুনই ঠিক, সেই দিনই শনিবার,—১৬ই নহে। তখন আমার ধাঁধাঁ কাটিয়া গেল এবং বুঝিলাম আমার পুত্রের আত্মার কথাই ঠিক।

রাত্রিতে আমার ঘরে বসিয়া লিখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সফলতা লাভ করিতে পারিলাম না। কারণ হাত দিয়া লেখা বাহির হইবার সময় সন্দেহ হইতে লাগিল—ইহা আমার নিজের মনের ভাব, না অপর কেহ আমার দ্বারা লেখাইতেছেন? ইহা সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া এই চেষ্টা ত্যাগ করিলাম!

এইদিন সিয়ান্সে বসিয়া আমার পুত্রের সহিত অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিতে পারি নাই বলিয়া আমি সেরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। সেই জন্য ভাবিলাম আর এক দিন সিয়ান্সে বসিব এবং সেই দিন ফুলের শক্তি পরীক্ষা করিবার কথাও মনে হইল। সেই জন্য ১১ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন তিনটার সময় সিয়ান্সে বসা স্থির করিলাম। যথা সময়ে ইণ্ডিয়া অফিস হইতে রওয়ানা হইলাম এবং পথে একটী দোকান হইতে কিছু ভাল ফুল সংগ্রহ করিয়া হলাণ্ডপার্কে যাইয়া পৌঁছিলাম। সোসাইটির গৃহে প্রবেশ করিয়াই উপরে উঠিলাম। কুপারের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেই তিনি ফুলগুলি মেঝের উপর রাখিতে বলিলেন। আমাদের বসিবার স্থান হইতে কিছু দূরে ফুলগুলি রাখিয়া এবং ঘর অন্ধকার করিয়া আমরা সিয়ান্সে বসিলাম।

প্রথমেই নাদার স্বর শোনা গেল। সে বলিল,—মহাশয় আপনার সম্মুখে একটি সুন্দরী রমণী দাঁড়াইয়া আছেন।

ইনি যে কে তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় নাদা বলিল—এই রমণী আপনার কন্যা। তাঁহার সঙ্গে একটি সুন্দর ছোট ছেলেও আছে।

১৪ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যখন সর্ব্ব প্রথম বেরিবেরি রোগের প্রকোপ আরম্ভ হয় তখন আমার একটী কন্যার ঐ রোগে মৃত্যু হয়। সে দুইটী শিশুসন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছিল, কিন্তু কনিষ্ঠ সন্তানটী কিছুদিন পরেই তাহার অনুগমন করে। আমি আমার কন্যার আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে তাহার নাম বলিতে পারে কি না? নাদা বলিল, —পারে না, কারণ তাহার সে শক্তি নাই। শেষে বলিল,—তাহার নাম ছয় অক্ষরে এবং শেষ অক্ষর 'লা' (la)। আমার কন্যার নাম 'সুশীলা (Susila), ইংরেজিতে ছয় অক্ষরই বটে। তখন আমি আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি কোন স্তরে ও কেমন আছ?

উত্তর। চতুর্থ স্তরে বেশ সুখে আছি।

আমি। তোমার কোন নিদর্শন কি দেখাতে পার?

চোঙ্গের ভিতর হইতে কয়েক বার শব্দ হইল,—'বাইস'। ইহার অর্থ আমি তখন বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম হয়ত তাহার মৃত্যুকালীন বয়সের কথা উল্লেখ করিয়া থাকিবে। কিন্তু ঠিক কত বয়সে সে মারা যায় তাহা আমার স্মরণ ছিল না। চোঙ্গের মধ্য হইতে আবার শব্দ হইল—দেশে আমার স্বামীকে আমার ভালবাসা জানাইও।

সে দিন সিয়ান্সে যাইবার সময় এই কন্যার কথা একবারও আমার মনে হয় নাই।

আমার পুত্রের আত্মার সহিত আলাপ করিবার প্রবল ইচ্ছা

থাকিলেও গতবারে সিয়াম্সে সে প্রথমে আসে নাই। অদ্যকার সিয়াম্সে তাহার কথামত যখন ফুল লইয়া আসি, তখন মনে হইয়াছিল আজ সে নিশ্চয়ই সর্ব্বাগ্রে আসিবে। কিন্তু সে না আসাতে নাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমার পুত্রের আত্মা কি এখানে উপস্থিত আছে?

নাদা। হাঁ, সেই সুদীর্ঘ একহারা সুন্দর যুবকটি এখানেই আছে। তাহার সহিত তাহার বিশেষ বন্ধু অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণের একটি যুবকও এখানে রহিয়াছে।

তখন চোঙ্গের ভিতর দিয়া পূর্ব্ব পরিচিত স্বরে তিনবার উচ্চারিত হইল—Heart, Heart, Heart, অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ড।

নাদাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমার ছেলের কাছে যে যুবকটি দাঁড়াইয়া আছে সে কে এবং কবে মারা গিয়াছে? কারণ আমার পৌত্রের কথাই তখন আমার মনে হইতেছিল। নাদা বলিল,—যুবকটি আপনার পুত্রের মৃত্যুর পরে মারা গিয়াছে। অথচ আমার পৌত্র মারা গিয়াছিল আমার পুত্রের মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে। সুতরাং সে আমার পৌত্র হইতে পারে না।

আমার পুত্রের আত্মা আবার বলিল,—বাবা, তোমার জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত আছি এবং সর্ব্বদাই তোমার কাছে থাকি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি কি জড়দেহ ধারণ করিয়া আমাকে দেখা দিতে বা স্পর্শ করিতে পার?

সেই সময় আমার কপালে কয়েকটী আঙ্গুলের স্পর্শ অনুভব করিলাম। মনে হইল যেন একখানি হস্ত আমার কপাল ঈষৎ স্পর্শ করিয়া বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে টানিয়া লইল। অবশ্য বিবি কুপারের দক্ষিণ হস্ত উন্মুক্ত ছিল এবং এই হস্তের অঙ্গুলি আমার কপাল স্পর্শ করা সম্ভবপর হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার বাম হস্ত

আমি আমার দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধরিয়াছিলাম। সুতরাং বিবি যদি দক্ষিণ হস্তে আমার কপাল স্পর্শ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার দেহও সেই সঙ্গে সঞ্চালিত হইত। কিন্তু সেরূপ কিছুই আমি অনুভব করিতে পারি নাই। আবার আমার বাম হস্তেও অঙ্গুলির স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু এই হস্ত দিয়া আমি বাদ্যযন্ত্রের হাতল ধরিয়াছিলাম। সুতরাং কুপারের পক্ষে এই হস্ত স্পর্শ করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও, সে ইহা স্পর্শ করিলে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিতাম। এতদ্ভিন্ন আমার শরীরের নানা স্থানে কয়েকবার অঙ্গুলির ও চোঙ্গের মৃদু স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলাম। এই সময় চোঙ্গের ভিতর হইতে শব্দ হইল,—তুমি দেখিতে পাও এরূপ ভাবে দেহধারণ করিবার শক্তি আমার নাই। তবে আমার স্থায়ী আলোক তোমাকে দেখাইব। প্রকৃতই সেই সময় ঘরের মধ্যে আমার সম্মুখে স্থায়ী আলোকের কতকগুলি বিন্দু বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাইলাম। একটু দূরে মেঝের উপর যে ফুল রাখিয়াছিলাম তাহার মৃদু স্পর্শও আমার দক্ষিণ হস্তে অনুভব করিয়াছিলাম। আমি আমার পুত্রের আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমাকে কি কোন ফুল আনিয়া দিতে পার? তৎক্ষণাৎ আমার বোধ হইল কে যেন আমার হাতের মধ্যে ফুলের একটি পাপ্‌ড়ি আনিয়া দিল। সিয়ান্স শেষ হইলে দেখিলাম ঘরের মেঝের উপর যে চন্দ্রমল্লিকা ফুল রাখিয়াছিলাম তাহারই একটি পাপ্‌ড়ি আমার হাতে রহিয়াছে।

আমার ছেলের আত্মা বলিয়াছিল, রাত্রিতে আমাকে আবার তাহার স্থায়ী আলোক দেখাইবে। হোটেলে ফিরিয়া যাইয়া রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে ঐ আলোক দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতে পাই নাই। তখন শীতকাল ঘরে আগুন জ্বলিতেছিল এবং তাহারই শিখায়

ঘরটী বেশ আলোকিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই জন্যই আত্মার স্থায়ী আলোক দেখিতে পাই নাই।

২১শে ডিসেম্বর লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ৮ই জানুয়ারী কলিকাতায় পৌঁছিলাম। বাটীতে আসিয়া আমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইবা মাত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমার কন্যা সুশীলা কত বয়সে মারা যায়? তিনি বলিলেন,—বাইশ বৎসর বয়সে। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম আমার স্ত্রীর কথাই ঠিক। আমার পুত্রের আত্মা আমার বৈঠকখানা ঘরে যে ছবির কথা বলিয়াছিল সেই দুইটি ঘোড়ার ছবিও ঐ ঘরের এক কোণে দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বে কোন দিন এই ছবি দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হইল না।

আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস কেন হইল?

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনগুপ্ত পুলিশ সুপারিণ্‌টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিতেন। তিনি ১৯৩০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখে তাঁহার একমাত্র সন্তান 'অমিয়া' নাম্নী কন্যা ২৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করে। কন্যাকে হারাইয়া তাঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই বিশেষ কাতর হইয়া পড়েন এবং কন্যার আত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা জানিবার জন্য সুকুমার বাবু বিলাতে যান। এত দিন তিনি আত্মার অস্তিত্ব আদপে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বিলাতে যাইয়া সিয়ান্সে বসিয়া তিনি এমন অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছিলেন যাহার জন্য তাঁহার দীর্ঘকালের দৃঢ় বিশ্বাস একেবারে টলিয়া গেল। এই সকল

বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচর করিবার জন্ত তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাকে লিখিয়াছেন :—

দাদাবাবু! কি করিয়া পরলোক ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, তাহা আপনার "পরলোকের কথা" পুস্তকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, ইহাতে আমাদের প্রতি আপনার স্নেহ যে কত অধিক তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইলাম। সেই কাহিনী নিম্নে বলিতেছি।

আপনি জানেন শ্রীভগবান্ আমাদিগকে একটি মাত্র সন্তান দিয়াছিলেন। তাহার নাম রাখিয়াছিলাম "অমিয়া"। আমাদের অমিয়া ছিল রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। প্রকৃতই সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বগুণান্বিতা বালিকা আমার চক্ষে অতি কমই পড়িয়াছে। কেহ হয়ত বলিবেন যে, সে আমাদের একমাত্র সন্তান ছিল বলিয়াই আমরা তাহাকে ঐ ভাবেই দেখিতাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তাহার সেই সুন্দর সুশ্রী চেহারা, ঢলঢল আঁখিযুগল, হাসিমাখা মুখখানি, বিনয়নম্র স্বভাব, নিজজনের প্রতি ভক্তি ভালবাসা—সকলেরই স্নেহ ও প্রীতি বর্দ্ধন করিত। তাহার অঙ্কিত চিত্রাবলী যিনি দেখিয়াছেন এবং তাহার সুকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত যিনি শুনিয়াছেন তিনিই তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। এইরূপ কন্যারত্ন লাভ করিয়া, তাহাকে যথাযোগ্য সুপাত্রে অর্পণ করিয়া এবং একটি দৌহিত্র ও দুইটি দৌহিত্রী লাভ করিয়া আমরা সুখের সায়রে ভাসিতেছিলাম।

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর এইভাবে কাটিয়া যায়। কিন্তু ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই অমিয়ার দেহের অবস্থা দেখিয়া আমরা কিছু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। যকৃতের কাছে মাঝে মাঝে বেদনা হইয়া সে বড় কষ্ট পাইত। চিকিৎসা প্রথম হইতেই চলিতে লাগিল, কিন্তু উপকার

বিশেষ কিছু হইল না। মধ্যে মধ্যে এক বৃদ্ধা হিন্দুরমণী তাহাকে ঝাড়িয়া দিতেন। ইহাতে তাহার পেটের যন্ত্রণার কিছু লাঘব হইত বটে, কিন্তু তাহাও ক্ষণস্থায়ী। শেষে তাহার দেহত্যাগের দুই মাস পূর্ব্ব হইতে সুবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে তাহার চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। তিনি বিশেষভাবে পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত করিলেন যে, তাহার যকৃতে পাথুরী (Gallstone) হইয়াছে এবং শীঘ্রই উহা অস্ত্র করা কর্ত্তব্য। তাঁহারই কথামত বেলগাছিয়া কারমাইকেল হাঁসপাতালে একটি ক্যাবিন ভাড়া লইয়া অমিয়াকে সেখানে রাখা হইল। তাহার সেবার সুবন্দোবস্তের কোনরূপ ত্রুটি করা হইল না। আমার স্ত্রী সারারাত্রি অমিয়ার নিকট থাকিয়া সকালবেলা বাড়ী আসিতেন এবং আমিও দিনের মধ্যে দুই তিন বার যাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতাম। হাঁসপাতালে যাইবার ১৪।১৫ দিন পরে একদিন ললিতবাবু স্বহস্তে তাহার অস্ত্রোপচার করিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অস্ত্র করিবার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে আমাদের জীবনের আধার নয়নের মণি অমিয়া বৃদ্ধ পিতামাতা শিশু পুত্রকন্যা ও সর্ব্বগুণাধার স্বামীকে ফেলিয়া স্বধামে চলিয়া গেল।

অমিয়া অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা ছিল। হাঁসপাতালে যাইবার সময় সে তাহার প্রাণের ঠাকুরের একখানি ছবি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সেখানে রোগশয্যার শায়িত থাকিয়াও সে প্রত্যহ সেই ঠাকুরকে প্রণাম করিত এবং মনে মনে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিত। দেহত্যাগের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে সংজ্ঞালাভ করিল। সেই সময় ঠাকুরের ছবিখানি তাহার সম্মুখে রাখিয়া এক মন এক প্রাণে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া নাম জপ করিতে করিতে গোলোকের বস্তু গোলোকে

চলিয়া গেল। সেই সময় পিতামাতা পুত্রকন্যা কিম্বা স্বামী—কাহারও কথা সে একবারও মুখে আনে নাই।

অমিয়া আমাদের সমস্ত হৃদয়খানি জুড়িয়া ছিল। জীবনের অপরাহ্নে আমাদের একমাত্র চিন্তা ছিল কি করিয়া অমিয়াকে তাহার স্বামী ও সন্তানাদি সহ সুখসাচ্ছন্দ্যে রাখিয়া আমরা ইহজীবন ত্যাগ করিব। কিন্তু আমরা মলিন জীব, এই জড়জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই বিভোর ছিলাম, পরকালের কথা একবারও ভাবি নাই। সেই অপরাধেই বিধাতা বিমুখ হইলেন, আমাদের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আমাদের একমাত্র নয়ন-পুত্তলিকে চক্ষুর অন্তরালে লইয়া গেলেন।

অমিয়ার জন্য আমাদের মনের ব্যাকুলতা যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, কিছুতেই আমরা শান্তি পাইতেছিলাম না, সেই সময় আমার ছোটমামা রংপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত মহাশয়ের কথা আমার মনে হইল। তিনি বহুকাল হইতে আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া শেষে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। তখন আমরা পার্থিব সুখে এরূপ নিমগ্ন ছিলাম যে, পরকালের কথা এক বারও আমাদের মনে আসে নাই—আসিতে দিইও নাই। কিন্তু এখন এই নিদারুণ শোক পাইয়া আমাদের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, আমাদের মনের অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। তদুত্তরে তিনি যে অদ্ভুত কথা জানাইলেন তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

তিনি লিখিলেন,—অমিয়ার দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন তাহার ছায়ামূর্ত্তি আমাকে দেখা দিয়া প্রায় আধঘণ্টা অনেক কথা বলিয়াছিল। ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক কথাই অধিক। শেষে তোমরা পার্থিব বিষয় লইয়া বিভোর আছ বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল।

অমিয়ার এই গুরুতর পীড়ার কথা এবং অস্ত্র চিকিৎসার জন্য তাহাকে

যে হাঁসপাতালে আনা হইয়াছে তাহা ছোটমামা মোটেই জানিতেন না। তবে অমিয়ার ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মন বিচলিত হওয়ায়, তাহার সংবাদ জানিবার জন্য আমাকে টেলিগ্রাম করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যগতিকে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। যদি তিনি সে দিন টেলিগ্রাম করিতেন তাহা হইলে হয়ত অমিয়াকে অস্ত্র করা হইত না এবং হয়ত তাহার প্রাণরক্ষাও হইত। কিন্তু তাহা হইল না—বোধ হয় বিধাতার তাহা অভিপ্রেত ছিল না।

পরদিবস অমিয়ার মৃত্যুর পর ছোটমামা কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত এক সঙ্গে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। এমন সময় আবার তিনি অমিয়ার ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন এবং পাঁচ ছয় মিনিট কাল এরূপ বিভোরভাবে তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পাত হইতে কখন যে বিড়াল মাছ খাইয়া গেল তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিবস ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া মাতুল মহাশয় বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, অমিয়া সত্য সত্যই ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছে। কারণ অমিয়া তাহাকে তখন বলিয়াছিল যে, সে দেহত্যাগ করিয়া যাইতেছে এবং তিনি যেন তাহার পিতামাতা স্বামী ও সন্তানদিগকে দেখা শুনা করেন।

মাতুল মহাশয় সেই পত্রে আধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক কতকগুলি পুস্তকের তালিকা আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। আমি ইহার অনেকগুলি পুস্তক পড়িয়া পরলোক সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে আমার মনের ব্যাকুলতা কমিল না, বরং অমিয়ার আত্মার অস্তিত্ব প্রকৃতই আছে কি না তাহা জানিবার জন্য আমার মন আরও অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কলিকাতায় সাইকিক্যাল সোসাইটি বলিয়া যে

সমিতি ছিল তাহার অস্তিত্ব তখন লোপ পাইয়াছিল। কাজেই বিলাতে যাইয়া অমিয়ার সন্ধান লইবার জন্য আমার মন উতলা হইয়া উঠিল।

১৯৩১ সালের ২৫শে মে তারিখে একখানি ফরাসী জাহাজে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া একমাস পরে লণ্ডনে পৌছিলাম। সেখানে যাইয়া অনেক চেষ্টার পর মেরিলেবোন স্পিরিচুয়ালিষ্ট সোসাইটির (Marylebone Spiritualist Society) সন্ধান পাইলাম। এই আধ্যাত্মিক বিষয়ক সমিতিটি বহু প্রাচীন ও ইহার সুনামও আছে। আমি ইহার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়া প্রতি সপ্তাহে ইহার ছোট বড় সকল রকম অধিবেশনেই উপস্থিত হইতাম। ক্রমে ইহার সিয়ান্স গুলিতেও যোগদান করিতে লাগিলাম। এখানে কয়েক জন মিডিয়মের কার্য্যকলাপও লক্ষ্য করিলাম। ইহাদের মধ্যে বিবি এষ্টেলি রবার্টস্ (Estelle Roberts) নাম্নী মিডিয়মকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হইল। অবশ্য আমার সম্বন্ধে কোন দিন কোন কথা তিনি বলেন নাই। তবে অপর কয়েক জনের পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের চেহারার সঠিক বর্ণনা করাতে ও তাহাদের সম্বন্ধে অনেক গোপনীয় কথা বলাতে আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম।

ইহার কয়েক দিন পরে, অর্থাৎ ১৯৩১ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে, টমাস ওয়াইয়াট (Thomas Wyatt) নামক একজন মিডিয়ম একদিন প্রায় দুই শত লোকের মধ্যে আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—২৫।২৬ বৎসরের গৌরবর্ণা একটি বাঙ্গালী রমণী আপনার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য এখানে উপস্থিত আছেন। মিডিয়ম আরও বলিলেন যে, এই রমণীটি ঐরূপ বয়সে পেটের যন্ত্রণা সংক্রান্ত রোগে মারা যান। এই সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝিলাম আমার অমিয়াই

আসিয়াছে। মিডিয়ম আরও বলিলেন যে, এই রমণীর সঙ্গে একটি বৃদ্ধ পুরুষমানুষও সেখানে উপস্থিত আছেন। মিডিয়ম তাঁহার আকৃতির যে বর্ণনা করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে আমার পিতার আত্মা বলিয়াই বোধ হইল। মিডিয়মের দ্বারা তাঁহারা আমাকে জানাইলেন যে, তাঁহারা ভাল আছেন এবং আড়াই মাসের মধ্যে আমার এক কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তাঁহাদিগের সহিত যে কথাবার্ত্তা হইল তাহাতে প্রমাণযোগ্য বিশেষ কোন কথা না থাকিলেও, উহা সে সময় ক্ষণকালের জন্যও আমাকে বিচলিত করিয়াছিল। বিশেষতঃ আমার কন্যার ও পিতার চেহারার কথা ও অমিয়ার মৃত্যুর কারণ যাহা মিডিয়ম বলিলেন তাহা অনেকটা মিলিয়া যাওয়ায় আমার পূর্ব্বের ধারণা কতকটা শিথিল হইয়া গেল। ইহার ফলে এই সম্বন্ধে আরও জানিবার জন্য আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ইহার দুই দিন পরে, অর্থাৎ ৩০শে জুলাই তারিখে, সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় বিবি লিভিংষ্টোন নাম্নী স্পেনদেশীয় একজন মিডিয়মের সহিত আমরা দশ জন চক্রে বসিলাম। মিডিয়ম আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—কোন ভারতবর্ষীয় লোকের আত্মা বলিতেছেন যে, আড়াই মাস পরে আপনাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং সেখানে যাইয়া আপনি জনসাধারণের মধ্যে পরলোকতত্ত্ব প্রচার করিবেন।

এ কথা আমি তখন বিশ্বাস করিতে পারি নাই। সেই জন্য বাসায় ফিরিয়া নোটবহিতে লিখিয়াছিলাম, A ridiculous message was given to me to say that I would return to India soon and that I would have a lot to do for teaching spiritualism to humanity.

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ইহার দুই মাস কুড়ি দিন পরে প্রকৃতই

আমাকে বিলাত ছাড়িয়া মাতৃভূমির দিকে রওয়ানা হইতে হইয়াছিল। তৎপরে দেশে আসিয়াই কলিকাতা সাইকিক্যাল্ সোসাইটিকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য আমাদের কয়েক জনকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়। সুতরাং ঐ 'হাস্যাস্পদ' সংবাদটি ('ridiculous' message) সত্য সত্যই যে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহাহউক ৩০শে জুলাই তারিখের ঘটনার পরেই সংবাদ পাইলাম যে, আমেরিকা হইতে মিস্ হ্যাজেল রিড্‌লে (Miss Hazel Ridley) নাম্নী একজন বিখ্যাত মিডিয়ম লণ্ডনে আসিতেছেন, এবং এখানে ১০ কি ১২টি সিয়ান্সে বসিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। ১৭ই আগষ্ট হইতে সিয়ান্স আরম্ভ হইবে শুনিয়া আমি ২রা তারিখে ১১ শিলিং অর্থাৎ ৭ টাকা দিয়া এক খানি টিকিট খরিদ করিলাম।

শুনিয়াছিলাম মিস্ রিড্‌লে অসাধারণ শক্তিসম্পন্না মিডিয়ম। তখন ইহার বয়স ৩০।৩২ বৎসরের বেশী হইবে না, চেহারা দুর্ব্বল ও একহারা (delicate constitution)। অন্যান্য মিডিয়মদিগের ন্যায় তিনি চোঙ্গা (trumpet) ব্যবহার করেন না—মুখে কথা বলেন। ইহাদিগকে কথনশীল (Direct Voice) মিডিয়ম বলে।

১৭ই আগষ্ট তারিখে আমরা আট জন টিকিট কিনিয়া সিয়ান্সে যোগদান করিলাম। ইহার মধ্যে একমাত্র আমিই ভারতবাসী। মিস রিড্‌লে ইহার দুই দিন পূর্ব্বে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। তিনি মোটেই বাঙ্গালা জানিতেন না, আমাকেও তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই ও আমার বিষয় কিছুই জানিতেন না।

ঘর অন্ধকার, কেবলমাত্র একটী লাল আলো মৃদুভাবে আমাদের মাথার উপর জ্বলিতেছিল। তাহাতে আমরা সমস্ত জিনিষ ভাসা ভাসা দেখিতেছিলাম। ঘরটিতে একটী মাত্র দরজা ছিল তাহাও ভিতর হইতে

তালা দিয়া বন্ধ, জানালা আদপে ছিল না এবং দেওয়াল ভেদ করিয়া বাহিরের কোন শব্দ ঘরের মধ্যে আসিবারও সম্ভাবনা ছিল না।

চক্রে বসিবার পর একটী প্রার্থনা-সঙ্গীত হইল। তাহার কিছুক্ষণ পরে মিডিয়ম আবিষ্ট হইলেন ও চেয়ারে ঘাড় দিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি আমার ঠিক সম্মুখে বসিয়াছিলেন। আমাদের দুই জনের মধ্যে ব্যবধান সবেমাত্র ৪।৫ ফিট। সুতরাং আমি তাঁহাকে বেশ দেখিতেছিলাম। তখন তাঁহার মুখ দিয়া পুরুষ মানুষের মত মোটা গলায় উপস্থিত সকলকে অভিবাদন ও সতর্ক করা হইল।

তারপরেই উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনকে উদ্দেশ করিয়া কোথা হইতে যেন শব্দ হইল। ইহা মিডিয়মের মুখের কথা নহে,—কখন মেঝে হইতে, কখনও বা শূন্য হইতে কথা আসিতে লাগিল। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা বলা হইয়াছিল তাহার সহিত সেই অদৃশ্য শক্তির অনেক ঘরোয়া কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এইভাবে আরও ৩।৪ জনের সঙ্গে কথা হইবার পর আমার পালা আসিল।

মেঝে হইতে একটী অতি ক্ষীণ মিউ মিউ আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল। কিন্তু কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কি কথা বলা হইল তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। মিডিয়মের উপর যিনি ভর করিয়াছিলেন তিনি মিডিয়মের মুখ দিয়া বলিলেন,—আপনারা জিজ্ঞাসা করুন আত্মা কাহার সহিত কথা বলিতে চাহেন।

আমি বলিলাম,—তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলিতে চাও? তুমি কে?

তাহার উত্তরে কিছু স্পষ্টভাবে দূর হইতে ২।৩ বার শব্দ হইল,—'আমি অমিয়া' 'আমি অমিয়া'।

স্বর শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। বেশ বোঝা গেল যেন অনেক

চেষ্টা করিয়া কথা বলিতেছে। আর একটু নাকী সুর, সেই রকম ক্ষীণ সুর অমিয়ার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে হইয়াছিল।

আবার বলিল,—'আমি অমিয়া' 'আমি অমিয়া'। যেন অতি আগ্রহের সঙ্গে বলিতে লাগিল,—আমি অমিয়া, আমাকে চিনিতে পরিতেছ না?

আমি কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু তাহার স্পষ্ট জবাব পাইলাম না, যেন একটা ক্ষীণ গুন্‌গুনে (droning) আওয়াজ। কিন্তু স্বর যে অমিয়ার তাহাতে কোন সন্দেহই ছিল না। যে আত্মা ভর করিয়াছিলেন তিনি তখন মিডিয়মের মুখ দিয়া বলিলেন যে, অমিয়া এই ভাবে কথা বলিতে একেবারেই অভ্যস্ত নহে। বিশেষতঃ এই বিলাতি আবহাওয়ায় (European atmosphere) বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা বড় কঠিন। ২।৩ বার চক্রে আসিয়া চেষ্টা করিলে ক্রমে সে স্পষ্টভাবে কথা বলিতে পারিবে।

আমি বলিলাম,—যদি বাঙ্গালা কথা বলিতে কষ্ট হয় তাহা হইলে ইংরেজিতে সে আমার কথার উত্তর দিতে পারে। কিন্তু আমি বাঙ্গালায় প্রশ্ন করিব। শেষে তাহাই ঠিক হইল। সে চলনসহি ইংরেজি শিখিয়াছিল।

অমিয়া বলিল যে, প্রত্যহই সে আমার নিকট, তাহার মায়ের নিকট এবং তাহার স্বামী ও পুত্রকন্যার নিকট আসিয়া থাকে। সে বেশ সুখে আছে। প্রত্যহ এক মন্দিরে গিয়া সে পূজা করে, প্রত্যহ সঙ্গীত চর্চ্চা করে এবং সে সময় একটা ছবি আঁকিতে সে ব্যস্ত আছে।

অমিয়ার সঙ্গীতে যে অসাধারণ মেধা ছিল ও সে ছবি আঁকিতে পারিত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আমি যে দুই মাসের মধ্যে স্বদেশে ফিরিব এ কথা সেও বলিল।

তারপর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—মা আমার চুল লইয়া কি করিয়াছেন ?

এই কথার অর্থ প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি বলিতেছ বুঝিতে পারিলাম না। ইহার উত্তরে সে বলিল,—মাকে আমার চুলের জন্য তুমি লিখিয়াছ, কিন্তু তিনি তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তখন আমার মনে হইল একজন মিডিয়মকে দিয়া Psychometry করাইবার জন্য আমার স্ত্রীকে কয়েক দিন পূর্ব্বে অমিয়ার চুল ডাকে পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিলাম। এ কথা আমি কাহাকেও বলি নাই এবং অপর কেহই ইহা জানিত না। আমি তখন অমিয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম যে, সত্যই আমি তাহার মাতাকে এই জন্য পত্র লিখিয়াছি। তাহা শুনিয়া অমিয়া বলিল,—মা যদিও তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহা অন্য স্থান হইতে জোগাড় করিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমি ত দুই মাসের মধ্যেই লণ্ডন পরিত্যাগ করিব, তাহার পূর্ব্বে চুল এখানে কি পৌছিবে ? তদুত্তরে অমিয়া বলিল,—হাঁ, তাহার পূর্ব্বেই চুল আসিয়া পৌছিবে। প্রকৃতই আমার ভারতে যাত্রা করিবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে চুল পাইয়াছিলাম এবং তাহা দিয়া Psychometryও করা হইয়াছিল। তাহার তিন মাস পরে কলিকাতায় পৌছিয়া আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাঁহার নিকট যে চুল ছিল তাহা তিনি খুঁজিয়া পান নাই, সেইজন্য আমার জামাতার নিকট হইতে কিছু চুল লইয়া আমাকে পাঠাইয়াছিলেন।

আমার জীবনের ৫৪ বৎসর আমি পরলোকের কিম্বা আত্মার অস্তিত্বের বিষয় একদিনের জন্যও ভাবি নাই, ইহা জানিবার ইচ্ছাও আমার হয় নাই। অবশ্য পরলোক সম্বন্ধে ২।৪ খানা বই পূর্ব্বে

পড়িয়াছিলাম। তবে সে মনোযোগের সঙ্গে নহে,—ভাসা ভাসা ভাবে। কিন্তু তারপরই যখন আমাদের একমাত্র কন্যা আমাদের হৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া গেল, তখন আমাদের মনে হা হুতাশ জাগিয়া উঠিল, আমরা চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিলাম, অমিয়ার জন্য মনপ্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল আমাদের সেই একমাত্র অবলম্বন একমাত্র নয়নতারা অমিয়াকে আর কি দেখিতে পাইব না? হা ভগবান্! এ কি করিলে। তখন মহাত্মা শিশিরকুমারের 'কালাচাঁদ গীতা'র এই সুন্দর পদ দুইটি মনে পড়িল :—

যে মাত্র কেঁদেছি সরল অন্তরে।
'আছে' 'আছে' আশা হৃদয়ে সঞ্চারে॥
'আছে' 'আছে' ভাব মনে সঞ্চারিল।
কোন মতে তাহা ছাড়িতে নারিল॥

শ্রীভগবান্ যে আছেন, আর তিনি যে করুণার সাগর, এ বিশ্বাস এখন মনে দৃঢ় হইয়াছে। এখন জানিয়াছি আমার কণকপুত্তলি অমিয়া আছে এবং পরলোকে যাইয়া আবার আমরা সকলে মিলিত হইব।

মনোরঞ্জনের "আশা-প্রদীপ"

বরিশালের স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার নাম বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই জানেন। তিনি ১২৯৪ সালের আষাঢ় মাসে "আশা-প্রদীপ" নামে অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৩১২ সালের ১৮ই চৈত্র তারিখে ইহার দ্বিতীয়

অমিয়া
২৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন
৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সাল (ইং ২৩।১১।৩০

[পৃঃ—২২৬

জ্যোৎস্না
১৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন
১১ই কাত্তিক ১৩৩৮ সাল (ইং ১৮।১০।৩১)

[পৃঃ—২২৭

সংস্করণ বাহির হয়। এই পুস্তকের বর্ণিত ঘটনাবলী চাক্ষুষদর্শন করিয়া কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ সুশিক্ষিত ব্যক্তি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

(ক) বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত ১২৯৪ সালের ২৩শে আষাঢ় লিখিয়াছেন,—মিডিয়ম গোবিন্দ আমার বাসার লোক। তাহার বাড়ী আমার বাড়ীর নিকটে। সে ৩।৪ বৎসর আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহাকে লইয়া যে সকল অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে যে কোনপ্রকার কৃত্রিমতা আছে আমি কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করি না। ইহা কেবল অনুমান নহে, আমি তাহার উপর কঠিন পরীক্ষাও করিয়াছি। অজ্ঞান হইল কি না জানিবার নিমিত্ত একবার তাহার হাতের কোন স্থানে হঠাৎ এমন ভাবে অস্ত্র বসাইয়া দিয়াছিলাম যে, পরে রক্ত বন্ধ করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে তাহার হাতখানা একটুকুও কম্পিত হয় নাই। ইহা ভিন্ন আরও অনেকরূপ পরীক্ষা করিয়াছি। যাহা আত্মার আবির্ভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই অবস্থার ক্রিয়াকলাপ যে কোনরূপ রোগের শক্তি নহে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ঐ সময় মিডিয়মের শরীরের অবস্থা এমন হয় এবং সে এত আঘাত প্রাপ্ত হয় যে, অন্য কোন লোকের সেরূপ হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই তাহার শরীরে বেদনা থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার উপর যে আত্মা ভর করেন তিনি যাইবার সময় যেদিন বলিয়া যান,—আর বেদনা থাকিবে না, সে দিন ঘোরতর আঘাত পাইলেও কিম্বা কোন স্থান ফাটিয়া ফুটিয়া গেলেও মিডিয়ম চেতনালাভ করিয়া কিছুমাত্র বেদনা অনুভব করে না। মিডিয়ম ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছে এবং

তাহার ভাবভঙ্গি প্রভৃতি যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গোবিন্দের জিনিষ বলিয়া আমি কোনমতে বিশ্বাস করি না।

(খ) ব্রজমোহন ইন্‌ষ্টিটিউসনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সে সময় এই ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—গত বৎসর প্রায় তিনমাসকাল সার্কেলের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া আমার অন্তরে এই সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে যে, একদিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জয় ঘোষিত হইবে এবং ইহকাল ও পরকালের সম্বন্ধ ক্রমশঃই ঘনিষ্টতর হইয়া পড়িবে। যে বালকের (গোবিন্দের) উপর পরলোকগত আত্মার ভর হইত তাহার সহজ অবস্থায় তাহার নিকট যে সমস্ত সত্য উপদেশ ও সাধনাপ্রণালীর বাষ্পও অবগত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তাদৃশ জটিল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার যেরূপ আশাতীত সন্তোষজনক উত্তর আবেশ অবস্থায় তাহার নিকট প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তাহাতে এই ঘটনা গুলি প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সময়টুকু আমার ক্ষুদ্রজীবনের শুভমুহূর্ত্ত বলিয়া মনে করি।

(গ) সমগ্র বঙ্গদেশে সুপরিচিত বরিশালের মুকুটমণি পরমারাধ্য স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত লিখিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত তারিণীকুমার গুপ্ত ডাক্তার মহাশয়ের বাসায় পরলোকগত আত্মা সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা হইয়াছে তাহা আমি অনেক দিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া আমার ইহাই বিশ্বাস হইয়াছে যে, পরলোকগত আত্মার শক্তি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে।

(ঘ) যে কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি এই চক্রে যোগদান করিতেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত চন্দ্রনাথ দাস নামক অপর

অশ্বিনীকুমার দত্ত

৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

৭ই নবেম্বর ১৯২৩ সাল

পৃঃ—২২৯

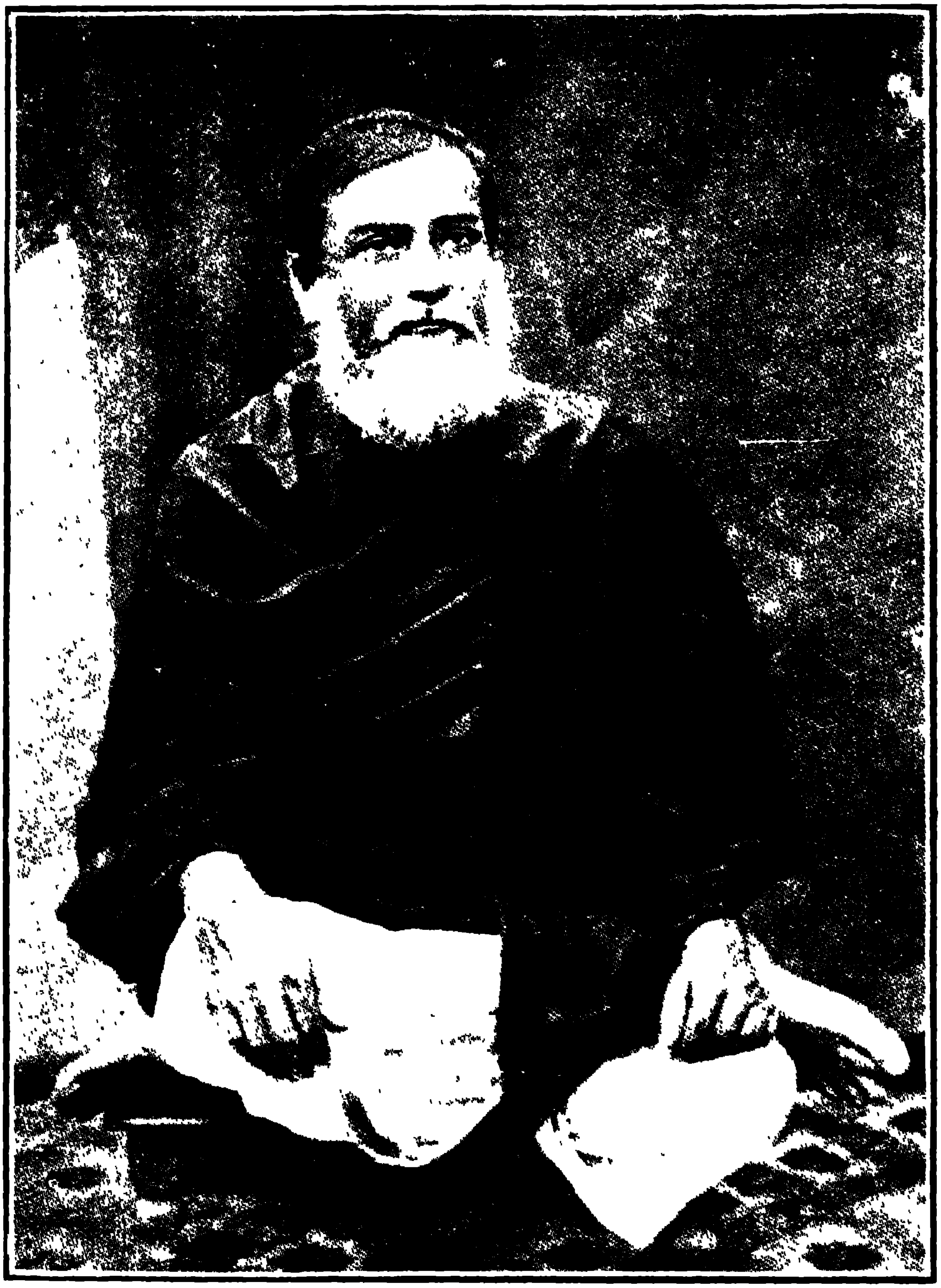

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২৪শে কার্ত্তিক ১৪৩৯ সাল (ইং ১০।১১।৩২)

[পৃঃ—২২৮

এক ব্যক্তিও ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে মনোরঞ্জন বাবু লিখিয়াছেন—চন্দ্রনাথ দাস মহাশয় সাংসারিক লোক হিসাবে উচ্চপদস্থ ছিলেন না বটে, কিন্তু চরিত্রবলে তিনি সমস্ত বরিশালবাসীর হৃদয়াসনে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি চক্র দেখিতে আসিলেন। সমস্ত ঘটনাগুলিই তাঁহার কেমন কেমন লাগিতেছিল। আমাদিগকে অবিশ্বাস করেন না বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত বসিয়া ছিলেন, নতুবা হয়ত জুয়াচুরী মনে করিয়া পূর্ব্বেই চলিয়া যাইতেন। তিনি বলিলেন,—যদি আমার উপর ভূতের ভর করাইতে পারেন তাহা হইলে এই সকল বিশ্বাস করিতে পারি। আমি বলিলাম,—চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। ইহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা চন্দ্রনাথবাবুর নিজ কথায় প্রকাশ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন :—

আগে আমি এ সকল বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু আমার উপর যে সমস্ত কাণ্ড হইল, তাহাতে আর অবিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম না বটে, কিন্তু কোন অলৌকিক শক্তিদ্বারা যে পরিচালিত হইয়াছিলাম তাহাতে সন্দেহ নাই। সে শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তি বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। কারণ কয়েকজন লোক ভগবানের নাম করিবামাত্র অমনি সে শক্তি আমাকে ছাড়িয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় একজনের মনের ভাব অপরের প্রকাশ করিয়া বলা এক প্রকার অসাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, শত শত উপদেশ কি অন্য উপায় দ্বারা আমার যে উপকার না হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আমি সেই উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইহা যে পরলোকগত আত্মার কার্য্য ইহাও আমার বিশ্বাস হইয়াছে।

উল্লিখিত এবং তাঁহাদের চক্রের অন্যান্য ঘটনা যাহা মনোরঞ্জন

বাবু তাহার "আশা-প্রদীপ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই তাঁহাদের সম্মুখে ঘটিয়াছিল। মনোরঞ্জন বাবু নিজেও ভাল মেস্‌মেরাইজ করিতে পারিতেন।

আমার হারাণো মেয়ে 'জ্যোৎস্না'

কলিকাতা বেলেঘাটা ১২৯নং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড হইতে শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন :—

আমার একমাত্র কন্যা জ্যোৎস্না বিগত ১৩৩৮ সালের ১১ই কার্ত্তিক তারিখে আঠার বৎসর বয়সে আমাদিগের হৃদয়ে শেল হানিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছে। তখন সে বরিশালে ব্রজমোহন ইনেষ্টিটিউসনে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিল। তাহাকে হারাইয়া আমরা গোষ্ঠীসমেত জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সর্ব্বদা হা হুতাশ ভাব। সদাই মনের মধ্যে সেই এক চিন্তা—আর কি তা'কে পাব? আবার কি তা'কে দেখে হৃদয় জুড়াবে?

তখন মনে পড়িল খুলনা সেনহাটী নিবাসী হাইকোর্টের এডভোকেট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভার্য্যার কথা। তাঁহার ন্যায় উৎকৃষ্ট মিডিয়ম আজকাল এদেশে অতি বিরল। পরলোকগত আত্মাদিগকে যখন তখন দেখিতে, তাঁহাদের সহিত সহজভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে, তাঁহাদের কথা শুনিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিতে, তাহাদিগের নিকট হইতে সংবাদ আনিয়া শোকসন্তপ্ত নিজজনদিগকে দিতে, তিনি সিদ্ধহস্ত—অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি এখন বৃদ্ধা, বৃদ্ধা হইলেও হিন্দুরমণী, কাজেই তাঁহার দর্শনলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

তাঁহাকে আমার জ্যোৎস্নার কথা সব লিখিলাম, সে কোথায় কিভাবে আছে জানিতে চাহিলাম। জ্যোৎস্নাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাহাও তাঁহার নিকট পাঠাইলাম এবং জ্যোৎস্নার নিকট হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যদি সম্ভবপর হয় তাহাও আনিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম।

ইহার কয়েকদিন পরে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রী আমার পত্রের উত্তর দিলেন এবং আমার পত্রের উত্তরে জ্যোৎস্না যে পত্র দিয়াছিল তাহাও পাঠাইলেন। তিনি লিখিলেন,—জ্যোৎস্নার যে পত্র পাঠাইলাম ইহা তাহার কথামত আমিই লিখিয়াছি। যাঁহারা জ্যোৎস্নাকে ভাল রকম জানিতেন ও তাহার সহিত সর্ব্বদা মেলামেশা করিতেন, তাঁহারা বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর প্রেরিত এই পত্র পড়িয়া নিশ্চয় বলিবেন যে, ইহা জ্যোৎস্নারই পত্র। কারণ তাহার লেখায় এবং কথাবার্ত্তার ভাব ও ভাষায় একটু বিশেষত্ব ছিল।

এই পত্র প্রাপ্তির পর আমার কনিষ্ঠভ্রাতা ব্রজমোহন ইনেষ্টিটিউসনের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রীমান্ অমৃতলাল কলিকাতা গিয়াছিলেন। সেই সময় বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়া জ্যোৎস্না ও তাহার পত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রী বলেন যে, জ্যোৎস্নার মাথায় একরাশী কোঁকড়া চুল ও তাহার পরিধানে লালপেড়ে গেরুয়া বসন। বঙ্কিমবাবুর স্ত্রী জ্যোৎস্নাকে জানিতেন না, অথচ জ্যোৎস্নার সম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা বলিলেন সমস্তই মিলিয়া গেল।

বঙ্কিমবাবুর স্ত্রী অমৃতলালকে বলিলেন,—জ্যোৎস্না তাহার পিতার পত্রের উত্তরে আমার দ্বারা যে পত্র লেখাইয়াছিল তাহাতে সে তাহার পিতাকে 'আপনি' না বলিয়া বরাবর 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করে। এরূপ

করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জ্যোৎস্না বলে যে, সে বরাবরই 'তুমি' বলিয়া তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া থাকে। [এ কথা ঠিকই। সে আমাকে বরাবরই 'তুমি' বলিত, কখনও 'আপনি' বলে নাই।]

তিনি আরও বলিলেন,—জ্যোৎস্না এরূপ দ্রুতবেগে তাহার বক্তব্য বলিয়া যাইতেছিল যে, তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া যাওয়া অনেক সময় আমার পক্ষে সুকঠিন হইতেছিল। [এ কথাও ঠিক। আমার কন্যা শৈশব হইতেই ত্র্যস্তভাবে কথা বলিতে অভ্যস্ত ছিল। এ কথা বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।]

আমার কন্যার মৃত্যুর দুইমাস পরে অর্থাৎ ১৯৩১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বরিশালের ডাক্তার সুধীরকুমার চৌধুরী বলিলেন,—আপনারা চক্রে বসিয়া আত্মাদিগের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলাপ পরিচয় করেন না কেন? কি ভাবে চক্রে বসিতে হয় তাহাও তিনি বলিয়া দিলেন।

পরদিন অর্থাৎ ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্রের স্ত্রী পারুল ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ অমৃতলালের কন্যা সুষমাকে লইয়া আমি চক্রে বসিলাম। সেই দিনই আমাদের চক্রে আত্মার আবির্ভাব হইল। ইহাতে আমাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

সেই দিন হইতে আমরা প্রত্যহ চক্রে বসিতে লাগিলাম এবং আমার কন্যা জ্যোৎস্নার আত্মাকে আহ্বান করিয়া তাহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা ও পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা হইতে লাগিল। এই ভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেলে একদিন আমার কনিষ্ঠভ্রাতা অমৃতলাল বলিলেন,—জ্যোৎস্নার আত্মার অস্তিত্ব পরীক্ষার জন্য কয়েকটী প্রশ্ন করিতে চাই। আমার কিন্তু ঐরূপ প্রশ্ন করিতে আদপে ইচ্ছা ছিল না।

কারণ আমার ভয় হইতেছিল এইরূপ ভাবে পরীক্ষা করিতে যাইয়া আমার জ্যোৎস্নাকে আবার বা হারাই, পাছে ইহাতে বিরক্ত হইয়া সে আমাদের চক্রে আর মোটেই না আসে। কিন্তু অমৃতলালের বিশেষ অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে অগত্যা ইহাতে রাজি হইতে হইল।

রাত্রি ১১টার সময় আমরা চক্রে বসিলাম, এবং ক্রমে জ্যোৎস্নার আত্মাকে আহ্বান করিয়া আনাইলাম। এই চক্রে অমৃতলাল উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারই কথামত আমি প্রশ্ন করিতে লাগিলাম।

প্রশ্ন। তুমি যে আমাদের চক্রে আসিয়া থাক তাহা আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু তোমার মা উহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তুমি কি এরূপ কোন প্রমাণ দিতে পার যাহাতে তোমার মা'র বিশ্বাস হয় যে তুমি প্রকৃতই আসিয়া থাক?

উত্তর। হাঁ দিতে পারি।

প্রশ্ন। তুমি কি বলিতে পার তোমার ছোট ভাই ঝুণ্ট তোমার মা'র কোন্ পাশে শুয়ে আছে?

উত্তর। মা'র বাঁ পাশে।

এই কথা শুনিয়া অমৃতলাল তখনই ইহা পরীক্ষা করিতে গেলেন। তখন আমার স্ত্রী ঝুণ্টকে লইয়া ঘুমাইতেছিলেন। ঘর অন্ধকার ছিল। অমৃতলাল যাইয়া তাহার বৌদিদিকে ডাকিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঝুণ্ট তাঁহার কোন দিকে শুইয়া আছে? তিনি বলিলেন,—বাঁ দিকে। কাজেই জ্যোৎস্নার কথা ঠিক হইল।

তারপর জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট পাওয়া যাইতেছে না। উহা কোথায় আছে বলিতে পার?

উত্তর। আমার বাক্সের মধ্যে আছে।

প্র। কোন্ বাক্সে ?

উ। আমার রাইটিং বাক্সে।

তৎক্ষণাৎ ঐ বাক্স খুলিয়া তাহার মধ্যে ঐ সার্টিফিকেট পাওয়া গেল।

প্র। তোমার চোখের অসুখ হ'লে তুমি অমৃতলালের নীল চশমা ব্যবহার করিতে। তাহা কি ফিরা'য়ে দিয়েছিলে ?

উ। হাঁ দিয়াছিলাম।

প্র। উহা পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় আছে জান ?

উ। না।

প্র। খোঁজ করে দেখে বল না ?

উ দেখ্‌ছি। (কিছুক্ষণ পরে) আলমারীর মধ্যে আছে।

আলমারী খুলিয়া উহা পাওয়া গিয়াছিল।

একদিন আমার বন্ধু মিঃ পি কে জির সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি একজন ভাল মিডিয়ম। তিনি দেহবিমুক্ত আত্মা দেখিতে ও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন। তিনি বলিলেন,—দেখিলাম, জ্যোৎস্না একটু খোঁড়াইয়া হাটে। আমি তখন উহা অস্বীকার করিয়াছিলাম, কিন্তু পরে আমার স্মরণ হইল যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার এক পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে একটা ক্ষত হইয়াছিল। আমার এই বন্ধু জ্যোৎস্নার জীবদ্দশায় কখন তাহাকে দেখেন নাই।

আমরা বরিশালে নিয়মমত চক্রে বসিতাম। পরে কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসি। এখানে আসিয়াও চক্রে বসিয়া থাকি। কলিকাতায় একদিন রাত্রি ৮।৯ টার সময় চক্রে বসিয়া আমার পরলোকগতা প্রথমা স্ত্রীর ও জ্যোৎস্নার আত্মাকে আহ্বান করিয়া

আনিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগকে সেই রাত্রির মধ্যেই বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলাম। তাহাদিগকে জানাইলাম যে, পরদিবস বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর সহিত আমি সাক্ষাৎ করিয়া এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিব। পরদিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আপনিই বলিলেন,—গতরাত্রে আপনার স্ত্রী ও কন্যার আত্মা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। অন্যান্য দিন যখনই তাহারা আমাকে দেখা দিয়াছে, তখনই তাহাদিগকে উচ্চস্তরের অন্যান্য আত্মার ন্যায় উজ্জ্বল দেখিয়াছি, কিন্তু গত রাত্রে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত মলিন দেখিলাম। তাহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোৎস্না বলিল,—বাবা কাল যখন আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া আমাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন তখন যদি শোনেন যে আপনি আমাদিগের দেহ অতি উজ্জ্বল দেখিয়াছেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি উহা আদপে বিশ্বাস করিবেন না। সেইজন্য জড়জগতে থাকিতে আমাদের চেহারা যেরূপ ছিল ঠিক সেইভাবেই আপনাকে দেখা দিলাম।

আমরা এখনও নিয়মমত চক্রে বসি। অনেক শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি আমাদের চক্রে যোগদান করিয়া তাঁহাদিগের পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের সংবাদ পাইয়া অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কারণ

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভৌতিক ঘটনার কথা শুনা যায়। আমাদের দেশেও এইরূপ ঘটনা যে কত শত ঘটিতেছে তাহা বলা যায় না। এদেশে কাহারও উপর প্রেতাত্মার ভর হইলে আমরা সে সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান করি না, বরং যাহাতে কেহ উহা জানিতে না পারে তাহাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য হয় এবং সেইজন্য প্রেতাত্মাকে যাহাতে শীঘ্র তাড়াইতে পারা যায় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এই কার্য্য করিতে যাইয়া, যাহার উপর আত্মার ভর হইয়াছে তাহাকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করা হইয়া থাকে। আমরা ভাবি যত যন্ত্রণাই দেওয় হউক না কেন, যে প্রেতাত্মা ভর করিয়াছে সেই ইহা ভোগ করিবে,—যাহার উপর ভর করিয়াছে তাহার কোন কষ্টই হইবে না। আমাদের এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কত শত ব্যক্তি যে দারুণ আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, এবং কত জন যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা বলা যায় না।

ইউরোপ ও আমেরিকাতেও অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উপর এইরূপ অত্যাচারের কথা শোনা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের চক্ষুর উপর যে সকল ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে তাহা তাঁহারা অনুসন্ধান করেন এবং এই অনুসন্ধানের ফল মন্তব্য সহ লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করেন।

প্রেতাত্মার আবির্ভাব বিষয়ক যে সকল ঘটনা আমরা দেখিতে ও

শুনিতে পাই কিম্বা পাঠ করি তাহাতে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইবার অনেকগুলি কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটী নিম্নে প্রকাশ করিতেছি ঃ—

(১) ইহজগতে যাহারা দুর্নীতিপরায়ণ এবং আসক্তি যাহাদের অত্যন্ত প্রবল, দেহত্যাগ করিয়াও তাহারা সেই স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। কাজেই প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া তাহারা সূক্ষ্মদেহে এই জগতে বিচরণ করে এবং সুবিধামত কোন মানবদেহ আশ্রয় করিয়া আপন আপন ভোগলালসা মিটাইবার চেষ্টা করে।

(২) মৃত্যুর পর যাহারা সদ্গতি প্রাপ্ত না হয় তাহারা আপনাদের উদ্ধারের জন্য অনেকস্থলে আত্মীয়স্বজনের ও কখনও বা অপরের সাহায্য পাইবার আশায় তাহাদের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আপনাদের অস্তিত্ব জানাইবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে।

(৩) কোন কোন সধবা রমণীর মৃত্যুর সময় তাঁহার কষ্টের প্রধান কারণ এই হয় যে, পাছে তাঁহার স্বামী আবার বিবাহ করেন। এইজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন কোন রমণী স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে নিষেধ করেন। আবার কাহার মনে এই ভাবের উদয় হইলেও তিনি উহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর যদি স্বামী পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সেই মৃতা স্ত্রী জড়জগতে আসিয়া অলক্ষিতভাবে বিবাহ পণ্ড করিবার চেষ্টা করেন। আর বিবাহ হইয়া গেলে সতীন বা স্বামী কিংবা পরিবারস্থ অপর কাহাকে নির্য্যাতন করিতে থাকেন। ইহার ফলে পরিবার মধ্যে নানাপ্রকার অশান্তি ও দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়।

(৪) ইহজগতে সন্তান, স্বামী, স্ত্রী কিংবা অপর কোন ব্যক্তির

উপর আসক্তি থাকিলে, মৃত ব্যক্তির আত্মা অদৃশ্যভাবে এবং কখনও বা দেহধারণ করিয়া আসিয়া নিজজনের সঙ্গ করিয়া থাকেন।

এইরূপ ঘটনার অভাব নাই। কিন্তু এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইলে আমরা তাহা প্রকাশ করি না, বরং সেই প্রেতাত্মাকে দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এই কারণে অনেক ঘটনা গোপনেই থাকিয়া যায়। বহু চেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফলে এই প্রকারের যে সকল বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম।

এক মৃতা স্ত্রীলোক নিজজনদিগকে স্বপ্নে দেখা দিয়া আপনার সদ্‌গতির জন্য গয়ায় পিণ্ড দিতে বলেন। স্বপ্ন অলীক ভাবিয়া আত্মীয়েরা ইহা গ্রাহ্য করেন না। এই সময় নিজজনদিগের মধ্যে কয়েকজন পীড়িত হয়। তখন সেই মৃতা রমণী পুনরায় স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে, পিণ্ড না দিলে পীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রাণের হানি হইবে। শেষে ২।৩ জন মারাও যায়। তখন ভীত হইয়া গয়ায় পিণ্ড দেওয়া হয়। তারপর আর কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

রামশঙ্কর বাবুর পরলোকে বিশ্বাস

রায়বাহাদুর রামশঙ্কর সেন ৬০ বৎসর পূর্ব্বে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গিরিজাশঙ্কর ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিবার কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। মৃতদার অবস্থায় কিছুদিন গত হইলে গিরিজাশঙ্কর এক দেশীয় খৃষ্টান রমণীর প্রেমে পতিত হন। তাঁহার পিতামাতা এই কথা শুনিতে পাইয়া

পুত্রকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক করিয়া বুঝাইতে থাকেন এবং কোন শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স্থা হিন্দুকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু পুত্র কিছুতেই সম্মত হন না। তিনি সেই খৃষ্টান রমণীর নিকট যে বাগদান করিয়াছেন তাহা কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারিবেন না, সুতরাং তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিবেন,—এই কথা বলিয়া পিতামাতাকে নিরস্ত করেন।

ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য গিরিজাশঙ্কর স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিতেন। একদিন অপরাহ্নে তিনি ভাবী পত্নী ও তাঁহার ভগিনীদ্বয়কে তাঁহাদের পিত্রালয় হইতে সঙ্গে লইয়া, নিজের বগি গাড়ীতে ইডেন উদ্যানে বেড়াইতে যান। সেখানে কিছুকাল সান্ধ্যবায়ু সেবন ও গল্পগুজব করিয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিবার জন্য বাগানের বাহিরে আসেন। তারপর সকলে গাড়ীতে উঠিবামাত্র, ঘোড়া—যেন কিছু দেখিয়া—হঠাৎ ভয়ে লাফাইয়া উঠে এবং গাড়ী লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে। পথিমধ্যে ল্যাম্পপোষ্টে ধাক্কা লাগিয়া গাড়ী উল্টাইয়া যায় এবং তাঁহারা সকলেই গাড়ী হইতে পড়িয়া যান। গিরিজাশঙ্কর ও তাঁহার ভাবী ভার্য্যা গুরুতর আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অপর রমণীদ্বয় কিছুমাত্র আঘাত পান না। সেই অবস্থায় গিরিজাশঙ্করকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে ও রমণীদিগকে তাঁহাদের পিত্রালয়ে লইয়া যাওয়া হয়।

আমার খুল্লতাত স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রায়বাহাদুর রামশঙ্কর সেন ও তাঁহার পুত্র গিরিজাশঙ্করের সহিত আমার পিতা ও পিতৃব্যদিগের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রত্যহই গিরিজাশঙ্করের খোঁজখবর লইতেন। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহার

জ্ঞানসঞ্চার না হওয়ায় চিকিৎসকেরা চিন্তিত হইলেন এবং কোনরূপ আশাভরসা দিতে পারিলেন না। কিন্তু ৪।৫ দিন পরে হঠাৎ একদিন গিরিজাশঙ্কর দিব্য চৈতন্যলাভ করিলেন। ইহা দেখিয়া চিকিৎসকেরা বলিলেন,—যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে তখন আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেই রাত্রেই গিরিজাশঙ্কর মারা গেলেন।

এই ঘটনার পর একদিন মতিবাবু রায়বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে রামশঙ্করবাবু অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেও দুর্ব্বলতার জন্য তখনও তাঁহার শয়নকক্ষের বাহিরে যাইবার মত অবস্থা হয় নাই। কাজেই মতিবাবুকে সেই ঘরে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইল।

পুত্রশোকে বৃদ্ধপিতার অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়াছে তাহার একটি চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া লইয়া এবং সেইভাবে বিভাবিত হইয়া মতিবাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু রামশঙ্করবাবুর প্রশান্ত ও উদ্বেগশূন্য মুখের ভাব দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। অপরপক্ষে মতিবাবুকে অত্যন্ত বিচলিত হইতে দেখিয়া রামশঙ্করবাবু স্থির ও ধীরভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনাসূচক বাক্য বলিতে লাগিলেন।

শেষে বলিলেন,—দেখ মতি, এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি সারাজীবনটা আমার কিরূপ বৃথায় কাটিয়াছে। তুমি জান, আমি গিরিজাকে কত ভালবাসিতাম, আর তাহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া কত কষ্ট পাইয়াছি। তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে এই নিদারুণ ঘটনা আমার মনে এমন একটা ভাব আনিয়া দিয়াছে যে, শোকে আমাকে আদপে অভিভূত করিতে পারে নাই; বরং এই ঘটনা দ্বারা আমার মনের সমস্ত অন্ধকার একেবারে দূর হইয়াছে।

আমি এতদিন একরূপ নাস্তিক ছিলাম, শ্রীভগবানের দয়ার উপর আমার কোন বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি আমাদের উপর তাঁহার করুণার সীমা নাই। ইহা মনে করিয়া আমি যে কত শান্তি ও কত আনন্দ পাইতেছি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল মরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া থাকে, কিন্তু এখন আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি আমার গিরিজা আছে, আর সে তাহার পতিপ্রাণা স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দেখ মতি, মৃত্যুর পর যদি আমাদের অস্তিত্ব থাকে এবং পরলোকে প্রিয়জনের সঙ্গে আবার মিলন হয় তাহা হইলে শোক করিব কেন? ইহা অপেক্ষা শ্রীভগবানের আর অধিক দয়া কি হইতে পারে? শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিরা মনের অস্থিরতার জন্য তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে কিরূপ করুণাময় ও কত দয়ার সাগর তাহা গিরিজার এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তারপর গদগদস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে আপনা আপনি বলিলেন,—এতদিন মোহে কতই না আচ্ছন্ন ছিলাম!

মতিবাবু লিখিয়াছেন,—রামশঙ্করবাবুর এই পরিবর্ত্তন কেন হইল তাহা বুঝিতে না পারিয়া উৎসুক হইয়া আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তখন রামশঙ্করবাবু আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া চক্ষু মুছিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,—আসল কথা এখনও বলা হয় নাই। এখন বলিতেছি শোন। গিরিজা গাড়ী হইতে পড়িয়া গুরুতর আঘাত পাইয়াছে ও অজ্ঞান হইয়া আছে, এই কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া শরীর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, আমি চারিদিকে আঁধার দেখিতে লাগিলাম এবং বোধ হইল তখনই বুঝি আমার প্রাণ বাহির হয়। ক্রমে আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম এবং সেই অবস্থায় এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি

দেখিতে পাইলাম। তিনি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন,—শ্রীভগবান্ দয়াময় এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুখী হও। আর তোমার ছেলের জন্যই বা কাঁদিবে কেন? তিনি ত ভালস্থানেই যাইতেছেন। এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্ধান হইলেন।

ইহা কি স্বপ্ন? তাহাই বা বলি কি করিয়া, কারণ তাঁহার কথা শুনিয়া আমি যেন নবজীবন লাভ করিয়াছি। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি মনে আর কোন উদ্বেগ নাই, কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মনপ্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। গিরিজার আরোগ্যলাভের কোন আশা নাই জানিয়াও আমি এই আনন্দ উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই নাই।

এদিকে গিরিজাশঙ্করের অবস্থা ক্রমে আরও অধিক খারাপ হইয়া পড়িল। নিজের দেহ দুর্ব্বল বলিয়া আমি ঘরের বাহিরে যাইতে পারিতাম না, কিন্তু আমার স্ত্রী প্রায়ই গিরিজাকে দেখিতে যাইতেন। রাত্রিতে এক পুরাতন ভৃত্য তাহার সেবাশুশ্রূষা করিত। একদিন এই লোকটি আসিয়া বলিল,—হুজুর! আমার ভয় হচ্ছে বুঝি বা দাদাবাবু আর ভাল হ'বেন না। এ কথা বলিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—বৌঠাকুরুণ ত মারা গিয়েছেন, কিন্তু দেখ্‌তে পাই রাত্রিতে অনেক সময়ই তিনি দাদাবাবুর কাছে বসে আছেন। ইহা আমার মনের বা চোখের ধাঁধাঁ নয়, তাঁকে বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই এবং বোধহয় তিনি যেন দাদাবাবুর সেবা কর্‌ছেন ও তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌ছেন, অথচ দাদাবাবু অজ্ঞান হয়েই পড়ে আছেন।

রামশঙ্করবাবু বলিতে লাগিলেন,—অচেতন হইবার পাঁচছয় দিন পরে যেদিন গিরিজা সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছে দেখিয়া চিকিৎসকেরা

বলিলেন যে, এইবার বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, ঠিক সেই সময় গিরিজার ভাবী স্ত্রী সেই খৃষ্টান মহিলার নিকট হইতে সংবাদ লইয়া লোক আসিল। সে বলিল যে, তখনও সেই খৃষ্টান রমণীর জ্ঞান হয় নাই। এই অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—আমি যাহা বলি মন দিয়া শোন, আর সেই সব কথা রায়বাহাদুরকে জানাইয়া এস। ইহাই বলিয়া সংবাদবাহক খৃষ্টান রমণীর কথাগুলি এইভাবে বিবৃত করিল:—

খৃষ্টান রমণী বলিলেন,—আমি দেখিলাম যেন অপর এক জগতে গিয়াছি। সেখানে অনেক লোক রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি হিন্দুরমণী আপনাকে গিরিজাবাবুব স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলেন। তারপর আমি তাঁহার স্বামীকে বশ করিয়া বিবাহ করিবার মতলব করিয়াছি এবং একজন হিন্দুকে খৃষ্টান করিয়া তাঁহার আত্মাকে কলুষিত করিতে যাইতেছি,—এই সব কথা বলিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন যে, আমার কবল হইতে তাঁহার স্বামীকে উদ্ধার করিবার সকল রকম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং তিনি আমাকে নিশ্চয় বিবাহ করিবেন বুঝিতে পারিয়া, আমাদের এই বিবাহ পণ্ড করিয়া তিনি তাঁহার স্বামীর আত্মার সদ্‌গতির জন্য এক ভীষণ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সেদিন যখন গিরিজাবাবু আমাদের তিন ভগিনীকে লইয়া ইডেন উদ্যানে বেড়াইতে যান, সেই সময় তিনি (গিরিজাবাবুর স্ত্রী) সেই গাড়ীর অনুসরণ করেন এবং আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া গেলে তিনি গাড়ীর কাছে থাকিয়া অপেক্ষা করেন। আমরা বাগান হইতে ফিরিয়া গাড়ীতে উঠিবার পর, যেই গিরিজাবাবু ঘোড়ার লাগাম হাতে লইলেন অমনি তাঁহার মৃতা স্ত্রীর আত্মা ঘোড়াকে এরূপ ভয় দেখাইলেন যে, ঘোড়া হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া গাড়ীসহ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। ইহার

ফলে আমরা সকলেই গাড়ী হইতে পড়িয়া গেলাম। হিন্দুরমণী বলিলেন যে, আমাদের কাহারও প্রাণের হানি করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তবে, তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, আমার এরূপ অঙ্গহানি ঘটাইবেন যাহাতে আমাদের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া একেবারে অসম্ভব হইবে।

আমার ভগিনীদের উপর তাঁহার কোন আক্রোশ ছিল না, সুতরাং তাহারা কোনরূপ আঘাত পায় নাই। তারপর তিনি বলিলেন যে, আমার কোনরূপ অঙ্গহানি হইবে না এবং আমি আরোগ্যলাভ করিব জানিয়া তিনি সুখী হইয়াছেন। তাঁহার স্বামীকে আমি দখল করিতেছিলাম বলিয়াই আমার উপর তাঁহার ক্রোধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর আমার প্রতি তাঁহার সে ভাব নাই, কারণ এখন তিনি নিশ্চয় জানিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামীর বাঁচিবার আর কোন সম্ভাবনাই নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, অদ্য তাঁহার স্বামী জ্ঞান লাভ করিবেন এবং তখন মনে হইবে তাঁহার জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, রাত্রের মধ্যেই তাঁহার আত্মা দেহত্যাগ করিবে। স্বামীকে পুনরায় পাইবেন বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনাটী বর্ণনা করিয়া শেষে রামশঙ্করবাবু বলিলেন,—এই সব কথা যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা তুমি জান, কারণ গিরিজা সম্পূর্ণ চেতনালাভ করিয়াছিল এবং উহার কয়েক ঘণ্টা পরেই মারা যায়। আরও একটী আশ্চর্য্য ঘটনা শোন। ইহাই বলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন :—

আমার মধ্যমপুত্র সরকারী কার্য্যে পূর্ব্বাঞ্চলে নিযুক্ত আছে তাহা তুমি জান। গিরিজা যখন গাড়ী হইতে পড়িয়া গুরুতর আঘাত পায়, তখন এই মধ্যমপুত্র সহর হইতে অনেক দূরে সামান্য এক পল্লীগ্রামে ছিল। গিরিজার দুর্ঘটনার কথা সে জানিত না এবং জানিবার কোন

সম্ভাবনাও ছিল না। সেখানে একদিন রাত্রে সে একটা অদ্ভূত স্বপ্ন দেখিয়া পরদিবস আমাকে এই সম্বন্ধে একখানি পত্র লেখে। সে লিখিয়াছিল যে, পূর্ব্বরাত্রে একটী স্বপ্নে সে দেখিতে পায় যে, গিরিজার মৃতা স্ত্রী সহাস্যবদনে তাহার নিকট আসিয়াছেন। তাঁহার সাজসজ্জা ঠিক নববিবাহিতা বধূর মত। তিনি আসিয়া কোন কথা না বলিয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া অনবরত হাস্য করিতে লাগিলেন, তারপর বলিলেন,—দেখিতেছ না আমার যে আবার বিবাহ হইয়াছে। তোমার দাদাকে ছাড়িয়া আসিয়া আমি বিধবার মত বাস করিতেছিলাম। কি নির্জ্জন কি নিরানন্দ জীবনই আমাকে যাপন করিতে হইয়াছে! বিশেষতঃ আমার স্বামী ঠিক পথে চলিতেছেন না দেখিয়া আমি আরও কষ্ট পাইতেছিলাম। কিন্তু আমি আবার তাঁহাকে পাইয়াছি এবং তিনি এখানে আসিয়া আবার আমার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন, তাই আজ বিবাহের সাজে তোমাকে শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি। এই স্বপ্ন দেখিয়া আমার মধ্যমপুত্রের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়।

মতিবাবু শেষে লিখিয়াছেন,—প্রিয়তম পুত্রকে হারাইয়া এইরূপ ঘটনা রচনা করিয়া বলা কোন লোকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ রামশঙ্করবাবুকে যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, তিনি যে প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহাতে অলীক কিছু বলা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এই ঘটনার পর শ্রীভগবান্ ও পরলোক সম্বন্ধে তাঁহার মতের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই জানিতেন।

মৃতাপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ (১)

শ্রীল মতিলাল ঘোষ মহাশয় হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে আত্মার মূর্ত্তিগ্রহণ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রথমে "অমৃতবাজার পত্রিকার" তাৎকালীন সহকারী সম্পাদক ৺হেমচন্দ্র দত্তের নিকট তিনি জানিতে পারেন যে, হেমের শ্যালক মৃতুঞ্জয় মিত্র (ওরফে মিতু) মধ্যে মধ্যে নিজের পরলোকগতা স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পান এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তাও বলেন। এইকথা শুনিয়া এই সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য জানিবার জন্য মতিবাবু হেমকে সঙ্গে লইয়া ১২ই অক্টোবর তারিখে মিতুদের বাড়ী যান এবং যে ঘরে মিতুর সহিত তাঁহার মৃতা স্ত্রীর দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা হয় সেই ঘরে বসিয়া মিতুর মুখে ঘটনাটি শোনেন ও লিপিবদ্ধ করেন। শেষে হেমের দ্বারা ঘটনাটী পরিষ্কার ভাবে লেখাইয়া ও মিতুর দ্বারা উহা সংশোধন করাইয়া লয়েন। সেই খাতা দেখিয়াই মতিবাবু ম্যাগাজিনে ঘটনাটী প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধের অনুবাদ নিম্নে দিতেছি :—

মিতু বলিতে লাগিলেন,—প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমি পুনরায় বিবাহ করি। বিবাহের পর আমার মৃতা স্ত্রীকে মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু স্বপ্ন বলিয়া উহা গ্রাহ্য করিতাম না। পরলোক সম্বন্ধে কোন পুস্তক আমি কখনও পাঠ করি নাই, পড়িবার আগ্রহও আমার কখন হয় নাই। কাজেই মৃতা স্ত্রীকে স্বপ্নে কয়েকবার দেখিতে পাইলেও ইহাতে আমার মন বিচলিত হইত না।

মিতু বলিলেন,—তারপর ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমে

(১) H. S. M. Vol. II. Part 2.

একদিন রাত্রি ১২টার সময় হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন আমি দেখিতে পাইলাম যে, আমার প্রথমা স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। ঘরে একটী আলো মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, আর আমার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী আমার পার্শ্বে ঘুমাইতেছিলেন। আমি কখন ভূত বিশ্বাস করিতাম না এবং বিভীষিকা দেখিয়াও ভয় পাইতাম না। কিন্তু আমার মৃতা স্ত্রীকে পুনরায় দেখিবার যে কোন সম্ভাবনা হইতে পারে তাহা আমি পূর্ব্বে কখন মনেও ভাবি নাই, কাজেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার মন কখনও প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল,—আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। এই চীৎকার শুনিয়া আমার নিদ্রিতা স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, আর বাড়ীর কয়েকজন ছুটিয়া আমার ঘরে আসিলেন। তাঁহারা আমাকে ঐভাবে চীৎকার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আসল কথা গোপন রাখিয়া আমি এইমাত্র বলিলাম যে, স্বপ্নে বিভীষিকা দেখিয়াছিলাম। তারপর আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এই ঘটনার পর আটমাস কাটিয়া গেল এবং ক্রমে ইহা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। আমার প্রথমা স্ত্রীর একটি ছোট ভাই ছিল। এই ভাইকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইহার বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। এই বিবাহে আমি যোগদান কি তত্ত্বতল্লাশ করিব না স্থির করিয়াছিলাম। কারণ সে সময় এই শ্বশুরবাড়ীর লোকদিগের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না।

বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে আমি আমার ঘরে একাকী ঘুমাইতেছিলাম। ঘরে একটা আলোও ছিল। রাত্রি ১২টার সময় হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়াই দেখি আমার প্রথমা

স্ত্রী আমার বিছানা হইতে ৫।৬ হাত দূরে দাঁড়াইয়া আছেন! আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র আমার বোধ হইল আমার স্ত্রী যেন কি বলিতেছেন। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য কাণখাড়া করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম। তখন তিনি সুস্পষ্টভাবে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—তুমি অবশ্য জান আমার ছোটভাইকে আমি কত ভালবাসিতাম। আমি আজ যদি ইহজগতে থাকিতাম তাহা হইলে তাহার বিবাহোৎসবে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া কত সুখী হইতাম। কিন্তু আমি এখন অপর-জগতে আসিয়াছি, এখান হইতে আমার ইচ্ছানুরূপ কিছু করিবার উপায় নাই। তাই তোমাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছি, এই বিবাহে আমার যাহা কর্ত্তব্য আমার হইয়া সে সমস্তই তুমি করিবে, তাহাতে কোন রকম ত্রুটি যেন না হয়; তাহা হইলে আমি সুখী হইব। এই কথাগুলি বলিয়াই ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইল।

এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলাম। রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তত্ত্বের দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বাহির হইলাম এবং সমস্ত জিনিষ আনিয়া ভাল করিয়া তত্ত্ব পাঠাইয়া দিলাম। এই শ্বশুরবাড়ীর লোকের সঙ্গে আমার মনোমালিন্যের কথা আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে প্রায় সকলেই জানিতেন। সুতরাং হঠাৎ আমার মনোভাব এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন এবং কেহ কেহ আমাকে ইহার হেতু জিজ্ঞাসাও করিলেন। কিন্তু আমি কাহারও কাছে কোন কথা ভাঙ্গিলাম না।

তাঁহার মৃতা পত্নীকে কি মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করায় মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন,—মৃত্যুর সময় তাঁহার পরণে একখানি লালপেড়ে সাড়ী, হাতে শাঁখা ও লোহা এবং চুল এলো ছিল। ঠিক সেই চেহারায় তিনি দেখা দিয়াছিলেন। তবে মৃত্যুর সময় তাঁহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার

হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি বেশ সুস্থ ও সবল দেখা গিয়াছিল।

তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী কোনরূপ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন কি না জিজ্ঞাসা করায় মিতু বলিলেন,—সে সময় তিনি সেরূপ কোন ভাব প্রকাশ করেন নাই। বরং ইহজগতে থাকিতে তিনি সদা আনন্দময়ী ও সহাস্যবদনা থাকিতেন, কিন্তু সেদিন তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইল।

তৎপরে মিতু বলিলেন,—আমার স্ত্রী ৫।৬ মিনিট দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন।

ইহার পর দুই মাসের মধ্যে মিতু তাঁহার প্রথমা স্ত্রীকে আর দেখিতে পান নাই। তিনি কলিকাতায় একটী সম্ভ্রান্ত দেশীয় ফার্ম্মে কাজ করিতেন। এই সময় বেতন বৃদ্ধি হইবে বলিয়া তিনি আশা করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা তাহা না হওয়ায় তাঁহার মনিব তাঁহাকে এই ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত করিতেছেন ভাবিয়া তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং কার্য্যে ইস্তাফা দিবার সঙ্কল্প করেন। এমন কি, পরদিবস ত্যাগপত্র পেশ করিবেন বলিয়া উহা প্রস্তুত করিয়াও রাখিয়াছিলেন।

সেইদিন রাত্রে তিনি ঘরে আলো জ্বালিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি পূর্ব্বের ন্যায় বেশভূষা করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। মিতু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার দিকে চাহিবামাত্র রমণীমূর্ত্তি বলিলেন,—কাজ ছাড়িয়া দিও না, শীঘ্রই তোমার বেতন বৃদ্ধি হইবে। তারপর মিতুর পায়ের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—ঘায়ে ঔষধ লাগাও না কেন?

এ পর্য্যন্ত কোন দিন মিতু তাঁহার স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তির সহিত

কথা বলেন নাই, কিন্তু আজ তাঁহার স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন,—অনেক ঔষধ লাগাইয়াছি, কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। আর ঔষধ ব্যবহার করিব না।

ছায়ামূর্ত্তি বলিলেন,—আমি একটা ঔষধ বলিয়া দিতেছি, ইহা লাগাইলেই ঘা সারিয়া যাইবে। ইহাই বলিয়া তিনি একটা গাছের নাম ও কি প্রকারে উহা ব্যবহার করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন। সেই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই মিতুর ঘা সারিয়া গেল। তাঁহার বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে ছায়ামূর্ত্তি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও ঠিক হইল। কয়েক দিন পরে মিতুর মনিব তাঁহাকে ডাকিয়া নিজ হইতেই তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। সে দিনও ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার সহিত প্রায় পাঁচ মিনিট কথা বলিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার বদন গম্ভীর ও ম্লান ছিল।

এই ঘটনার পর কয়েক মাস মৃত্যুঞ্জয় আর তাঁহার স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পান নাই। ক্রমে শ্রাবণ (১৮৯৭ সালের আগষ্ট) মাস আসিল। মিতুর প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ীর পরিবারবর্গের পক্ষে শ্রাবণ মাস বড় বিষমকাল। এই শ্রাবণ মাসেই তাঁহাদের পরিবারস্থ কয়েকজন মারা যান। মিতুর স্ত্রী, তাঁহার খুড়তুত এক ভাই ও এক ভগিনী এবং শেষে তাঁহার পিতা এই শ্রাবণ মাসেই (১৮৯৭ সালের আগষ্ট) দেহত্যাগ করেন।

মিতুর খুড়শ্বশুর একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ছিলেন। হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে যখন এই ঘটনা প্রকাশিত হয় তখন তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার ছোট মেয়ে ও মিতুর স্ত্রী একবয়সী ছিল। তাঁহারা এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেন এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি ছিল। এই বালিকার বয়স যখন ৮ বৎসর, তখন

হইতে মধ্যে মধ্যে সে আবিষ্ট হইত এবং সেই অবস্থায় আপনাকে কোন্নগরের কোন মিত্র পরিবারের বধূ বলিয়া পরিচয় দি'ত এবং বলিত তাহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া সে মারা যায়। একদিন কোন্নগর হইতে জনৈক 'মিত্র' মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ লইবার জন্য এই বালিকার পিতার নিকট আসিয়াছিলেন। বালিকা তখন অন্দরমহলে ছিল। হঠাৎ সে আবিষ্ট হইয়া বলিল, তাহার স্বামী বাহিরের ঘরে অমুক বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। কিছুদিন পরে এই বালিকা মারা যায়। মৃত্যুকালে সে বলে,—কোন্নগরে আমার এক মেয়ে ছিল সে মারা গিয়াছে। আজ সেই মেয়ে আমাকে লইতে আসিয়াছে।

অনুসন্ধান করিয়া পরে জানা যায় যে, কোন্নগরের এক মিত্র পরিবারের একটী বধূ ঐরূপে আগুনে পুড়িয়া মারা যান, এবং ইহাও জানা যায় যে তাঁহার একটী মেয়ে ছিল, সে মিতুর ঐ শালীর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মারা যায়।

যাহাহউক মিতু স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছি,—শ্রাবণ (১৮৯৭ সালের আগষ্ট) মাসে আমার শ্বশুর জ্বরে শয্যাগত হন। তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই যে তাঁহার পীড়া এরূপ গুরুতর হইয়াছে। আমি আমার ঘরে শুইয়া আছি। রাত্রি তখন ১১টা কি ১২টা হইবে। এমন সময় হঠাৎ আমার স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন,—বাবার অবস্থা ভাল নহে। সম্ভবতঃ তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন না। তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখাশুনা করিও। ইহাই বলিয়া ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইলেন।

শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি দেখিতে পাইলাম আমার স্ত্রী তাঁহার পিতার নিকট বসিয়া আছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

শ্বশুর মহাশয় তখন বেশ বুঝিয়া ছিলেন তাঁহার ইহজীবন শেষ হইয়া আসিতেছে। আমাকে দেখিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি যেন কোন অদৃশ্য বস্তুর উপর দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তৎপরে পাশ ফিরিয়া শুইবামাত্র তিনি দেহত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত আমার প্রথমা স্ত্রীকে আর দেখিতে পাই নাই।

যাহাহউক কয়েকবার মৃতা স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া ও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া মিতুর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। ইহার ফলে দ্বিতীয়পক্ষের পঞ্চদশবর্ষীয়া স্ত্রীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। শেষে এই বালিকা-বধূর পিতার সহিত মিতুর বিবাদ হইল এবং তিনি তাঁহাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। মিতুর এই স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন এবং প্রসবের জন্য পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার একটি সন্তান হইল। ১৮৯৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ইহার ষষ্ঠীপূজা হইবার কথা। ষষ্ঠীপূজা সম্পর্কে কিছু করিবেন না এই সংকল্প করিয়া পূর্ব্বরাত্রে মিতু শয়ন করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন।

মিতু বলিতে লাগিলেন,—সে দিন তাঁহাকে গম্ভীর বা ম্লান দেখিলাম না, বরং ইহজগতে থাকিতে তিনি যেরূপ সদা আনন্দময়ী ও হাস্যবদনা থাকিতেন, ঠিক সেইরূপ প্রফুল্ল মনে আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়াই আমি উঠিয়া বসিলাম এবং তাহার কথা পরিষ্কার ভাবে শুনিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করিতেছি বলিয়া প্রথমেই তিনি

আমাকে তিরস্কার করিলেন। তারপর আবেগভরে বলিলেন,—নিজের ছেলের ষষ্ঠীপূজা না করা কি ভাল কাজ হচ্ছে? দেখিতেছি, তোমার বুদ্ধি একেবারেই লোপ পাইয়াছে।

আমি বলিলাম,—তাহাদের সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখিতে চাই না। তিনি বিরক্তির ভাবে বলিলেন,—সে ত এখনও বালিকা, তাহার উপর তোমার রাগ হয় কি করিয়া? আর তাহারই বা অপরাধ কি? তারপর কোমলকণ্ঠে বলিলেন,—তাহাকে যখন বিয়ে করেছ তখন তাহার প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহা পালন করিতে তুমি বাধ্য। আবার স্বার্থের দিক্ দিয়াও দেখ। আমি দুইটী শিশু সন্তান রেখে এসেছি। তাহাদের দেখিবে কে? তুমি যদি বালিকাবধূকে এই ভাবে অসুখী কর, তাহার মনে ক্লেশ দাও, তাহা হইলে সে যে আমার ছেলেদের যত্ন করিবে ইহা কি করিয়া আশা করিতে পার?

মিতু বলিতে লাগিলেন,—ইহাতেও আমার মন নরম হইল না। আমি তবুও তর্ক করিতে যাইতেছি দেখিয়া, তিনি আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমাকে ঠাট্টা করিলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বলিলেন,—বোকার মত ব্যবহার করিও না, আমি যাহা বলি শোন। বেশ সরল মনে ষষ্ঠীপূজার তত্ত্ব কর। বালিকাকে সন্তুষ্ট করিয়া আমার ছেলে দুইটীর সম্পূর্ণ ভার তাহার উপর দাও। দেখিবে, সে উহাদের কত যত্ন করে। এই কথা বলিয়া ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে শূন্যের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন।

এ পর্য্যন্ত আমার স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি দর্শনের কথা আমি কাহাকেও বলি নাই। কিন্তু তাঁহার পিত্রালয়ের পরিবারবর্গের প্রতি হঠাৎ আমার এরূপ অনুরক্তি দেখিয়া, আমার প্রথম পক্ষের বড় ভায়রাভাইয়ের মনে

ইহার প্রকৃত তথ্য জানিবার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এবং তিনি এই কথা আমার শাশুড়ীর নিকট প্রকাশ করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরলোকগতা কন্যাকে দেখিবার জন্য আমার শাশুড়ী অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আমার ভায়রাভাইকে দিয়া তাঁহার এই ইচ্ছার কথা আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন। আমার ভায়রাভাই শাশুড়ীর কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন,—যদি সম্ভবপর হয় তবে আমাকেও একবার দেখা দিতে বলিও। কারণ তাঁহার মৃত্যুশয্যায় আমি তাঁহার উপর যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলাম, তজ্জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

এই ঘটনার পর পুনরায় ছায়ামূর্ত্তির দর্শন পাইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আর কাহাকেও দেখা দাও না কেন?

স্ত্রী। আর কেহ ত আমাকে দেখিতে চাহে না?

আমি। তোমার মা তোমাকে দেখিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।

স্ত্রী। আচ্ছা, তাঁহাকে দেখা দিতে চেষ্টা করিব।

আমি। আর তোমার ভগিনীপতি তোমার সম্বন্ধে যাহা করিয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত তাহা তুমি জান। সেই কারণে তিনিও তোমাকে দুই একটী কথা বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমার স্ত্রী এ কথার কোন পরিষ্কার উত্তর না দিয়া কেবল ইহাই বলিলেন,—এখানে ভাল আত্মারা কেহ কাহারও প্রতি রাগ বা হিংসা পোষণ করেন না।

ইহার পর একদিন সন্ধ্যার সময় আমার শাশুড়ী প্রকৃতই তাঁহার কন্যাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া

তাঁহার এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইল যে, নিজের মেয়ে হইলেও তাহার সহিত কথা বলিতে পারিলেন না। এই কথা তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন।

কি বেশে তিনি দেখা দিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করায় আমার শাশুড়ী বলিলেন,—মারা যাইবার সময় তাহার পরণে যেরূপ লালপেড়ে সাড়ী ও হাতে যেরূপ শাঁখা ও লোহা ছিল, ঠিক সেই বেশে তাহাকে দেখিয়াছিলাম। আমার ভায়রাভাইও আধ-ঘুম আধ-জাগরণ অবস্থায় আমার স্ত্রীকে ঐ বেশেই দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই।

মিতু বলিলেন,—ইহার পর ১৮৯৮ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত চেয়ারে বসিয়া আমি একখানি বই পড়িতেছিলাম, আর আমার ছোটভাই ১০।১২ হাত দূরে ঘুমাইতেছিল। এই সময় আমার স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। এতদিন আমার স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি যতবার দেখিয়াছি, ততবারই আমার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে বল সঞ্চার করিবার জন্য আমার স্ত্রী বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু এই দিন ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া আমার সেরূপ ভয় হয় নাই। তাহার কারণ অন্যান্য দিনের ন্যায় তাঁহাকে গম্ভীর ভাবাপন্ন বোধ হইল না, বরং ইহজগতে থাকিতে যেরূপ সদা আনন্দময়ী থাকিতেন, তাঁহাকে সেইরূপ হাস্যবদনা দেখিয়া, আমি হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিয়া তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি। এখন তুমি কোথায় কাহার কাছে থাক ?

স্ত্রী। আমার দাদামহাশয়ের কাছে থাকি।

আমি। তোমায় তত্ত্বাবধান করেন কে ?

স্ত্রী। এখানে সকলেই স্বাধীন, কাহারও অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

আমি। আমার ও তোমার পিতাকে কি দেখিতে পাও?

স্ত্রী। তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার চেয়ে উচ্চস্তরে থাকেন।

আমি। উচ্চ ও নিম্ন স্তরের অর্থ কি?

স্ত্রী। সে কথা তোমাকে এখন বুঝাইতে পারিব না।

আমি। তোমার পিতা কোথায় থাকেন? তিনি কি আমাকে দেখা দিতে পারেন না?

স্ত্রী। আমার পিতা ও আমি বিভিন্ন স্তরে থাকি। তিনি এখন যেখানে আছেন, সেখানে তাঁহাকে আরও কিছুকাল থাকিতে হইবে। তারপর তিনি ক্রমে তোমার নিকট আসিতে সমর্থ হইবেন।

প্রায় ২০।২৫ মিনিটকাল এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইলেন।

মতিবাবু হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে লিখিয়াছেন,—১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসের ৩রা তারিখে মিতু শেষবার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করেন, আর ঐ মাসের ১২ই তারিখে মিতুর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। মিতু যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, আমি নিজ হাতে তাহা কাগজে নোট করিয়া লইয়াছিলাম। শেষে হেম তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া ও মিতুকে দেখাইয়া দুই দিন পরে অর্থাৎ ১৪ই তারিখে আমাকে আনিয়া দেন। সেই লেখা হইতে আমি এই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিলাম। এ কথা লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি এই প্রবন্ধে যাহা লিখিলাম তাহাতে অতিরঞ্জিত কিছুই নাই। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, এই সকল ঘটনা যে মিতুর

স্বকপোলকল্পিত নহে তাহার প্রমাণ কি? কিন্তু আমাকে বা তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে ঠকাইয়া মিতুর কি স্বার্থ সাধিত হইবে? বিশেষতঃ এই সকল ঘটনা তাঁহার নিজের মৃতা স্ত্রীর সম্বন্ধে। পাছে এই সকল কথা প্রকাশ পায় এই জন্য মিতু প্রথমে ইহা বলিতেই চাহেন নাই, শেষে অনেক অনুরোধের পর তিনি এই ঘটনা আমার নিকট প্রকাশ করেন। তিনি যে সকল কথা বলেন তাহার মধ্যে কতকগুলি বিষয়,—যেমন প্রথম শ্বশুরবাড়ীর লোকদিগের সহিত হঠাৎ সদ্ভাব স্থাপনা, তাঁহাদের বাটীর অন্যান্য ঘটনা, এবং দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়ীর সহিত প্রথমে সম্পর্ক রহিত করিয়া পরে পুত্রের ষষ্ঠীপূজার তত্ত্ব করা, ইত্যাদি বিষয় পরে অনুসন্ধান করিয়া সত্য বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছিল।

মতিবাবুর প্রশ্নের উত্তরে মিতু বলিয়াছেন,—ইহজগতে থাকিতে আমার স্ত্রী যেরূপ ছিলেন, পরজগতে যাওয়ার পর তাঁহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। অপিচ তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চেহারার অবিকল অনুরূপ। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাবভঙ্গী চালচলন কথাবার্ত্তা কণ্ঠস্বর—সমস্তই ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়। তাঁহার কথাগুলি এরূপ সুস্পষ্ট যে, আমার বুঝিতে কোনরূপ কষ্টবোধ হয় নাই। প্রথম কয়েকবার তাঁহাকে গম্ভীর ভাবাপন্ন বোধ হইলেও, শেষের দুইবার তাঁহার সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি ও হাস্যবদন লক্ষ্য করিলে তাঁহার ইহজগতের পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিতেন। তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি বরাবর আমার ৪।৫ হাত দূরে আবির্ভূত হইয়াছেন, এবং প্রত্যেক বারই বোধ হইয়াছে যে, তিনি যেন দেয়াল ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঘরে আলো থাকায় তাঁহাকে দেখিতে কোন কষ্ট হয় নাই।

হাঁসপাতালে আত্মার আবির্ভাব। (১)

বিগত ১৯০৮ সালে ভাগলপুর জেলায় হনুমাননগর হাঁসপাতালে যিনি ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ছিলেন, তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পাশকরা এম-বি ডাক্তার। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত ভৌতিক ব্যাপার বিশ্বাস করা একেবারেই অসম্ভব। যে বাড়ীতে তিনি সপরিবারে বাস করিতেন, সেখানে নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ হয়। প্রথমে ইহা দুষ্টলোকের কার্য্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল, এবং এই বদ্‌মায়েস লোক ধরিবার জন্য তিনি নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বন্দুক লইয়া বাড়ীর চারিদিকে সারারাত্রি পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করিলেন, এবং নিজেরাও সেই সঙ্গে কয়েক দিন জাগিয়া কাটাইলেন, কিন্তু উপদ্রবের কোনরূপ প্রতিকার হইল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমারের নিকট উপদেশপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার লিখিয়া পাঠাইলেন। শিশিরবাবুর উপদেশ সহ ডাক্তারবাবুর পত্রখানি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ডাক্তার বাবু লিখিয়াছিলেন—হাঁসপাতালের হাতার মধ্যে আমার বাসা। এখানে স্ত্রী, দুইটী শিশুসন্তান ও একটি বিধবা ভ্রাতৃবধূসহ আমি পাঁচ বৎসর যাবৎ বাস করিতেছি, কিন্তু এতকাল কোন উপদ্রব ভোগ করিতে হয় নাই। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ২॥ টার সময় আমার ভ্রাতৃবধূর শয়নকক্ষের দ্বারে একটা প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ শোনা যায়। ইহা কোন দুষ্টলোকের কার্য্য

(১) Vide H. S. M. Vol III. Part 2.

বলিয়া মনে হওয়ায় আমরা তৎক্ষণাৎ বাড়ীর চারিদিকে তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। পরদিন রাত্রিতেও ঠিক সেই সময় সেই দ্বারে আবার সেইরূপ আঘাতের শব্দ শোনা গেল। সে সময় এই অঞ্চলে অত্যন্ত চোরের দৌরাত্ম্য হইতেছিল, কাজেই ইহা চোরের কার্য্য বলিয়া সকলের ধারণা হইল। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন ফল হইল না।

তৃতীয় দিবস সকালবেলা হইতে ইট্‌পাট্‌খেল পড়িতে সুরু হইল এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ৫০।৬০ বার এইরূপ ঢিল পড়িল। বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, দিনের বেলা ঢিল পড়িতেছে, অথচ কোথা হইতে কে ফেলিতেছে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কিছু জানা গেল না। দিনের বেলা ত একরূপ কাটিয়া গেল, তখন ভয় হইল রাত্রিতে না জানি আরও গুরুতর কি ঘটে। সেইজন্য ভাবিলাম সারারাত্রি পাহারার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই সময় স্থানীয় একজন ভদ্রলোক আমাদের সাহায্য করিতে আসিলেন। তখন আমরা দুইজন, আমার চাকর ও বামুন সহ লাঠি লইয়া প্রস্তুত রহিলাম। রাত্রি অধিক হইলে শব্দ সুরু হইল, আমরাও বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। ক্রমে দুইটা বাজিল, কিন্তু আস্কারা কোন কিছুই হইল না।

অবশিষ্ট রাত্রিটুকু জাগিয়া কাটাইব বলিয়া আমরা বারান্দায় আসিলাম। তখন আরও ঘন ঘন শব্দ হইতে লাগিল। আমরা চারিদিক হইতে সেই স্থানটি ঘিরিয়া ফেলিলাম, কিন্তু শব্দ কেন হইতেছে তাহা বোঝা গেল না। আরও বিস্ময়ের বিষয়, এক স্থানের শব্দ লক্ষ্য করিয়া যেইমাত্র আমরা সেই স্থানে গেলাম, অমনি সেখানে থামিয়া অন্যস্থানে শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। এই প্রকারে নানাপ্রকার

চেষ্টা করিয়াও যখন কিছুই বুঝিতে পারা গেল না, তখন মনে হইল,—হয়ত কোন অদৃশ্য শক্তি এইভাবে আমাদিগকে উত্যক্ত করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছে। বাকি রাত্রিটুকু এইভাবে কাটিয়া গেল।

আর একদিন সন্ধ্যার পর চারি পাঁচ জন বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছিল। ক্রমে শব্দ আরম্ভ হইল। তখন শব্দ লক্ষ্য করিয়া কয়েকবার বন্দুক ছোড়াও হইল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পর পর কয়েক রাত্রি এই ভাবে কাটিয়া গেল। তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া আমরা অন্য একটী বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। বাড়ী বদ্‌লাইলাম বটে, কিন্তু আহারাদি সাবেক বাড়ীতেই চলিতে লাগিল। নূতন বাড়ীতে কেবল রাত্রে যাইয়া শুইতাম।

নূতন বাড়ীতে প্রথম দুই দিন বেশ শান্তিতেই কাটিল বটে, কিন্তু তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার পর হইতে আবার উপদ্রব সুরু হইল,—যে দিকে আমার ভ্রাতৃবধূ শুইতেন সেই দিক হইতেই শব্দ আসিতে লাগিল। একদিন আমরা ঘর পরিবর্ত্তন করিলাম, অর্থাৎ আমাদের শুইবার ঘরে আমার ভ্রাতৃবধূ শয়ন করিলেন, আর তাঁহার ঘরে আমরা শুইলাম। অমনি শব্দ হইবার স্থানেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল, অর্থাৎ যে ঘরে আমার ভ্রাতৃবধূ শুইলেন সেইদিক্ হইতেই শব্দ আসিতে লাগিল। তবে নূতন বাড়ীতে ঢিল পড়িত না,—ঢিল পড়িত পুরাতন বাড়ীতে, তাহাও সকল সময় নহে। যে সময় আমার ভ্রাতৃবধূ পুরাতন বাড়ীতে আহারাদি করিতে যাইতেন সেই সময়ই ঢিল পড়িত। আমার স্ত্রী গেলেও অল্প সল্প পড়িত, কিন্তু আমি কিম্বা অপর কেহ গেলে আদপে পড়িত না।

নূতন বাড়ীতে আসিবার কয়েক দিন পরে উপদ্রবের রকম

পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথমে কখন কখন দ্বারে মৃদু টোক্কার শব্দ হইত, ক্রমে উহার পরিমাণ ও বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে ধাক্কা এত জোরে হইতে লাগিল যে, আমরা ভীত হইয়া পড়িলাম।

মধ্যেও—এমন কি দিনের বেলাও—কয়েকবার টোক্কার শব্দ শোনা গেল। ক্রমে এরূপও হইল যে, কোন স্থানে ঘন ঘন টোক্কার শব্দ শুনিয়া সেখানে লোক জড় হইল, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সেখানে শব্দ থামিল না,—সমভাবেই হইতে লাগিল।

এতদিন কেবল টোক্কা, ধাক্কা ও ইটপাটকেল পড়া চলিতেছিল; কিন্তু ক্রমে অন্য রকম উপদ্রবও আরম্ভ হইল। আমরা ঘরের সমস্ত দরজা জানালা ভালরূপে বন্ধ করিয়া ও মশারি ফেলিয়া শুইয়া আছি, হঠাৎ দেখি মশারি নড়িতেছে, অথচ ঘরে হাওয়া আসিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। কখন বা মশারির মধ্যে এরূপ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল যে, আমাদের হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরিল। আবার কখন কে যেন বিছানা হইতে হাতপাখা জোর করিয়া লইয়া গেল! এইরূপ নূতন নূতন উপদ্রব—ইহা ভূতেরই হউক কিম্বা অপর কিছুরই হউক—আমাদিগকে এরূপ উত্যক্ত করিয়া তুলিল যে, তখন আমাদের অন্যত্র আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আর কোন উপায়ই রহিল না।

একটা ঘটনা পূর্ব্বে উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে। প্রথমে আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, সেখানে একটী ঘরের মধ্যে খাটের উপর একদিন অবিশ্রান্ত ইটপাটকেল পড়িতে সুরু হইল। দুই দিন এইরূপ উপদ্রব ছিল, আর দুই দিনই দিনের বেলা হইয়াছিল। ঘরের দরজা জানালা দৃঢ়ভাবে বন্ধ,—কোন স্থান দিয়া সূচাগ্রভাগও প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না,—অথচ ঘরের মধ্যে ঢিল পড়িতে লাগিল! তখন

মনে হইতেছিল বুঝি বা দেয়াল কিম্বা ছাদ ভেদ করিয়া ঢিলগুলি আসিতেছে।

একদিন কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এই ঘটনা দেখিতে আসিলেন। আমরা তখন একখানি তক্তপোষের উপর বসিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, এমন সময় একজন বলিলেন,—একটু অপেক্ষা করিলেই হয়ত টোক্কার শব্দ শোনা যাইবে। এই কথা বলিবামাত্র নিকটস্থ একটী দরজায় ভীষণ জোরে শব্দ হইল। আর একদিন অনবরত শব্দ হইতেছে শুনিয়া একজন বলিলেন,—এখনই এই বাড়ী ছাড়িয়া যাইব। তৎক্ষণাৎ শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। অপর একদিন আমরা যেই বলিয়াছি,—সৌভাগ্যক্রমে আজ এখন পর্য্যন্তও কোন উপদ্রব হয় নাই, অমনি টোক্কা পড়িতে সুরু হইল।

এই সকল ঘটনা দ্বারা বেশ বোঝা গেল যে, কোন অদৃশ্য শক্তি কর্ত্তৃক ইহা সংঘটিত হইতেছে আর সেই অদৃশ্য শক্তি আমাদের নিকটেই আছে এবং আমাদের কথাবার্ত্তা বুঝিবার ক্ষমতাও তাহার বিলক্ষণ রহিয়াছে।

ডাক্তারবাবু তাঁহার চিঠিতে এই ভাবে ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়া শেষে লিখিয়াছেন,—সংবাদপত্রে এই সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন আলোচনা করা আমাদের ইচ্ছা নহে, অথচ এই সকল উপদ্রব সহ্য করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল অপ্রীতিকর ব্যাপার হইতে কি প্রকারে অব্যাহতি পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি। এই সকল ব্যাপারের হাত হইতে উদ্ধারের জন্য যদি কিছু অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক হয় তাহাও করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

এই পত্রের উত্তরে মহাত্মা শিশিরকুমার লিখিলেন,—ইহা কোন দেহবিমুক্ত আত্মার কার্য্য বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ তিনি আপনাদের কোন নিকট-আত্মীয় হইবেন, এবং আপনাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে ইচ্ছা করেন। আপনি তাঁহার পরিচয় লইবেন ও তিনি কি চাহেন তাহাও জিজ্ঞাসা করিবেন। কি প্রকারে কথাবার্ত্তা চালাইতে হইবে তাহাও শিশিরবাবু লিখিয়া দিলেন। তিনি এ কথাও লিখিলেন,—যাহা আপনারা এখন দুর্ভাগ্য বলিয়া ভাবিতেছেন, হয়ত পরে তাহা পরম সৌভাগ্যে পরিণত হইবে।

ইহার উত্তরে ডাক্তারবাবু ১৯০৮ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে একখানি পত্র লেখেন। তাহার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি :—

মহাশয়, আপনার ১৮।১০।০৮ তারিখের পত্র পাইয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিলাম। আপনাকে প্রথম পত্র পাঠাইবার পর এখানে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা অগ্রে বলিতেছি। আমরা শেষে যে বাড়ীতে যাই সেখানে অল্পদিন মাত্র ছিলাম। এই কয়েকদিন আমাদিগকে বিশেষ কোন অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই। তৎপরে আমরা সাবেক বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছি। এই বাড়ীতে যে দিন ফিরিয়া আসিলাম, সেই দিনই দিনের বেলা ছাদের উপর ৬।৭টি ও গৃহমধ্যে ৩।৪টি ঢিল পড়িয়াছিল। প্রথম দুই দিন দরজায় ধাক্কার শব্দও শোনা গিয়াছিল, তবে রাত্রিতে কোন উপদ্রব হয় নাই। কিন্তু তৃতীয় দিবস হইতে নূতন ধরণের উপদ্রব আরম্ভ হইল।

এতদিন যত রকম উপদ্রবই হউক না কেন, আমাদের শারীরিক ক্ষতি কিছু হয় নাই। কিন্তু আজকাল আত্মিক মহাশয় আমাদের দেহ লইয়াও রঙ্গ করিতে সুরু করিয়াছেন। কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন আমার ভ্রাতৃজায়ার শয়নকক্ষের দরজা

জানালা গুলি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহার দেহে কীল চড় পড়িতে লাগিল! এরূপ জোরে মারা হইতেছিল যে, বাহির হইতেও তাহার শব্দ শোনা যাইতেছিল। আমার স্ত্রীও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই, তবে মাত্রায় অবশ্য অনেক কম।

একদিন ঘরের মধ্যে কার্ণিশ হইতে ধপাৎ করিয়া কি একটা পড়িল, শেষে দেখা গেল উহা একটা ওল। এই ওল কোথা হইতে আসিল তাহা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও জানা গেল না। তবে ইহা যে ঘরের মধ্যে ছিল না, তাহা নিশ্চয়। আবার বাহির হইতে কেহ যে ইহা আনিবে সে সম্ভাবনাও ছিল না। তবে কি দেয়াল বা ছাদ ভেদ করিয়া ইহা আসিল? সেইরূপ কিছু একটা না হইলে এইরূপ সমস্যা সমাধান করা সুকঠিন।

আর একদিন একটী নূতন ব্যাপার ঘটিল। হঠাৎ দেখা গেল ছাইপূর্ণ একটা পাত্র নড়িতেছে,—যেন উহা জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছে; অর্থাৎ পাত্রটী আপনা আপনিই উবুড় হইল এবং ছাইগুলি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আবার সোজা হইল। তখন ইহাতে জীবনী আছে বলিয়া আর বোঝা গেল না।

কিন্তু কেবল যে ঐ ছাইপূর্ণ পাত্রটীই ক্ষণকালের জন্য জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, অন্যান্য দ্রব্যতেও যে জীবনী সঞ্চার হইয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখা গেল। অর্থাৎ একস্থানে কতকগুলি আলুর খোসা পড়িয়াছিল, হঠাৎ সে গুলি শূন্যভরে আসিয়া আমার ভ্রাতৃজায়ার মাথার উপর পড়িল! আবার তাঁহার মাথার উপর মাঝে মাঝে বেলপাতা আসিয়া পড়িত, অথচ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল নিকটে কোন বেলগাছ নাই! মধ্যে মধ্যে এইরূপ ব্যাপার ঘটিতে লাগিল।

একদিন আমার ভ্রাতৃজায়া স্বপ্নে দেখিলেন যে, একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—তুমি যদি আমাকে আসিতে বল ত আমি আসিব, আর যাইতে বলিলেই চলিয়া যাইব। সে রাত্রিতে কোনরূপ উপদ্রব হইল না। ব্রাহ্মণের কথা ঠিক কি না পরীক্ষা করিবার জন্য আমার ভ্রাতৃজায়াকে পরবর্ত্তী রাত্রিতে তাঁহাকে আহ্বান করিতে বলিয়া দিলাম। সেই রাত্রিতে আহ্বান করিবামাত্র আমার ভ্রাতৃজায়ার মশারীর মধ্যে তিনটী ঢিল পড়িল, আর দরজায় ৩।৪ বার ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। তখন আমার ভ্রাতৃবধু বলিলেন,—এখন চলিয়া যাও, আর যেন এরূপ না হয়। তৎক্ষণাৎ শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। সে রাত্রিতে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া না গেলেও, তিনি যে সেখানে উপস্থিত আছেন তাহা বেশ বোঝা গেল।

শেষে ডাক্তার বাবু লিখিলেন,—আপনার ৮ই তারিখের পত্র কাল বেলা ৩টার সময় পাইয়াছি। এই পত্র আসিবার পূর্ব্বে কোন উপদ্রবই ছিল না। পত্র পাইবামাত্র উহা বাড়ীর সকলকে পড়িতে দিলাম। পরক্ষণেই দেখি আমার ভ্রাতৃবধুর দুই কাণেই সুগন্ধি তুলা গোঁজা রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, ঐ ঘরের একটা শিশি হইতেই ঐ সুগন্ধি দ্রব্য লওয়া হইয়াছে। কে যে কখন তুলায় সুগন্ধিদ্রব্য মাখিল, আর কে যে কখন উহা তাঁহার কাণে গুঁজিয়া দিল, তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই। এই ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই তিনি রান্নাঘরে গেলেন। সেই সময় তাঁহার র‍্যাপারখানি অন্যঘর হইতে আনিয়া কে যেন তাহার গায়ে ফেলিয়া দিল, কিন্তু তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না।

এই প্রকার ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটিতেছে। ইহাতে বেশ বোঝা যাইতেছে যে, মুক্তাত্মা মহাশয় আমার ভ্রাতৃবধুকে লইয়া বেশ

রঙ্গ করিতেছেন। তিনি যে বিলক্ষণ রসিক এবং সর্ব্বদা আমাদের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা তাঁহার কার্য্যকলাপ দ্বারা বেশ জানা যাইতেছে। তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইলেই তিনি কার্য্যদ্বারা জানাইয়া দেন যে, তিনি সেখানে উপস্থিত আছেন ও আমাদের কথাবার্ত্তা সবই শুনিতেছেন।

একটী চাবি-বন্ধ বাক্সের মধ্যে একশিশি ভাল এসেন্স ছিল। একদিন কে যেন আবদ্ধ-বাক্স হইতে শিশিটী বাহির করিয়া আমার ভ্রাতৃজায়ার মাথায় খানিকটা এসেন্স ঢালিয়া দিল, অথচ বাক্স যেমন বন্ধ ছিল তেম্‌নি রহিল। আর একদিন আমরা কয়েকজন নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম। ক্রমে টাকাকড়ির কথা উঠিল, আর অম্‌নি কোথা হইতে ১/৫ আসিয়া পড়িল। অনুসন্ধানে জানা গেল একটা চাবি-বন্ধ বাক্সের মধ্যে উহা ছিল। বাক্সটী বন্ধ রহিয়াছে, অথচ পয়সা বাহির করা হইয়াছে !

আপনার নির্দ্দেশ মত আমার ভাইবৌ পেন্সিল ও সাদা কাগজ লইয়া বসিয়াছিলেন। একটু পরে তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, তাঁহার বুকের মধ্যে বড় কষ্টবোধ হইতেছে। এই সময় তিনি লিখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হাত কাঁপিতে থাকায় পরিষ্কার লেখা কিছু হইল না। হিজিবিজি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও এই সঙ্গে পাঠাইতেছি (১)। তৎপরে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া এই কতকগুলি কথা বাহির হইল। কথাগুলি পরপৃষ্ঠায় দিতেছি।

---

(১) ম্যাগাজিনে উক্ত প্রবন্ধের পাদটীকায় লেখা হইয়াছে যে,— হিজিবিজি লেখা হইতে এই কয়েকটী কথা পাঠোদ্ধার করা গেল ;— "আমি এখন তোমাকে বলিব না। আমি তোমাকে ভালবাসি।"

আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। বহুকাল তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। তাই তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি কষ্ট পাইলে আমি দুঃখিত হই। তোমাকে এসেন্স ব্যবহার করিতে বলি, তুমি তাহা কর না, সেইজন্য আমি উহা তোমার গায়ে ঢালিয়া দিয়াছিলাম। আমি তোমাকে যাইতে নিষেধ করি, এবং আমার কথা স্মরণ করাইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করি, কিন্তু তাহা তুমি শোন না। তুমি আমাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারি নাই।

এখন আমার ভাইবৌয়ের ফিট হইতেছে। আজ আটবার ফিট হইয়াছিল। ফিট সুরু হইলেই, 'আমি এসেছি' বলিয়াই তিনি অচেতন হন, তারপর বেশ বুদ্ধিমতীর মত উত্তর দেন, এবং শেষে 'যাই' বলিয়া চেতনালাভ করেন।

এই পত্রখানি ম্যাগাজিনে ছাপিয়া শিশিরবাবু শেষে লিখিয়াছেন,—পত্রখানি পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, চিকিৎসক মহাশয় বেশ সুশিক্ষিত। তিনি যখন বুঝিলেন যে ইহা কোন অদৃশ্য শক্তির কার্য্য, তখন তাঁহার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে ইহা মৃতব্যক্তির আত্মার কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

আমাদের দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস, যে সকল আত্মার এই মরজগতে গতিবিধি আছে তাহারা নিম্নস্তরের প্রেতাত্মা এবং সাধারণতঃ তাহারা পরের অনিষ্টকারী। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই চিকিৎসক মহাশয় হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ভূতের উপদ্রব হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় জানিবার জন্য উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের বিশ্বাস হয় যে, ইনি কোন বন্ধুর বা নিজজনের

আত্মা হইবেন। তিনি যে নিরীহ আত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার দিকে গৃহস্থের মন আকর্ষণের জন্যই এইরূপ নানাপ্রকার উপদ্রব করিতেছেন। এই সকল কথাই যে শিশিরবাবু চিকিৎসক মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উল্লিখিত পত্র পাঠ করিলেই জানা যায়।

চিকিৎসক মহাশয় লিখিয়াছেন,—এতদিন ধরিয়া আমাদের বাড়ীতে যে সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা যে কোন মৃতব্যক্তির আত্মার কার্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর ইহা যে আমার মৃত ভ্রাতার অর্থাৎ আমার বিধবা ভ্রাতৃজায়ার স্বামীর আত্মা তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রধান প্রমান এই যে, তিনি আমাদের যে সকল পারিবারিক কথা বলিতেছেন, তাহা আমাদের পরিবারস্থ যে অল্প কয়েকজন জানিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতাই মারা গিয়াছেন। আর আমার ভাইবৌয়ের—যাঁহার মুখ দিয়া এই সকল কথা বাহির হইতেছে—ইহার সকল কথা জানিবার সম্ভাবনা নাই।

চিকিৎসক মহাশয় আরও লিখিয়াছেন,—এখন কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ সুবিধা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার কথা আর ফুরাইতেছে না। এই সংবাদ শুনিয়া আমার অন্যান্য ভ্রাতারাও এখানে আসিয়াছেন। এই ভ্রাতাকে হারাইয়া সকলেই নিরানন্দে ছিলেন। সেই হারাণো ভাইকে পাইয়া, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া, তাঁহার উপস্থিতি সর্ব্বদা অনুভব করিয়া, তাঁহাদের আর আনন্দ ধরিতেছে না। কেবল যে কথাবার্ত্তা দ্বারা তাঁহারা মৃতভ্রাতার উপস্থিতি অনুভব করিতেছেন তাহা নহে, এরূপ অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দিন দুপুরে তাঁহাদের চোখের সম্মুখে ঘটিতেছে, যাহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন।

ইহার কিছুদিন পরে চিকিৎসক মহাশয়ের পত্রে জানা গিয়াছিল

যে, তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃবধূ যখন তখন অজ্ঞান হইতেন এবং সেই অজ্ঞান অবস্থায়—তাঁহার উপর যে আত্মার ভর হইত—তাঁহার বক্তব্যগুলি বলিতেন। কথা বলা শেষ হইলেই পুনরায় তিনি চেতনালাভ করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া যে সকল কথা বাহির হইত, জ্ঞান হইলে সেই সকল কথা তাঁহার আদপে স্মরণ থাকিত না। চেতনালাভ করিয়াই তিনি আবার সহজ মানুষের মত কাজকর্ম্ম করিতেন। অচৈতন্য হইবার ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তিনি ইহা বুঝিতে পারিতেন না।

এইভাবে কিছুকাল কাটিয়া গেল। তারপর হইতে মৃত স্বামীর গতিবিধি আর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অনুভব করিতে পারিতেন না। ক্রমে দেহবিমুক্ত আত্মার আবির্ভাব একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ইহাতে কিন্তু চিকিৎসক মহাশয় দুঃখিত হইলেন না, বরং তাঁহার ভ্রাতৃজায়া সহজভাবে কাজকর্ম্ম করিতেছেন দেখিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত এবং সন্তুষ্টও হইলেন। ক্রমে এই ভৌতিক ব্যাপারের বিষয় তাঁহারা একরূপ ভুলিয়া গেলেন।

এই সময়—অর্থাৎ ১৯০৯ সালের জুন মাসের প্রথমভাগে—একদিন ডাক্তারবাবুর ভ্রাতৃজায়ার উপর আবার আত্মার আবির্ভাব হইল। কিন্তু এই দেহবিমুক্ত আত্মা যেরূপ ভাবে আত্মপরিচয় দিলেন তাহাতে ইঁহাকে অপরিচিত বলিয়াই মনে হইল। তিনি নিজের যে নাম বলিলেন তাহা তাহাদের জানা ছিল না। যাহাহউক তিনি অনেক উপদেশ দিলেন এবং পরলোক সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিলেন।

চিকিৎসক মহাশয় একখানি পত্রে লিখিয়াছেন,—একদিন আমার বিধবা ভ্রাতৃজায়া আবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—একজন সাধু একটী

পাত্রে ঠাকুরের চরণামৃত লইয়া আমাদের শরীর শোধন করিবার জন্য এখানে দাঁড়াইয়া আছেন। এই চরণামৃতের স্পর্শে আমাদের দেহ ও আত্মা পবিত্র হইবে। এই কথা বলিবামাত্র আমার ও আমার স্ত্রীর দেহে কয়েক ফোঁটা জল পড়িল। আর একদিন আমার একটী কন্যার অত্যন্ত জ্বর হওয়ায় আমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলাম। এমন সময় আমার ভ্রাতৃবধূ আবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—এক মুক্তাত্মা বলিতেছেন যে, তিনি মেয়ের কপালে ফোঁটা দিয়া তাহাকে আরোগ্য করিবেন। ঠিক সেই সময় দেখা গেল কন্যাটীর দুই চোখের মাঝখানে কোন অদৃশ্য হস্তে একটী গোল ফোঁটা দেওয়া হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার পরেই মেয়েটী আরোগ্যলাভ করিল।

আর একদিন দিনের বেলা আমি একস্থানে বসিয়া আছি আর আমার ভ্রাতৃবধূ আমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন, ঠিক সেই সময় আমি দেখিতে পাইলাম উপর হইতে একখানি খাম তাঁহার মাথার উপর পড়িল এবং তথা হইতে যেন বায়ুভরে আমার নিকটে আসিল। আমি তৎক্ষণাৎ খামখানি তুলিয়া দেখিলাম যে, তাহার উপর ইংরাজীতে আমার নাম লেখা আছে। খামখানি খুলিয়া দেখি তাহার মধ্যে এক টুকরা কাগজে আমার ভ্রাতৃবধুকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজীতে একছত্র লেখা আছে এবং নীচে "হেমাঙ্গিনী দেবী" বলিয়া সহী রহিয়াছে। পত্রখানিতে আমার ভাইবৌকে সত্বর তাঁহার মৃত স্বামীর নিকট যাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল হেমাঙ্গিনী আমার মৃত ভ্রাতার এক বন্ধুর স্ত্রীর নাম। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মারা গিয়াছিলেন।

চিকিৎসক মহাশয় শেষে লিখিয়াছেন,—যে কাগজ ও খামে এই পত্র

লেখা হইয়াছিল তাহা আমারই বাক্স হইতে লওয়া হইয়াছে। তবে পত্রখানি যে কাহার হাতের লেখা তাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় আমার ভ্রাতৃজায়া আদপে ইংরাজি জানেন না।

ডাক্তারের মৃতা পত্নী (১)

একজন বিচক্ষণ হিন্দু চিকিৎসক হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে তাঁহার মৃতা পত্নী সম্বন্ধে একটী অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রী সঙ্কটাপন্ন পীড়িত হন। তিনি নিজেই স্ত্রীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। একদিন রোগিনী অচেতন অবস্থায় বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকিতেছেন দেখিয়া, তিনি কাণ পাতিয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। কথার ভাবে বোধ হইল তিনি যেন কাহার সহিত কথা বলিতেছেন।

রোগিনী আবেগভরে বলিতে লাগিলেন,—আমাকে এখন কেন লইয়া যাইবে? আমি ত মরিবার জন্য প্রস্তুত হই নাই! আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হইবে। আমি চলিয়া গেলে এ সব কে করিবে?

এই কথা বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, মনে হইল যেন কাহার নিকট উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটু পরে বলিলেন,—এ রকম হইলে তাহাদের জন্য ভাবিবার কোন কারণ নাই বটে, কিন্তু আমি চলিয়া গেলে আমার স্বামী শোকে আকুল হইবেন, তাঁহাকে কে সান্ত্বনা করিবে?

আবার তিনি চুপ করিলেন, তারপর ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—তাঁহাকেও লইয়া যাইবে! না, না, তা' করিও না; আমাদের যে আর

কেহই নাই। তাঁহার অভাবে গোষ্ঠীসমেত যে মারা যাইবে! তাহা হইলে আমার শ্বশুর শাশুড়ীর দশা কি হইবে? পুত্রহারা হইয়া তাঁহারা ত বাঁচিবেন না! আর, আমাকেই তাঁহারা অভিশাপ করিবেন।

তারপর কাতরকণ্ঠে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন,—তাঁহাকে লইয়া যাইও না। আমি না হয় একা থাকিব,—তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিব। দোহাই তোমার, অত কঠিন হইও না।

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন,—যদি তাহাই হয়,—তাঁহাকে যদি লইয়া না যাও, আর আমার জন্য যদি তিনি কাতর না হন,—তাহা হইলে তোমার কাছে যাইতে আমার কোনই আপত্তি নাই। তবে আমাকে লইয়া যাইবার আগে শপথ করে বল,—ইহার পর ক্ষীণস্বরে কি বলিলেন বোঝা গেল না।

আমার স্ত্রীর এই সব প্রলাপ বাক্য শুনিয়া আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম। আমি তখন আমার স্ত্রীকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। সম্ভবতঃ তিনি অচেতন অবস্থায় ছিলেন বলিয়া আমার কথা শুনিতে পান নাই।

মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে তাঁহার সামান্য জ্ঞান হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন,—বেশী করিয়া ডাবের জল দিতেছ না কেন? কবিরাজ ত দিতে বলেছেন? একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—কাল এই সময় আমি চলিয়া যাইব। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমিও বুঝিয়াছিলাম তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিব না, তাঁহার অন্তিমকাল সন্নিকট। সুতরাং ইহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। কাজেই তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বিচলিত হইলাম না, ধীরভাবে কথাগুলি শুনিলাম। পরদিবস ঠিক সেই সময় তিনি আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী যখন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল, তখন ভাবিয়াছিলাম তাঁহার বিরহ সহ্য করা আমার পক্ষে সুকঠিন হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি যখন সত্য সত্যই আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তখন সেরূপ কিছুই হইল না; এমন কি, কোন গুরুতর ব্যাপাব ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। কেন এরূপ হইল বলিতেছি।

আমার স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে একদিন তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং সেই অবস্থায় এক রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পান। ইহাকে তাঁহার দেবীমূর্ত্তি বলিয়া ধারণা হইল। সেই মূর্ত্তি আমার স্ত্রীকে বলেন,—শীঘ্র তোমাকে এই পৃথিবী ছাড়িতে হইবে। আমার স্ত্রী অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার কন্যার বিবাহ না হইলে তাঁহাকে যেন লইয়া যাওয়া না হয়।

আমার স্ত্রী অচেতন অবস্থায় যখন এই সকল কথা বলেন, তখন আমরা কয়েকজন সেখানে ছিলাম এবং সকলেই ঐ কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি চেতনালাভ করিয়াও আমাকে ঐ সকল কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি বেশ সুস্থ ও সবল ছিলেন, মৃত্যুর কোন লক্ষণই তাঁহাতে প্রকাশ পায় নাই। কাজেই ইহা প্রলাপ বাক্য বলিয়াই তখন আমার ধারণা হইয়াছিল। এই সকল কথা শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

কিন্তু মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে সেই দেবীমূর্ত্তি পুনরায় তাঁহাকে দর্শন দিয়া যখন মৃত্যুর কথা আবার জানাইলেন, তখন ছয় মাস পূর্ব্বের সেই ঘটনা আমার স্মরণ হইল। তখন যাহা প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম, এখন আমার স্ত্রী জীবন মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছেন বুঝিয়া তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইল, এবং

সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার পূর্ব্বের দৃঢ় ধারণা একেবারে টলিয়া গেল। তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, মৃত্যু বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি প্রকৃত তাহা নহে, অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পায় না।

সম্ভবতঃ দেবীমূর্ত্তি আমার স্ত্রীকে ইহাই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তিনি চলিয়া গেলে ছেলেমেয়েরা তাঁহার অভাব আদপেই অনুভব করিতে পারিবে না। তবে তিনি ইহা বলুন আর নাই বলুন কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছে, অর্থাৎ আমার সন্তানেরা,—এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশুটি পর্য্যন্ত—তাহাদের মায়ের জন্য কাঁদে নাই, কিম্বা তাঁহার অভাব কোন দিন অনুভব করে নাই। তাহাদের মাতা যে মারা গিয়াছেন, তাঁহাকে তাহারা যে দেখিতে পাইতেছে না, এরূপ কোন ভাবও তাহাদের কথায় বা কার্য্যে কখনও প্রকাশ পায় নাই। বরং দেখিয়া মনে হইয়াছে, কেহ যেন অলক্ষিত ভাবে তাহাদিগকে আগ্‌লাইয়া রহিয়াছেন, আর সেই জন্য তাহারা নিশ্চিন্ত মনে খেলাধূলা করিয়া বেড়াইতেছে। আর এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তাহাদের দেখাশুনা করিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনও বোধ করি নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার স্ত্রী পরলোকগমন করিবার পর হইতে আমার সন্তানেরা কোনদিন কোন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয় নাই, আর আমি নিজেও কোন দিনের জন্য তাঁহার অভাব অনুভব করি নাই। তিনি আছেন, আমার কাছেই আছেন, এই ভাব আমার মন হইতে কোন দিন বিচ্যুত হয় নাই।

আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার প্রবল ইচ্ছা আমার মনে জাগিয়া উঠে। কিন্তু তিনি সবে কয়েকদিন মাত্র মারা গিয়াছেন, তখন কৃতকার্য্য হইব কি না, ইহাই ভাবিয়া

সে সময় এই সম্বন্ধে চেষ্টা করি নাই। বিশেষতঃ চক্রে বসিবার নিয়মাদিও আমার আদপে জানা ছিল না। এই সকল বিষয় মোটামুটি জানিয়া লইলাম, এবং শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে একদিন আমার ছেলেদের ও একটি ছোট ভাইকে লইয়া চক্রে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার স্ত্রীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় আমার ত্রয়োদশবর্ষীয় মধ্যমপুত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—ঐ যে মা রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী প'রে দাঁড়ায়ে! তারপর সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। তখন তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার মনে হইল হয়ত কোন আত্মা তাহার পর ভর করিয়াছেন। 'মনে হইল' বলিলাম, তাহার কারণ আমি, তখন এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ, কারণ ইহার পূর্ব্বে কখনও চক্রে বসি নাই কিম্বা আবিষ্ট অবস্থায় কিরূপ ভাব হয় তাহাও দেখি নাই। যাহাহউক আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি কে?

উত্তর। এত শীঘ্র আমাকে ভুলিয়া গেলে?

প্রশ্ন। তুমি কি বি—? (আমার স্ত্রীর নাম)

উ। হাঁ।

প্র। তুমি আছ কেমন?

উ। অনেক ভাল।

প্র। আছ কোথায়?

উ। তা' জানি না; এ জায়গা একেবারে অন্ধকার।

প্র। ওখানে আর কাহাকেও কি দেখিতে পাও?

উ। না।

প্র। স্বপ্নে যে দেবীমূর্ত্তি দেখেছিলে তাঁহাকে কি দেখিতে পাইয়াছ?

উ। না। (একটু পরে) আমার সঙ্গে প্রার্থনা কর।

আমি একটা মন্ত্রপাঠ করিলাম। মিডিয়ম—আমার মধ্যমপুত্রও—

সেই সঙ্গে উহা উচ্চারণ করিল। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, —এখন কি কিছু দেখিতে পাইতেছ ?

উ। হাঁ, আলো দেখিতেছি।

আমি আবার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিলাম। মিডিয়ম পাঠ করিল। তখন মিডিয়মের মুখ দিয়া বাহির হইল,—ঐ যে মা (দেবী) ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তিতে আমার দিকে আসিতেছেন।

প্র। আমাদের উপর তোমার কি সেই রকম ভালবাসা আছে ?

স্ত্রী। হাঁ, নিশ্চয় আছে। কেন, তোমার কি তাহাতে সন্দেহ হয় ?

প্র। তোমার ছেলেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি কিছু বলিতে পার ?

স্ত্রী। ঠিক বলিতে পারি না। তবে মেজটি ১৬ বছর বয়সের পর ভাল ছেলে হইবে বলিয়া মনে হয়। আর তিন বছর পরে কোলের ছেলেটি আমার কাছে আসিতে পারে। [এই কথাটী ঠিক হয় নাই।]

প্র। আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদা কথা বলিতে কি তোমার ইচ্ছা করে না ?

স্ত্রী। করে বৈ কি ? তবে ঘন ঘন সারকেলে বসা ভাল না। সপ্তাহে একবার আমি আসিতে পারি। মেজছেলের উপর ভর করিতে আমার বড় মায়া হয়। দেখিতেছ না, উহার কত কষ্ট হইতেছে। আমি আর বেশীক্ষণ থাকিব না। (একটু পরে) কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে একবার যাইও। সেখানে এমন ব্যাপার দেখিতে পাইবে, যাহা তোমার ভাল লাগিবে। এখন আমি যাই।

ইহার পর মেজছেলের আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল।

আমার স্ত্রীর কথামত কিছুদিন পরে আমি কাশীতে গেলাম। আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সেখানে থাকিত, তাহার বাটীতে যাইয়া

উঠিলাম। আমাকে দেখিয়াই সে বলিল,—একি ! আমাকে খবর না দিয়াই যে আসিলে ?

আমি। হাঁ, হঠাৎই আসিতে হইল।

ভগিনী। আমিও তোমার কথাই ভাবিতে ছিলাম।

আ। কেন ?

ভ। কাল রাত্রে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

আ। কি ব্যাপার ?

বল্‌ছি শোন;—ইহাই বলিয়া আমার কনিষ্ঠা ভগিনী বলিতে লাগিল, —কাল রাত আন্দাজ ১১টার সময় সবে আমি শুয়েছি, এমন সময় দেখি বৌদি দাঁড়াইয়ে ! ঘরে আলো ছিল কাজেই বেশ স্পষ্টই তাঁহাকে দেখিতে পেলাম। ঠিক সেই চেহারা, সেই রকম পরণ পরিচ্ছদ। বেশীর ভাগ গলায় একছড়া সোণার হার। এ হার আগে কখন দেখিনি। মুখখানি বেশ প্রফুল্ল ও হাসিমাখা। কিন্তু হঠাৎ মরামানুষের চেহারা দেখে আমার ভয় হইল, মাথা গুলিয়ে গেল, জাগিয়া আছি কি স্বপ্ন দেখিতেছি তাহা তখন বুঝিবার অবস্থা আমার ছিল না। চোখ মুছে ভাল করে তাকাইয়ে দেখি, বৌদি আমার দিকে আসিতেছেন ! আমি তখন ভয়হিহ্বল ভাবে উচ্চৈস্বরে বল্লেম,—তুমি কি বৌদি ? আমার ভাব দেখে বৌদি হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন,—ভয় কি ? আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না। ইহা বলিয়াই আমার হাত ধরিলেন। জীবিত মানুষের দেহ বলিয়াই মনে হইল। তারপর তক্তপোষের এই ধারে বসিলেন। [ইহাই বলিয়া আমার ভগিনী সেই স্থানটী দেখাইয়া দিল।] তারপর বলিল,—বৌদি আমার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। কতক্ষণ যে কথা চলিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে সে যে অনেকক্ষণ তাহা নিশ্চয়। এমন মন খুলিয়া কথা

বলিতেছিলাম যে, মরামানুষের সঙ্গে কথা বলিতেছি বলে মনেই হয় নি। অনেক কথা হইল। এমন কথাও বলিলেন যাহা (তাঁহার মতে) তুমি ছাড়া আর কেও জানে না। [এখানে আমার ভগিনী প্রকৃতই এমন কতকগুলি কথা বলিল যাহা আমি ভিন্ন অপর কেহই জানিত না।] বৌদি শেষে বলিলেন,—কাল তুমি জানিতে পারিবে কেন আমি এত আনন্দ জানাইতেছি। সেই জন্যই আজ তোমারে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। কথা বলিতে বলিতে বৌদি অদৃশ্য হইয়া গেলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। ঘরে দরজা জানালা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম সবই সাবেকের মত বন্ধ আছে।

আমার স্ত্রীর কথামত সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথের মন্দিরে গেলাম। ক্রমে জনতা কমিয়া আসিল। তখন নাটমন্দিরের এক কোণে বসিয়া বিশ্বনাথের ধ্যান করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার আবেশাবস্থা আসিল, বহির্জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ লোপ পাইল। সেই সময় মন্দিরে যে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতেছিল তাহা পর্য্যন্ত আমার কাণে প্রবেশ করিতেছিল না। ক্রমে মন্দিরের দৃশ্য আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল, এবং তাহার স্থানে নানারকম অদ্ভূত ও অত্যাশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে লাগিলাম। এই ভাবে কতকক্ষণ কাটিয়া গেল জানি না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন সকল কথা স্মরণ ছিল না; তবে যাহা কিছু মনে আছে তাহাই বলিতেছি :—

প্রথমে চারিদিকে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তার পর নানাবিধ মনোহর দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইল। তবে বোধ হইল, সে গুলি উল্টা ভাবে আকাশের গায়ে ঝুলিতেছে। সেখানে একটি সুন্দর রাস্তা দেখিতে পাইলাম। সেই রাস্তা দিয়া বহুলোক নীচের দিকে মাথা করিয়া চলিতেছে! ক্রমে এই দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। তখন

একটা সুন্দর স্থান দেখিতে পাইলাম। এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত বহু সুদৃশ্য প্রাসাদ ও বাগানাদি রহিয়াছে। এগুলি কিন্তু উল্টা নহে। এই সকল স্থানের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বহিয়া চলিয়াছে। ইহাদের স্বচ্ছ বারি পারদের ন্যায় টল্ টল্ করিতেছে। সেখানে আবার রৌপ্যের পক্ষী ও বৃক্ষাদি দেখিলাম। এই সকল বৃক্ষে নানা আকারের ও নানাবর্ণের ফলফুল রহিয়াছে। ক্রমে সেই সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট দৃশ্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সকল দৃশ্য অতি সুন্দর ও মনোহর। ইহা বর্ণনা করা একেবারেই অসম্ভব। ইহা আস্বাদন ও উপভোগের সামগ্রী। এখানে পক্ষী ভিন্ন অপর কোন জীব দৃষ্টিগোচর হইল না।

কিছুকাল পরে দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড হলঘরে আমি রহিয়াছি। এখানে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণের ক্ষীণ ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তাহাদের হাবভাব দেখিয়াই বোধ হইল তাহারা যেন অতিশয় অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। প্রত্যেকেরই বুকের উপর ভারি বোঝার মত কি চাপান রহিয়াছে। কেহ কেহ আমার দিকে চাহিতেছে কিন্তু কোন কথা বলিতেছে না। হলঘরটি অন্ধকার, দেখিলেই ভয় হয়, তবে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি চলে এরূপ ক্ষীণ আলোক আছে। কয়েক মিনিট পরে হলঘরের অপর দিকের দূরস্থিত কোণে একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখা গেল। এই আলোটি আস্তে আস্তে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে উহার উজ্জলতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে ইহা বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় অতিশয় উজ্জল হইয়া উঠিল। ক্রমে এই দৃশ্যও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

তারপর দেখিলাম, আমি একটা মাঠের মধ্যে রহিয়াছি। সেখানে সারি সারি অনেকগুলি পাতকূয়া আছে। প্রত্যেক কূয়ার উপর এক

ধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণের চওড়া ফিতে রহিয়াছে। আমার বামদিকে মানুষ পশু পাখী সাপ প্রভৃতি বহু প্রাণী দেখিলাম। তাহারা কুয়ার এক দিক হইতে অপর দিকে যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। আরও দেখিলাম, তাহারা কুয়ার ভিতর চাহিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার মধ্যে লাফাইয়া পড়িতেছে, আর উঠিতেছে না। আবার কতকগুলি মানুষ কুয়া পার হইবার জন্য চেষ্টা করিতে যাইয়া ফিতার সঙ্গে জড়াইয়া যাইতেছে, শেষে কেহ কেহ অনেক কষ্টে অপর ধারে আসিয়া পৌঁছিতেছে। যাহারা পার হইতে সক্ষম হইতেছে, তাহাদের চেহারাও সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

তারপর দেখিলাম, একটী ছোট পুষ্করিণীর সম্মুখস্থ বাগানে আমি বসিয়া আছি। বাগানটী অতি সুন্দর এবং নানাবিধ সুগন্ধী ফুলে পরিপূর্ণ। আরও দেখিলাম, পুষ্করিণীর মাঝখানে উজ্জ্বল পাথরে নির্ম্মিত একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ রহিয়াছে এবং ইহা হইতে নানাবর্ণের জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। পুষ্করিণীর দক্ষিণপার্শ্বে একটি তালগাছের তলে দেখিলাম আমারই এক মূর্ত্তি উলঙ্গাবস্থায় বসিয়া ধ্যানস্থ রহিয়াছে।

ক্রমে এই সকল দৃশ্য আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। তখন দেখিলাম, বিশ্বেশ্বরের নাটমন্দিরের যে কোণে প্রথমে বসিয়াছিলাম সেই স্থানেই বসিয়া আছি। তখন আমার শরীর হইতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হইল এবং মনে হইল আমার দৃষ্টি যেন চিন্ময় জগৎ হইতে ধীরে ধীরে জড়জগতে নামিয়া আসিতেছে। অবশেষে আমি চক্ষু মেলিলাম। তখন দেখি আমার স্ত্রী আমার পার্শ্বে বসিয়া ঠাকুরের জন্য চন্দন ঘসিতেছেন! আমি তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন

কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমে আমার সহজ অবস্থা ফিরিয়া আসিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

এই ঘটনার পরে আমি চর্ম্মচক্ষুতে আমার স্ত্রীকে আর কখনও দেখিতে পাই নাই। একদিন আমার ছোট ছেলেটী কাঁদিতেছিল। তাহার কাঁদুনে স্বভাব বলিয়া সেদিন আমরা তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করি নাই। আমি তখন একটী কাজে ব্যাস্ত ছিলাম। হঠাৎ আমার কাণে গেল,—ছেলেটা যে কেঁদে কেঁদে মারা গেল। আমি চম্‌কিয়া উঠিলাম, কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তবে সে যে আমার স্ত্রীর গলার স্বর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আরও একদিন তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিয়াছিলাম। আমি জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলাম। হঠাৎ মনে হইল আমার শিয়রে বসিয়া আমার স্ত্রী যেন পাখার বাতাস করিতেছেন।

বারাণসীতে আমার ভগিনীর সম্মুখে আমার স্ত্রীর জড়ীয় দেহধারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার পর আর একবার মাত্র তিনি মানবদেহে দেখা দিয়াছিলেন। সেবার দেখিয়াছিল আমার পাচক। ঘটনাটী বলিতেছি। একদিন আমি পেটের পীড়ায় গুরুতররূপে আক্রান্ত হইয়াছিলাম এবং ঐ পাচক আমার সেবা করিতেছিল। সেই সময় সে আমার স্ত্রীর মূর্ত্তি বেশ স্পষ্ট দেখিয়াছিল।

এই সকল ঘটনা ব্যতীত স্বপ্নে ও আবেশ অবস্থায় আমার স্ত্রীকে যখন তখন দেখিতে পাই, আর তাঁহার উপস্থিতিও নানাভাবে আমার অনুভূতি হইয়া থাকে। তাঁহার কাছে আমি অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি। বাস্তবিক আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি যদি কিছু হইয়া থাকে তাহা তাঁহার জন্যই হইয়াছে। আর তাঁহারই জন্য

আত্মার অমরত্ব ও পরলোকে নিজজনের সহিত পুনর্মিলন সম্বন্ধে বিশ্বাস আমি পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছি। আমি বেশ বুঝিতেছি, তিনি আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং এই মরজগতে তিনি আমাকে যেমন মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, মৃত্যুর পরও আমাকে সেইভাবেই গ্রহণ করিবেন,—ইহা সামান্য লাভ নহে। এখন আমার মৃত্যু বলিয়া আর কোন ভয় নাই।

মৃত মাতার পুত্রস্নেহ (১)

শিবব্রতলাল এম-এ চুণার মিশনারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি একটি ভৌতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেন। ঘটনাটী এখানে অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

একটী বাংলা ধরণের বাটীতে শিবব্রত ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা সুরযনারায়ণ বাস করিতেন। পাচক ও ভৃত্য ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত না। ফাল্গুন মাসে একদিন সন্ধ্যার সময় সুরযনারায়ণ মির্জ্জাপুরের তহসিলদার ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট মুন্সী অযোধ্যাপ্রাসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় গমন করেন। সুতরাং শিবব্রতলালকে একাকী বাড়ীতে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি বাহিরের বারান্দায় একাকী বসিয়া মৃদুমধুর সুশীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন। ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় তিনি আপন শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন এবং শীঘ্রই গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

(১) Vide H. S. M. Vol II Part 2.

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন রাত্রি আন্দাজ তিনটা হইবে। অন্ধকার আছে বলিয়া তিনি শয্যা ত্যাগ করিলেন না, জাগরিত অবস্থাতেই শয়ন করিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে হঠাৎ কক্ষটি আলোকিত হইয়া উঠিল। এই আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন একটী সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা স্বপ্ন কিম্বা চোখের ধাঁধাঁ তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং চক্ষু ভালরূপ মুছিয়া আবার তাকাইলেন। তখন দেখিলেন সেই রমণীমূর্ত্তি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া!

শিবব্রতলাল ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্ত্রীলোক ত দূরের কথা, সাধারণতঃ সকল পুরুষের সঙ্গেও তিনি সেরূপ মন খুলিয়া আলাপ পরিচয় করিতেন না। কাজেই এইরূপ গভীর রাত্রিকালে একটি অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীকে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন, এবং চুপ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে?

শিবব্রতলালের এই প্রশ্ন শুনিয়া রমণীমূর্ত্তি সম্মানসূচক অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—আমি ভূতপূর্ব্ব তহসিলদার মির এলায়েৎ হোসেনের কন্যা এবং আপনার বন্ধু খাজা রফজল হোসেনের পরিণীতা ভার্য্যা। কোন বিশেষ কারণে এত অধিক রাত্রে আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে।

শিবব্রত বলিলেন,—আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীর এই গভীর রাত্রে একাকী এখানে আসা উচিত হয় নাই। বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে ভৃত্যদ্বারা সংবাদ পাঠাইতে পারিতেন।

ইহা শুনিয়া রমণীমূর্ত্তি এক অলৌকিক হাস্য করিলেন, এবং তারপর বলিলেন,—আপনাকে উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়াই এখানে

আসিয়াছি। আমি কোন স্থানে একটি সংবাদ পাঠাইতে চাই। সে সংবাদ অভীপ্সিত ব্যক্তির নিকট জ্ঞাপন করিবার পক্ষে আপনিই যোগ্য ব্যক্তি।

এই কথা শুনিয়া শিবব্রত বিস্মিত হইলেন; ভাবিতে লাগিলেন, —ব্যাপারখানা কি? তারপর বিশেষ ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখন বলুন, আমাকে কি করিতে হইবে?

রমণী প্রশ্নের ঠিক উত্তর না দিয়া, একটী রুগ্ন শিশুসন্তানকে ভূমিতে নামাইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,—শিশুটীর শারীরিক অবস্থা কেমন দেখিতেছেন?

শিবব্রত বলিলেন,—অতিশয় রুগ্ন।

ঠিক বলেছেন। এই কথা বলিয়া রমণী সস্নেহে শিশুটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন; অতঃপর বলিতে লাগিলেন,—ইহার পিতামহ কিম্বা পিতা কেহই ইহার শোচনীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেন না। এখনও যদি ভাল করিয়া চিকিৎসা না করা হয় তাহা হইলে তিন চারি দিনের মধ্যেই ইহার মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা ইহার রোগের ঠিক ঔষধ জানেন না। কাল সকালে আপনি আমার স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিবেন যে, এই ভাবে শিশুটিকে অবহেলা করা পিতার কর্ত্তব্য নহে। আরও বলিবেন যে, শিশুটির নাভিদেশে কয়েক বিন্দু তিলতৈল দিয়া অন্ততঃ ১৫ মিনিট কাল রৌদ্রে রাখিয়া দিতে হইবে। ক্রমাগত তিন দিন এইরূপ করিলে শিশুটী নিশ্চয় আরোগ্যলাভ করিবে।

শিবব্রতলাল বলিলেন,—আপনার স্বামীকে নিশ্চয় এই সংবাদ দিব।

তাঁহাদিগকে এইভাবে অবস্থান করিতে দেখিলে কেহ কিছু বলিতে পারে,—ইহাই ভাবিয়া তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং রমণীকে সত্বর প্রস্থান করিতে:অনুরোধ করিলেন। তখন রমণী শিবব্রতলালকে

অভিবাদন করিয়া শিশুসন্তানটী সহ অন্তর্হিত হইলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে উষার আলোক দেখা দিল।

ব্যাপারটি শিবব্রতলাল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বন্ধু আফজল হোসেনের বাটীতে গেলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। সেখানে এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারিলেন যে পূর্ব্ব রাত্রিতে যে স্ত্রীমূর্ত্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তিনি আফজল হোসেনের স্ত্রী, একটী শিশুসন্তান রাখিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন। শিশুটী উদরাময় রোগে ভুগিতেছে, কিছুতেই আরোগ্য-লাভ করিতে পারিতেছে না। যাহাহৌক রমণীমূর্ত্তির কথিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া শিশুটী তিন দিনের মধ্যেই আরোগ্যলাভ করিল।

শিবব্রতলাল সুশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। তাঁহার মনে কোনরূপ কুসংস্কার থাকিতে পারে না, অর্থাৎ কোন বিষয়ের চাক্ষুষ প্রমাণ না পাইলে তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, প্রেতাত্মা সম্বন্ধে তাঁহার আদপে বিশ্বাস ছিল না। বিশেষতঃ মিশনারীদিগের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ দৃঢ়ধারণা সত্ত্বেও, উল্লিখিত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার আর অবিশ্বাস রহিল না।

ভ্রাতৃস্নেহে মৃতা ভগিনীর আবির্ভাব

সে ১৮৭২ সালের কথা। যশোহরের চাঁচড়া-রাজসরকারের প্রধান কর্ম্মচারী ৺নবীনচন্দ্র বসু মহাশয় তখন সপরিবারে কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটের ৩নং বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, একটী

মেয়ে ও একটি ছোট ছেলে। ১২ বৎসর বয়সে মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল দুর্ভাগ্যক্রমে ছয়মাস গত না হইতেই মেয়েটি মারা গেল, আর শোকের বেগ কমিবার পূর্ব্বেই ছেলেটি অসুখে পড়িল। একে মেয়ের শোকে কাতর, তারপর ছেলেটির অসুখ কমিতেছে না দেখিয়া নবীনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

পুত্রের অসুখের পর কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। একদিন রাত্রিতে নবীনবাবুর স্ত্রী ছেলের কাছে বসিয়া আছেন, নবীনবাবু অপর এক শয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। রাত্রি প্রায় দ্বি-প্রহর, সমস্ত নিস্তব্ধ। এমন সময় নবীনবাবুর স্ত্রীর মনে হইল, কে যেন পাতকুয়া হইতে জল তুলিতেছে। তখনও সহরে অনেক বাড়ীতে জলের কল আসে নাই, কাজেই কুয়ার ব্যবহার পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছিল।

এত রাত্রিতে কুয়াতলায় কে গেল!—মনে এইরূপ বিস্ময়ের উদয় হওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালা খুলিলেন। শুক্লপক্ষের রজনী, আকাশ পরিস্কার, সমস্ত জিনিসই বেশ দেখা যাইতেছে। তিনি জানালায় দাঁড়াইয়া নীচের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, কে একজন কুয়ায় জল তুলিতেছে; বালিকা বলিয়াই বোধ হইল; যেন দেখিতে অনেকটা তাঁহার মেয়েরই মত।

মেয়ের কথা মনে হইতেই তাঁহার চোখে জল আসিল। চোখ মুছিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, বেশ ভাল করিয়া দেখিলেন। তখনও বালিকা ঘাড় হেঁট করিয়া জল তুলিতেছিল, কাজেই মুখ দেখা যাইতেছিল না। তবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁহার মেয়ের মতনই বটে। ভাবিতেছেন, সত্যই কি এ সেই? তবে কি সে জীবিত আছে! কিন্তু তখনই মনে হইল, তাঁহার নিজের কোলেই ত সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। তবে কি সে পেত্নী হইয়াছে? অমনি তাঁহার গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল।

এই সময় বালিকা মুখ তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। মুখের দিকে নজর পড়িতেই তিনি চম্‌কিয়া উঠিলেন। এ কি! এ ত সেই! কিন্তু হারানিধি সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইল না, তিনি মেয়েকে ডাকিতে ত পারিলেনই না, পরন্তু পেত্নী ভাবিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি স্বামীর কাছে গেলেন। তাঁহাকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভয়ে গলার স্বর বাহির হইল না। তখন তাঁহার গা ঠেলিয়া ঘুম ভাঙ্গাইলেন। নবীনবাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়াই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হয়েছে কি? খোকা ভাল আছে ত?" গৃহিণী কম্পিত স্বরে বলিলেন,—"খোকা ত ভাল আছে। ঐ জানালা দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখ গে।

নবীনবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গেলেন, এবং জানালা দিয়া নীচের দিকে চাহিলেন। কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া বলিলেন,—কৈ, কিছু ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না?

—কুয়াতলায়?

—কৈ, কিছুই না।

তখন নবীনবাবুর স্ত্রী স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও নীচের দিকে চাহিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তারপর তাঁহারা বিছানায় আসিয়া বসিলেন, এবং গৃহিণী আস্তে আস্তে সমস্ত ব্যাপার স্বামীকে জানাইলেন। নবীনবাবু স্ত্রীকে ভয়বিহ্বল অবস্থায় দেখিয়া কথাটি উড়াইয়া দিবার জন্য বলিলেন,—ও তোমার চোখের ভুল; কি দেখিতে কি দেখিয়াছ। মরা মানুষ আবার ফিরে আসে নাকি?

উত্তরে গৃহিণী বলিলেন,—চোখের ভুল নয় গো; জ্যোৎস্নার আলোতে তাহার মুখখানি যে বেশ পরিষ্কার দেখেছি!

নবীনবাবু। অনেক সময় ওরূপ ভুল হয়, ও কিছু না।

পরদিন রাত্রিতে দুই জনই ছেলের কাছে বসিয়া আছেন, কারণ ছেলের অসুখ কিছু বেশী হইয়াছে। এমন সময় দরজা খুলিবার শব্দ শুনিয়া উভয়েই সেই দিকে চাহিলেন, এবং যাহা দেখিলেন তাহাতে দুই জনই আতঙ্কে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন যে, তাঁহাদের সেই মৃতা কন্যা ধীরে ধীরে তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। ঠিক সেই চেহারা, সেই বেশ, কেবল মুখখানি কিছু মলিন। ক্রমে সে বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; তারপর কাঁদকাঁদ স্বরে বলিল,—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, একা থাকতে পাচ্ছি নে, খোকাকে আমায় দাও।

তাঁহাদের মুখে কথা সরিল না। তাঁহারা ভয়বিহ্বল ভাবে মেয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা বলিল,—আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি— কথা শেষ হইবার আগেই নবীনবাবু সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কোথায়, কাহার কাছে আছ?

কন্যা। এই বাড়ীতেই আছি। খোকাকে ছেড়ে থাক্‌তে পাচ্ছি নে; খোকাকে আমায় দাও।

নবীনবাবু। ছি! ও কথা কি বল্‌তে আছে? খোকার যে অকল্যাণ হ'বে।

তখন বালিকা কাঁদিতে লাগিল, আর কিছু বলিল না। কন্যার কান্না দেখিয়া তাঁহারাও স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর চোখ মুছিয়া চাহিয়া দেখেন মেয়ে সেখানে নাই,—অদৃশ্য হইয়াছে।

নবীনবাবু এই ব্যাপার প্রথমে প্রকাশ করেন নাই। কারণ হিন্দুর

পক্ষে প্রেতযোনি পাওয়া বড় দোষের কথা। কিন্তু ক্রমে সন্ধ্যার পর বাড়ীতে যেখানে সেখানে যে সে লোক মেয়েটিকে দেখিতে লাগিল। কেহ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠিতেছে, হঠাৎ দেখিল মেয়েটী পাশ দিয়া নীচে নামিয়া গেল। কেহ বারান্দা দিয়া যাইবার সময় দেখিল, মেয়েটী অপর দিকের বারান্দা দিয়া ঘরে ঢুকিল। আবার কেহ বা ছাদের উপর তাহাকে বেড়াইতে দেখিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান করিয়া আর তাহার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। এইরূপে ক্রমে বাড়ীর সকলেই, এমন কি অন্যান্য লোকজনেরা পর্য্যন্তও মেয়েটীকে দেখিতে লাগিল।

এই ভাবে জানাজানি হইতেছে বুঝিয়া, এবং ছেলেটির অসুখ বাড়িতেছে দেখিয়া, নবীনবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ইহার একটা বিহিত করিবার জন্য আমার পিতাঠাকুর হেমন্তবাবু ও খুল্লতাত শিশিরবাবুকে জানাইলেন। জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যোপলক্ষে নবীনবাবুর সহিত তাঁহাদিগের বিশেষ আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে জানাইবার প্রধান কারণ যে, আমাদের পারিবারিক চক্রের কথা তখন চারিদিকে বেশ প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। নবীনবাবু তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা বলিলেন, এবং তাঁহার বাড়ীতে সারকেল করিয়া বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

নবীনবাবুর বাড়ীতে কয়েকদিন সারকেলে বসা হইল, কিন্তু মনঃস্থির করিয়া বসিতে না পারায় বিশেষ ফল হইল না। কারণ ছেলের অসুখের জন্য নবীনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল গয়ায় পিণ্ড দিয়া মেয়ের প্রেতাত্মাকে দূর করা ভিন্ন আর উপায় নাই। সেই দিনই রাত্রির ট্রেণে একজনকে গয়ায় পাঠান হইল।

ইহার পর চার দিন কাটিয়া গেল। পঞ্চম দিবস সন্ধ্যার পর আমার পিতৃদেব নবীনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। নবীনবাবু

মায়ের অকাল মৃত্যুতে সকলেই শোকে ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। বাবা পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। ছোট বোনটীকে তাঁহার কোলে দিয়া কোনরূপে তাঁহাকে শান্ত করা হইত।

বারই ডিসেম্বর। প্রায় এক মাস পরের ঘটনা। বেলা তখন ১০॥টা হইবে। বাবাকে অফিসের জামা কাপড় দিয়া, তিনি বাহির হইলেন দেখিয়া, ছোট বোনটীকে খাইবার জন্য ডাকিতে গেলাম। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখি একটী সোফায় সে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। অসময়ে ঘুমাইতেছে দেখিয়া তাহার গায়ে হাত দিতে যাইব, হঠাৎ পিছন দিকে একটী শব্দ অনুভব করিলাম। ফিরিয়া দেখি, আর একটী সোফার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া,—আমার এক মাস পূর্ব্বের হারাণো মা! তাঁহাকে আবছায়া দেখা যাইতেছে; তাঁহার চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। চম্‌কিয়া উঠিলাম! অজ্ঞাতসারে আমার মুখ হইতে বাহির হইল,—মা, তুমি?

স্বর খুব মৃদু; কিন্তু কণ্ঠস্বর কোনরূপ বিকৃত নহে। মা কহিলেন, —হ্যাঁ, আমি। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তুই একটু বোস, গোটা কতক কথা আছে।

ছোট বোনটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সে তখনও তেমনি ঘুমাইতেছে। ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করিয়া মায়ের নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া কহিলাম,—মা, আমাদের ছেড়ে তুমি কি করে আছ—মন কেমন করছে না? আমরা যে আর থাকতে পারছি না! মা, তুমি আর যেও না। বল, তুমি থাকবে? বলিয়া মাকে যেমনি ধরিতে যাইব, অমনি শশব্যস্তে মা সরিয়া গিয়া বলিলেন,—আমাকে ছুঁয়ো না মা। আমি কি ইচ্ছা করে, তোমাদের ছেড়ে আছি। আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে তোমাদের ছেড়ে, তা'

কি আর বলবার! কিন্তু উপায় ত কিছুই নেই। যাক্, যা' বলছি শোন, ওঁর একটা বিপদ খুব নিকটবর্ত্তী, তাতে ওঁর প্রাণের আশঙ্কা আছে। আমি সাবধান করে' দিতে এসেছি, তাঁকে বল্‌ব।

আমি বলিলাম,—বাবা ত অফিসে বেরিয়ে গেছেন, কা'কে বল্‌বে?

অল্প হাসিয়া মা বলিলেন,—এখনি আসবেন দেখ না; টাকার ব্যাগ ফেলে গেছেন।

দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম, টেবিলের উপর সত্যই ব্যাগটি রহিয়াছে। তখনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাবা দরজার নিকট আসিলেন। আমি উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলাম,—বাবা, মা এসেছে।

বাবা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—কি বল্‌ছ মা?

হ্যাঁ বাবা, ঘরে এস, দেখ্‌বে। আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম।

বাবা তাড়াতাড়ি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, এবং মায়ের নাম ধরিয়া বলিলেন,—সে কই মা? তারপরই সোফার উপর মায়ের আবছায়া মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেই হর্ষবিকশিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—তুমি!

মায়ের চক্ষু দিয়া আবার দ্বিগুণবেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। বাবা তাড়াতাড়ি সোফায় বসিতে যাইতেই, আমি বলিলাম, ওখানে বস না। মা বললেন,—এখন আর আমরা ওঁকে ছুঁতে পারব না।

কি ভাবিয়া বাবা অন্য একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং কি বলিতে যাইতেই বাধা দিয়া মা কহিলেন,—তোমার সঙ্গে দু'একটা কথা আছে। অফিসের সময় বলে তুমি ব্যস্ত হতে পার, কিন্তু

দেরী হ'লেও ক্ষতি হবে না; কারণ, তোমার সাহেবের গাড়ীর সঙ্গে অন্য একটা গাড়ীর ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটবার খুব সম্ভাবনা। বেলা বারটার আগে সাহেব অফিসে আসতে পারবেন না।

সবিস্ময়ে বাবা বলিলেন,—সে কি করে জান্‌লে ?

মৃদু হাসিয়া মা বলিলেন,—জানি ; এখন শোনো কথাগুলো,—বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। সেগুলি আমরা জানাইতে অক্ষম ; তবে এইটুকু জানাইতেছি যে, বাবার খুব একটা বিপদ আসিতেছিল, কি করিলে রক্ষা পাইবেন মা তাহা বলিয়া দিলেন।

মার কান্নার কারণ বাবা জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন,—তোমাদের ছেড়ে বড় কষ্টে আছি, তাই আজ এসেছি।

কথাবার্ত্তার শেষে মা চলিয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেই আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার কান্না দেখিয়া মাও আবার পূর্ব্বের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—কেঁদ না মা, চুপ কর।

আমি বলিলাম,—তুমি যেও না মা। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি থাক।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মা বলিলেন,—সে যে হয় না মা, আমি মাঝে মাঝে আস্‌ব। এখন তুমি একটু ঘর থেকে যাও, ওঁকে দু'একটা কথা বল্‌ব।

আমি চলিয়া আসিলাম। তারপর মায়ের সঙ্গে বাবার কি কথাবার্ত্তা হইল জানি না। কিছুক্ষণ পরে বাবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম মা চলিয়া গিয়াছেন।

সে দিন বাবা অফিস হইতে ফিরিলে শুনিলাম,—সত্যই সাহেবের গাড়ীর সঙ্গে অপর একখানা গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। সাহেবের বা অন্য গাড়ীর লোকেদের কোন অনিষ্ট হয় নাই।

ইহার পর প্রায়ই বাবা এবং আমি মায়ের কথামত তাঁহাকে ডাকিতাম। কখন কখন আমি ডাকিতাম না, বাবাই ডাকিতেন। আমাদের এসব কথা কেহই জানিত না।

একজনকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার শরীরে মৃতাত্মার ভর হইত, কিন্তু তাহা আবার যে কোনও লোকের শরীরে হইত না। আমার এক কাকা ছিলেন তিনি, আমার দিদিমা ও আমি ছাড়া আর কাহারও শরীরে হইত না।

একদিন বাবা নাই, সন্ধ্যার সময় দেখি আমার সেই কাকা আমাদের শোবার ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। হঠাৎ আমার ইচ্ছা হইল মাকে ডাকি। বাবা নাই একথা স্মরণ হইল না। যেরূপ বাবা ডাকিতেন সেইরূপেই ডাকিয়া গল্প করিতেছি, হঠাৎ কয়েক মিনিট পরেই আমার মনে হইল খাটশুদ্ধ আমি শূন্যে উঠিতেছি। কাকা তখনও সেইরূপ অবস্থায় আছেন। খাটখানা ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিয়া কড়িকাঠে ঠেকিল, আবার সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। এই প্রকার দুই চারিবার হইয়া খাটখানি কড়িকাঠের সঙ্গে আটকাইয়া রহিল। মনে হইল আমার গলা কে যেন সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছে, দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। ক্ষণপরেই একটা ভিন্ন কণ্ঠস্বরের কথা শুনিতে পাইলাম,—কেমন জব্দ করেছি, আর কখনও এমন করবি ?

মায়ের আদেশ ছিল, গঙ্গাজল ভিন্ন কখনও ডে'ক না। ঠাকুর-ঘর হ'লেই ভাল হয়। যদিও অন্য কোথাও ডাকা হয়, তা' হলে যে ডাকবে, সে যেন পবিত্র অবস্থায় থাকে। তা' না হ'লে অন্যান্য দুষ্ট আত্মারা অনিষ্ট কর্‌তে পারে, এমন কি প্রাণনাশ হ'তেও পারে। হঠাৎ আমার সেই কথা মনে পড়িল। তবে কি নিজের অজ্ঞাত

অবস্থাতেই কোন অন্যায় করিয়া বসিয়াছি; হঠাৎ মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। তিনি যেন আমার কাণের ভিতর একটি মাত্র উপদেশ দিলেন। এবার খাটখানা নামিতেই আমি ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। এক ঘটি গঙ্গাজল আনিয়া ছিটাইয়া দিতেই কে যেন বলিয়া উঠিল,—ওঃ খুব বেঁচে গেলি! যাঃ, তোর মার দয়াতেই এ যাত্রা রক্ষে পেলি। আমি তখন মুক্তির আনন্দে পুলকিত।

তারপর সে চলিয়া গেল। মাকে আর সেদিন ডাকি নাই। কাকাকে উঠাইলাম। তিনি ত কিছুই জানেন না। উঠিয়া শুধু বলিলেন,—শরীরটা বড় খারাপ লাগছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না। ভর সন্ধ্যাবেলা বড় ঘুমিয়েছি, তাই বোধ হয়।

তাঁহাকে কিছু বলিলাম না। বাবা আসিলে সকল কথা জানাইতেই তিনি বলিলেন,—সর্ব্বনাশ করেছিলে আর কি! আর কখনও ও রকম করো না।

প্রবন্ধ-লেখিকার পিতা শ্রীযুক্ত অভয়াপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শেষে লিখিয়াছেন,—

প্রেসে পাঠাইবার পূর্ব্বে আমার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী এই লেখাটি আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। বুঝিলাম, মা আমার ইং ১৯১৪ সালের ২৪এ নভেম্বর তাঁহাদের প্রসূতির স্বর্গারোহণের পর কয়েকটি ঘটনা,—যাহা ১৯১৪ ডিসেম্বর হইতে ১৯১৫ জানুয়ারী মধ্যে ঘটিয়াছিল,—তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেক ঘটনাই সত্য, তবে উহা প্রচারের কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রবোধবালা দেবীর স্বর্গারোহণের তারিখ ২৪এ নভেম্বর ১৯১৪, এবং প্রথম আবির্ভাব বা পুনরাগমনের প্রথম তারিখ ১২ই ডিসেম্বর ১৮১৪, এবং ঐ

দিনের প্রথম সম্ভাষণ, কেমন আছ? এবং সঙ্গে সঙ্গে দরবিগলিত অশ্রুরাশি; আমি এখনও উহা বেশ মনে করিতে পারি।

পরে শ্রীমতী প্রবোধবালার নাম বা স্মৃতিরক্ষার্থ একটি ম্যাট্রিক স্কুল ২৭এফ., বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট শ্যামবাজার কলিকাতায় স্থাপিত হয়। প্রায় দশ বার বৎসর বহু বালক সেই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। (১)

পীড়িতাবস্থায় পরলোক দর্শন

২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট নিবাসী গোলকগত আশুতোষ বসু মহাশয় একজন পরমবৈষ্ণব ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে তিনি সুপরিচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। গত ১৩১৫ সালের ১০ই বৈশাখের শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি একটি অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা যে অলীক নহে তাহা নিশ্চয়। কারণ বসু মহাশয় এই ব্যাপার চাক্ষুষ দর্শন করেন, এবং অপর যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাহাদিগের নাম ধামও প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে কোনরূপ তঞ্চকতা থাকিলে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। আশুবাবুর লিখিত ঘটনাটি বিবৃত করিতেছি :—

(১) ঘটনাটি ১৩৩৮ সালের মাঘ মাসের 'গল্প লহরী'তে প্রকাশিত হয়। তারপর অভয়পদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় সত্য বলিয়া জানিয়াছিলাম। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইবার পর অভয়াপদ বাবু মারা গিয়াছেন, স্কুলটিও বন্ধ হয়েছে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দের বাড়ী ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত হাদিপুর গ্রামে। হাদিপুর "বারাসত-বসিরহাট" রেলপথের বেড়াচাঁপা ষ্টেসন হইতে এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ১৩১৪ সালের বর্ষাকালে একদিন হঠাৎ যতীনবাবুর বাটিতে সংবাদ পৌঁছিল যে, শঙ্কটাপন্ন পীড়ায় তাঁহার এক ভগিনীর জীবনসংশয়। এই সংবাদ পাইবামাত্র যতীনবাবু তাঁহার ভগিনীর শ্বশুরবাড়ী বসিরহাট গ্রামে গমন করিলেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভগিনীর মুমূর্ষু অবস্থা, সংজ্ঞা নাই; দশদিন সান্নিপাতিক জ্বরবিকারের পর রোগিনী সংজ্ঞাহীন, নিমলিত নেত্র নিস্পন্দ, শীতলাঙ্গ ও নাড়ীর গতি অতি.ক্ষীণ। চিকিৎসার ভার ছিল স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ তারাদাস ঘটক কবিভূষণের উপর।

রোগিণীর পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতেই ইনি চিকিৎসা করেন। পীড়ার একাদশ দিন হইতে রোগিণীর অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া সূচিকাভরণের ব্যবস্থা করিলেন। ছয় দিন ধরিয়া কেবল উহাই সেবন করান হইল। সপ্তম দিবস প্রাতে যতীনবাবু রোগিণীর জীবনে হতাশ হইয়া একবার শেষ দেখাইয়া ক্ষান্ত হইবেন বলিয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়কে আনাইলেন।

ডাক্তারবাবু দুই ঘণ্টা ধরিয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিলেন এবং চৈতন্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার ঘাড়ে এমন এক তীব্র বেলেস্তার দিলেন, যাহা লাগাইলে আসন্ন মৃত্যুকালেও রোগীমাত্রকেই একবারও 'আহা!' 'উহু!' করিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উপর্য্যুপরি বেলেস্তার দেওয়া সত্ত্বেও রোগিণীর চৈতন্য সম্পাদিত হইল না, বা একবারও আহা! উহু! করিয়া তিনি বেদনা জানাইলেন না। ইহা দেখিয়া ডাক্তারবাবু হতাশ হইয়া চলিয়া গেলেন।

এই সময় হইতেই চিকিৎসা ও ঔষধাদি বন্ধ করা হইল, এবং

সকলেই রোগিণীর আসন্ন অবস্থা জানিয়া অন্তিমকালের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে মেয়েদের মধ্যে কাঁদাকাটি পড়িয়া গেল। যতীনবাবুও অতিশয় শোকাকুল হইলেন। এই ভাবে সারাদিন কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রোগিণীর স্বামী কয়েক জন ভক্ত বৈষ্ণবসহ বাড়ীতে 'হরেকৃষ্ণ' নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বাড়ীর ভিতর হঠাৎ—হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে, হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে—এই নাম উচ্চারিত হইতেছে শুনিয়া প্রতিবাসীরা অনেকে বিপদ আশঙ্কা করিয়া ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু নামকীর্ত্তন হইতেছে দেখিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে অবিশ্রান্ত কীর্ত্তনের রোল চলিতে লাগিল। কীর্ত্তনানন্দে সকলে বিপদের কথা ভুলিয়া গেলেন। এই প্রকারে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মকীর্ত্তন করিয়া উহা বন্ধ করা হইল। কিন্তু ভক্তবৃন্দ ভাবাবিষ্ট ইয়া রহিলেন, সকলেই যেন মদিরা পানে উন্মত্তের ন্যায় বিভোর াতোয়ারা, সকলেই অলৌকিক আনন্দরসপ্রবাহে নিমজ্জিত, কাহারও খে কথাটি মাত্র নাই।

যতীনবাবু এতক্ষণ বাড়ী ছিলেন না। এই সময় তিনি বাড়ী াসিলেন এবং খোল করতাল ও ভক্তদিগের ভাবাবেশ দেখিয়া ক্রোধে ন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ভক্তদিগকে লিলেন,—তোমাদের দেখ্‌ছি বড়ই আমোদ লেগে গেছে। আমার বান্‌টা মর্‌ছে, আর তোমরা মহা স্ফূর্ত্তিতে হৈ চৈ আরম্ভ করেছ। তামরা কি মানুষ, না আর কিছু? এই কি তোমাদের আমোদের সময়?

যতীনবাবুর দুর্ব্বাক্য শুনিয়া একজন অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, —মশায়, আমরা ত কিছু আমোদ করি নাই, শ্রীভগবানের ভুবনমঙ্গল াম করিতেছিলাম মাত্র।

যতীনবাবু। আজ কয়েক রাত্রি চক্ষে ঘুম নাই, তারপর মনের এই উদ্বেগ। এখন তোমাদের নাম টাম রেখে দিয়ে সবাই সরে পড়। একজন মর্‌ছে, আর একজন হরি হরি বল্‌ছে।

এইবার আর একজন ভক্ত মহাভাবাবেশে গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—কেন মশায়, মর্‌বেন কেন? আপনার ভগিনী ত রোগমুক্ত হয়েছেন।

এই কথা শুনিয়া যতীনবাবু আরও উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—ও সব ভণ্ডামী রেখে দিয়ে এখন সবাই সরে পড়।

ভক্ত। (ভাবাবেশে) ভণ্ডামী কি মশায়? আপনার ভগিনীর ত আর কোন অসুখ নাই। কালই তিনি অন্নপথ্য কর্‌বেন।

যতীনবাবু। দেখ, পাগলামী করিবার আর কি সময় পাও নি? তোমরা নিতান্ত বেহায়া,—তাই এত কথা শুনিয়াও নড়িতেছ না। যে রোগী সাত দিন অচৈতন্য, এখন তখন অবস্থা হয়ে রয়েছে, তাহাকে কিনা তুমি অন্নপথ্যের ব্যবস্থা দিতেছ! তোমরা নিতান্ত—

যতীনবাবুর কথায় বাধা দিয়া ভক্ত মহাশয় উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—মশায়, আমি মিথ্যা বল্‌ছি না। কাল যাহা ঘটিবে তাহা এখন থাকুক, তাহার অনেক বিলম্ব। আমি বল্‌ছি আজ রাত তিনটার সময় আপনার ভগিনী আপনাকে 'দাদা' বলে ডাক্‌বেন।

যতীনবাবু। (উত্তেজিত ভাবে) রাত্ তিনটার সময় দাদা বলে ডাকবে?

ভক্ত। আজ্ঞে হাঁ মশায়, নিশ্চয়ই।

এই কথা শুনিয়া যতীনবাবু অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং ঐ ব্যক্তিকে জব্দ করিবার জন্য বলিলেন,—আর যদি না ডাকে? তখন কি

হবে? তখন তোমার গলার মালা ছিঁড়্‌বো, আর তোমার ঝুলি কেড়ে নিব, কেমন ত?

ভক্ত। আচ্ছা তাই হ'বে; যদি রাত্রি তিনটার সময় আপনার ভগিনী দাদা বলে না ডাকেন, তবে তাহাই করিবেন। আর যদি আপনাকে দাদা বলে ডাকেন, তাহা হ'লে কি হ'বে?

যতীনবাবু। (উত্তেজিত হইয়া) তাহা হইলে আমি তোমার মত গলায় মালা দিয়ে ও মালার ঝুলি নিয়ে তোমাদের মত বৈষ্ণব হ'ব।

ভক্ত। (আগ্রহ সহকারে) আপনি নিশ্চয় বল্‌ছেন?

যতীন। হাঁ, নিশ্চয় বল্‌ছি।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে ঘড়ি ধরুন্।

অমনি যতীনবাবু ঘড়ি ধরিয়া বসিলেন। তখন রাত্রি ১টা বাজিয়াছে। ভক্তকে জব্দ করিবার জন্য তখন তাঁহার বিষম জিদ পড়িয়া গিয়াছে। তিনি এই ভাবিয়া ঘড়ি ধরিলেন যে, আর দুই ঘণ্টা জাগিয়া থাকিলে, না হয় তাঁহার আর একটু বেশী কষ্ট হইবে, কিন্তু ভক্তকে এমন জব্দ করিয়া ছাড়িবেন যে, ইহজীবনে এমন ভণ্ডামী আর কখন সে যেন না করে।

তারপর আর কেহ কোন কথা বলিলেন না, ভক্তবৃন্দ মালা জপ ও শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন। একটু পরে সেই ভক্ত বলিয়া উঠিলেন,—ব্রজদাদা, এক ছড়া মালার কি হবে? কোথায় মিল্‌বে?

যতীন। কেন গো, এত রাত্রে মালা কি হবে?

ভক্ত। ভোর হলে ত আপনার গলায় দিতে হবে।

যতীন। আচ্ছা তাতো হবে, এখন নিজের গলার মালা সামাল কর। এই দেখ ঘড়িতে তিনটা বাজিতেছে—আর আধ ঘণ্টা মাত্র দেরী।

ভক্ত। বেশ ত, আপনি গলায় মালা দিবেন, আর ঝুলি নিয়ে বৈষ্ণব হবেন, এই মনে করে আমাদের আনন্দ আর ধর্‌ছে না।

যতীন। আর একটু পরে তোমার গলার মালা ছিঁড়্‌বো ও ঝুলি কাড়্‌বো মনে করে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে।

এই প্রকারে বাদানুবাদ হইতে হইতে আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তারপর ঘড়িতে যেমন তিনটা বাজিল, অম্‌নি পাশের ঘর হইতে অব্যক্ত স্বরে চীৎকার ধ্বনি শোনা গেল।

সাত দিন ধরিয়া নানা রকম চেষ্টা করিয়াও যাঁহার শরীরে কোনরূপ সাড়বোধ হয় নাই, হঠাৎ তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া যতীনবাবু চমকিয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ভগিনীর কাছে ছুটিয়া গেলেন; যাইয়াই ভগিনীর নাম ধরিয়া উচৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন রোগিণী অস্ফুট স্বরে 'দাদা' বলিয়া ডাকিলেন।

যতীন। কি বল্‌ছো? এই যে আমি, কিছু খাবে?

রোগিণী। (বিভোর ভাবে) দাদা, আমার কৃষ্ণভাবিনীর বড় খিদে পেয়েছে। সে খেতে চাচ্ছে। তাকে কিছু খেতে দাও।

যতীনবাবু ভাবিলেন, তাঁহার ভগিনীর সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই; তাই তাহাকে চেতন করিবার জন্য একটু উচ্চ গলায় বলিলেন,—তা' হবে এখন, তুমি কিছু খাবে? এই খাবার এনেছি, খাও।

রোগিণী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কাতর স্বরে বলিলেন,—দাদা, ব্রজেনের খোকা কোথায়? সে কি বেঁচে নাই?

যতীন। সে এখন কল্‌কেতায়, ভাল আছে, সে দিন তাকে দেখে এসেছি।

রোগিণী। (ক্রন্দনের স্বরে) না দাদা সে বেঁচে নাই, তুমি

আমাকে ভুলাচ্ছ। আহা! তার মা কত কাঁদ্‌ছে; আমার খুকিকে তার কোলে দাও, তার কোল যে শূন্য হয়েছে।

ব্রজেন যতীনবাবুর ছোট ভগিনীর নাম। তাহার একটী মাত্র ছেলে ২০ দিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছে। সে কথা রোগিণীকে শুনান হয় নাই। আর কৃষ্ণভাবিনী রোগিণীর বড় মেয়ে। এক বৎসর পূর্ব্বে ছয় বৎসর বয়সে সে শ্রীবৃন্দাবনধামে মারা গিয়াছিল।

অতঃপর যতীনবাবু রোগিণীকে কিছু খাওয়াইলেন। তখন প্রায় সকাল হইয়াছে, পাখীরা কলরব আরম্ভ করিয়াছে। এই সময় থানার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল। রোগিণী আহারের পর কিছু সুস্থ হইলেন এবং ভাল করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন।

তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—৭।৮ দিন তুমি অচেতন ছিলে; তোমাকে কত ডাকাডাকি করা হয়েছে, তোমার মেয়েরা তোমার মুখের উপর পড়ে কত ডেকেছে, কত কেঁদেছে, এ সব কি তুমি জান না?

রো। (ক্ষীণস্বরে) না, আমি কিছুই জানি না।

প্র। তোমার কি আদৌ জ্ঞান ছিল না?

রো। বাহিরে জ্ঞান ছিল না, কিন্তু ভিতরে বেশ জ্ঞান ছিল।

প্র। সে অবস্থায় কি কোন কষ্ট বোধ করিতে?

রো। আমি কোন কষ্টই অনুভব করি নাই। আমার দেহ এ জগতে থাকিলেও, আমার আত্মা এখানে ছিল না, এখানকার কোন সংবাদই আমি রাখিতাম না, অন্য এক নূতন জগতে গিয়াছিলাম। এই জড়জগতের কিছুই সেখানে নাই। সে স্থানের তরুলতা ফলমূল সবই বিচিত্র গঠনের, বিচিত্র বর্ণের। সেখানকার নরনারী বালক বালিকা সকলেরই বর্ণ, বেশ, বাক্য, গঠন, চালচলন, ভাবভঙ্গী, সবই

বিচিত্র। আহা! সে যে কি সুন্দর, কি মনোহর, তাহা কথায় বলিয়া বুঝান যায় না,—সেখানে সকলেই আনন্দময়, সকলেই চিরসুখী চিরপ্রফুল্ল, শান্তিদেবী যেন সেখানে সর্ব্বদা বিরাজমানা।

সেখানে একটী দিব্য সুরম্য অট্টালিকার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে অনেকগুলি বালক বালিকা খেলা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে আমার কৃষ্ণভাবিনী ও ব্রজেনের খোকাকেও দেখিতে পাইলাম। তাহাদের দুই জনকে দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। কৃষ্ণভাবিনীকে আমি চিরদিনের জন্য হারাইয়াছিলাম, আর যে কখন তাহাকে দেখিতে পাইব সে আশা আমার মনেও উদিত হয় নাই। কাজেই হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল না। তাহাকে কোলে লইতে গেলাম, সে ছুটিয়া পলাইল, কিছুতেই আমার কাছে আসিল না।

আমি তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কোন কথারই উত্তর দিল না। আমি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কৃষ্ণভাবিনী, তুই এখানে কার সঙ্গে এসেছিস্ মা? এই কথা শুনে সে হাসিয়া উঠিল, কোন জবাব দিল না। তখন আমি বলিলাম,—আয় মা, আমার কোলে আয়, চল আমরা বাড়ী যাই। একথা শুনেও কেবল হাসিতে লাগিল, আমার কাছে আদপেই আসিল না।

প্রশ্ন। এই সাত দিন তুমি ত সেখানে ছিলে? এখানকার মত সেখানে কি দিন রাত্রি হয়?

উত্তর। আমি সেখানে রাত্রি দেখি নাই। আকাশের দিকে তাকাই নাই, কাজেই সূর্য্যদেবকেও দেখিতে পাই নাই। তবে সেখানে সর্ব্বদা দিনের মত, অথচ সূর্য্যের তাপ নাই।

প্রশ্ন। কাল শেষরাত্রে ভয়ানক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলে কেন?

উত্তর। আমার কৃষ্ণভাবিনীকে আগে কথা বলাইবার জন্য কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার সঙ্গে আদপে কোন কথা বলেনি। শেষে ব'লে উঠ্‌ল,—মা, বড় খিদে পেয়েছে কিছু খেতে দাও।

মেয়ে আমাকে মা বলে ডাক্‌ল, আমি আনন্দে অধীর হলেম। কিন্তু আমার কাছে আদর করে খেতে চাইল, আর আমি কিছু খেতে দিতে পারিলাম না বলে বড় কষ্ট পেলাম। তখন হঠাৎ মনে হ'ল দাদার কাছে চাইলে নিশ্চয় খাবার পাব, তাই উর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে 'দাদা' 'দাদা' বলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ছুটিতেছিলাম। আমার কৃষ্ণভাবিনী ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে, তাহাকে তখন খাবার দিতে না পারায় আমার বড়ই দুঃখ হইল, সেই দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে দাদাকে ডাকিতেছিলাম। এইরূপে ডাকিতে ডাকিতে আমার চৈতন্য হইল; ঘুম ভাঙ্গিবার পরে যেমন বোধহয়, আমার তখন সেই রকম বোধ হইতে লাগিল।

তখন চাহিয়া দেখি সে জগৎ নাই, সে নরনারী সে বালকবালিকাও নাই, আর আমার কৃষ্ণভাবিনী ও ব্রজেনের খোকাও নাই! তখন মনে হইল, আমার কৃষ্ণভাবিনী অনেক দিন মারা গিয়াছে, সুতরাং তাহার সঙ্গে যখন ব্রজেনের ছেলেকে দেখিলাম, তখন ব্রজেনের ছেলেও নিশ্চয় মারা গিয়াছে।

এদিকে সকাল হইবা মাত্র যতীনবাবুকে মালা পরাইবার জন্য ভক্তবৃন্দ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এই সময় একজন ভক্ত মালা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তখন ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা বুঝিলেন, শ্রীভগবান্ আজ তাঁহার ভক্তের ও ভক্তির মহিমা জগৎকে দেখাইলেন!

যতীনবাবুকে লইয়া ভক্তগণ প্রাতঃকাল হইতে উচ্চ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এই অলৌকিক সংবাদ পাইয়া গ্রামের

সকলেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই উচ্চ সংকীর্ত্তনের মধ্যে যতীনবাবুর গলায় মালা পরাণ হইল। তাঁহার তখন পুনর্জন্ম হইয়াছে। তিনি আর সে সাবেক যতীনবাবু নাই, তিনি তখন প্রেমানন্দে ডুবিয়া গিয়াছেন, কাজেই বিনা ওজরে পরমোল্লাসে কণ্ঠে মালা ধারণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, ভক্তবৃন্দকে রূঢ়কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া তখন তাহার অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাই তিনি সরল মনে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ভক্তপ্রবর শ্রীল শ্যামাদাস ঘটক মহাশয়ের নিকট শ্রীহরিনামের মালা গ্রহণ করিলেন।

উল্লিখিত ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—ইহা আমার অতিশয় অন্তরঙ্গ নিজজনের মধ্যে ঘটিয়াছে এবং আমি ইহার আদ্যোপান্ত সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিম্নলিখিত ভক্তমহোদয়গণও প্রথমাবধি উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সমুদয় ঘটনা দেখিয়াছিলেন।

শ্রীল শ্যামাদাস ঘটক সাং বসিরহাট. ব্রজনাথ বৈদ্য সাং মৃজাপুর (বসিরহাট), ধ্রুবপদ দাস সাং হরিশপুর (বসিরহাট), মুক্তারাম দাস সাং বাদুড়িয়া, বিপিনবিহারী দাস সাং বসিরহাট, গৌরজীবন ঘটক সাং বসিরহাট, কালিমাধব সরকার সাং মহেশ্বরপুর (বাদু)।

বৈদ্যনাথের পিশাচ

মহাত্মা শিশিরকুমার বৈদ্যনাথ-দেওঘরে অনেক সময় সপরিবারে বাস করিতেন। একবার সেখানে একটি অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়। শিশিরবাবু ইহা স্বচক্ষে দর্শন করেন এবং হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করেন। তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিশিরবাবু লিখিয়াছেন,—এদেশে একটা প্রবাদ আছে যে, ভূতে ঢিল মারে। আমি স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি। বিগত ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দেওঘরে খোলা মাঠের মধ্যে আমার নিজের বাড়ীতে আমি বাস করিতেছিলাম। আমার বাড়ীর সন্নিকটে গনেরী মাহাতো নামক একটী গোয়ালা বাস করিত; সেও খোলা জায়গায়।

একদিন আমি শুনিলাম গনেরীর বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব হইতেছে। এই কথা শুনিবার পরেই তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে ভূতের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—আজ্ঞে হাঁ, সে একটা 'পিশাচ' (অর্থাৎ সর্ব্বনিম্নস্তরের প্রেতাত্মা)। তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম; কারণ সে খৃষ্টান হইয়াছে, কাজেই তাহার ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব স্বীকার না করিবারই কথা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভূত তোমার বাড়ীতে কিরূপ উপদ্রব করিতেছে? কিন্তু সে আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে আমি এই কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম।

ইহার কয়েক দিন পরে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার জন্য এই ভূতের উপদ্রবের কথা আবার আমার স্মরণ হইল। গনেরী আমাকে দুধ যোগান দিত। আমার উড়ে চাকর শিবে তাহার বাড়ীতে প্রত্যহ যাইয়া দুধ আনিত; সে দিনও দুধ আনিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গনেরীর এক বন্ধু শিবেকে অজ্ঞান অবস্থায় আমার বাড়ীতে রাখিয়া গেল।

শিবে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, তাহার এরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তখনও তাহার কথা কহিবার অবস্থা সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসে

নাই। অনেক কষ্টে অস্পষ্ট ভাষায় সে বলিল যে, গনেরীর বাড়ীতে ভয়ানক ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া, সে একটু সকাল সকাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দুধ আনিতে গিয়াছিল। সবে সন্ধ্যা হইয়াছে, সেও দুধ লইয়া গনেরীর বাড়ী ছাড়াইয়া একটু আসিয়াছে, এমন সময় কাল রং‌এর কিম্ভূত কিমাকার কি একটা হঠাৎ লাফাইয়া তাহার উপর পড়িল, এবং তাহার বুকে এমন একটা ধাক্কা মারিল যে, শিবে গোঙ্গাইয়া উঠিয়া সেখানে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পিশাচের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গনেরী তাহার কয়েক জন বন্ধুকে সেই দিন সারারাত্রি থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা আসিয়াছিল। শিবের গোঙ্গানি শুনিয়া তাহারা দৌড়িয়া আসিল, এবং শিবেকে সেই অবস্থায় ধরাধরি করিয়া আমার বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিয়া গেল।

পর দিবস প্রাতে দুইটি সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বন্ধুসহ আমি গনেরীর বাড়ীতে গেলাম। তাহার বাড়ী খোলা মাঠের মধ্যে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তবে ইহার এক দিকে কয়েক ঝাড় বাঁশ ছিল। কিন্তু দিনের বেলা দুষ্ট লোকের এখানে লুকাইয়া থাকা নিরাপদ নহে। দেখিলাম, বাড়ীর মধ্যে ১১।১২ বছরের একটী মেয়ে উঠান ঝাট দিতেছে। উঠানের চারি দিকে মেটে ঘর ও পাচিরে ঘেরা। বাড়ীর অপর সকলে,—অর্থাৎ গনেরী, তাহার ৭০ বছরের বুড়ো মা ও ৪৫ বছরের স্ত্রী,—কেহই বাড়ীতে নাই। মেয়েটী একা ঝাট দিতেছে দেখিয়া আমরা বাড়ীর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার বন্ধুদ্বয় একটু দূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। এই অবসরে আমি কৌতুকচ্ছলে ভূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—ওহে ভূত মশায়, তুমি যদি এখানে থাক, অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে

প্রকাশ হও। দেখ, আমরা ভদ্রলোক, আমাদের সঙ্গে সেই ভাবেই ব্যবহার করিও। এই কথা বলিবামাত্র আমার সম্মুখস্থ ঘরের চালের উপর দিয়া একতাল মাটি গড়াইয়া আসিয়া আমার কাছে পড়িল। ইহাতে আমি বেশ আমোদ উপভোগ করিলাম। কারণ, আমি কখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, ইহা ভূত প্রেতের কাজ। সুতরাং কতকটা আমোদচ্ছলে বন্ধুদ্বয়কে বলিলাম,—দেখ, ভূত মশায় কেমন ক'রে আমার অনুরোধ রক্ষা করলেন। বন্ধুদ্বয় মাটির তাল পড়িবার শব্দ শুনিয়াছিলেন, কিন্তু উহা পড়িতে দেখেন নাই। কাজেই মাটির চাঙ্গড়া পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা আমার নিকটে আসিলেন। আমি আবার ভূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—আমরা তিন জনই তোমার অতিথি। আমাদের সকলের সম্বন্ধেই তোমার একরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করিলে, কিন্তু আমার বন্ধুদিগকে সন্তুষ্ট কর নাই। কৃপা ক'রে তাঁহাদের কাছেও প্রকাশ হও।

এই কথা বলিবামাত্র আর এক চাঙ্গড়া মাটি গড়াইয়া আসিল। এবার আমরা তিন জনই উহা দেখিতে পাইলাম। এই ব্যাপার দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। ভাবিলাম,—ইহা কি ঐ মেয়েটীর কাজ? তাই বা কি করিয়া হইবে, কারণ আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেখান হইতে পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম সে তখনও ঝাট দিতে ব্যস্ত।

আমি আবার বলিলাম,—ভূত মশায়, দয়া করে আমাদের সকল সন্দেহ দূর করুন। যেমন কথা তেম্‌নি কাজ। কারণ তৎক্ষণাৎ এক চাঙ্গড়া, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই চাঙ্গড়া মাটি গড়াইয়া আসিল, আমরা অবাক হইয়া গেলাম। তখন বেলা প্রায় ৯টা। সূর্য্যের কিরণ

চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আকাশ পরিষ্কার। আমরা তিন জনে সেই সুবিস্তৃত মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখিলাম। সেখানে তখন আর কেহই ছিল না, কেবল সেই মেয়েটী উঠান ঝাট দিতেছিল।

এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার অবসর পিশাচ মশায় আর আমাদের দিলেন না; কৌতুক করিয়াই যেমন মাটীর সঙ্গে পাথরের চাঙ্গড়া লইয়াও খেলা সুরু করিয়া দিলেন; তখন আর অনুরোধ উপরোধের আবশ্যক হইল না। তারপর দেখি, উঠানের যে দিকে বালিকা ঝাট দিতেছিল, সে দিকেও পাথর, ইটপাটকেল ও মাটি পড়িতেছে।

আমরা ত একেবারে অবাক হইয়া গেলাম; ভাবিলাম,—কোথা হইতে এই সব আসিতেছে? আকাশ হইতে নাকি? ইহাও বিচিত্র নহে; কারণ, দেখিলাম কতকগুলি ইট ও পাথর আসিয়া মাটির দেয়ালে লাগিতেছে। আমাদের ভয় হইতেছিল পাছে আমাদের গায়ে জোরে লাগে, কিন্তু তাহা লাগে নাই। অবশ্য মাঝে মাঝে দুই একবার কাহারও গায়ে লাগিয়াছিল বটে, তবে বেশী জোরে নয়।

মুহূর্তের মধ্যে এই অলৌকিক ঘটনার কথা ছড়াইয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে লোকেরা ছুটিয়া আসিতে লাগিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সে স্থান লোকে ভরিয়া গেল।

গনেরী মহাতা তাহার মা ও স্ত্রীসহ তখন ফিরিয়া আসিয়াছে। পাছে তাহারা কোনরূপ জুয়াচুরি করে, এই জন্য তাহাদিগকে এক ভিন্ন স্থানে বসাইয়া রাখা হইল। কিন্তু তখন শিলাবৃষ্টির ন্যায় এরূপ মুষলধারে পাথরাদি পড়িতে লাগিল যে, উহার মধ্যে যে কোনরূপ দুষ্টলোকের দুষ্টামি বা ভেল্‌কি থাকিতে পারে, এ বিশ্বাস কাহারও হইল না।

প্রেতাত্মার এই অদ্ভুত খেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার এখনও বলা হয় নাই। উঠানের একধারে একটী পাতকুয়া ছিল। এই কূয়ার মধ্যে জলের তোলপাড় শব্দ হইতেছিল। সেই দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র, হঠাৎ ঐ পাতকূয়ার ভিতর হইতে এক খানি এক মণেরও অধিক ওজনের প্রকাণ্ড পাথর প্রবল বেগে উঠিয়া একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া পড়িল! ইহা দেখিয়া অনেকেই ভয়ে চম্‌কিয়া উঠিল, কতকগুলি লোক পলায়ন করিল, আবার কেহবা ঘরের মধ্যে যাইয়া আশ্রয় লইল।

ভাবিয়া দেখুন, ইহা কতদূর বিস্ময়কর ব্যাপার! একখানি প্রকাণ্ড পাথর, যাহা একজন বলিষ্ঠ লোকের পক্ষে লইয়া যাওয়া সহজসাধ্য নহে, তাহা ২৫।৩০ হাত গভীর কূপের তলদেশ হইতে আপনা আপনি উঠিয়া একেবারে উঠানের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িল! ইহা অপেক্ষা অলৌকিক ও অদ্ভূত ব্যাপার আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহা কে করিল? ইহা যে কোন অদৃশ্য শক্তিবলে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কাজেই ইহা দেখিয়া মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সে আর অধিক কথা কি?

শিশিরবাবু আরও লিখিয়াছেন,—আমার মনে হইতেছিল মেয়েটী মিডিয়ম, অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রেতাত্মা এই সকল অলৌকিক কাণ্ড কবিতেছে। একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, বালিকাটি যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছে, সেই স্থানেই ইট পাট্‌খেল বেশী পড়িতেছে। আমার এই ধারণা ঠিক কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি বালিকাকে ও গনেরীর স্ত্রীকে বাড়ীর পূর্ব্বদিকের মাঠে লইয়া গেলাম। এই জমিতে সরিষার ক্ষেত ছিল, এবং তখন শরিষার গাছ তুলিয়া লওয়ায়

উহা খালি মাঠে পরিণত হইয়াছে। এই মাঠটি মাটির চাঙ্গড়ায় পরিপূর্ণ, এবং সম্ভবতঃ এখান হইতেই ভূতটা মাটীর চাঙ্গড়া সংগ্রহ করিয়া থাকিবে। আমি স্ত্রীলোক দুইটীকে এই মাঠের মধ্যে বসাইয়া রাখিলাম।

কি আশ্চর্য্য! তাহারা সেখানে বসিবামাত্র তাহাদিগের চারিদিকে মাটির চাঙ্গড়া গুলি যেন নৃত্য করিতে লাগিল, অর্থাৎ কখন মাটির একটা চাঙ্গড়া ৪।৫ ফিট উপরে উঠিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ জমিতে পড়িয়া যাইতেছে। কখন বা এক সঙ্গে কয়েকটি উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। এই ভাবে চাঙ্গড়া গুলি উঠিতে পড়িতে লাগিল।

তখন বেলা প্রায় ১১টা বাজিয়াছে। চারিদিকে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। সেই সময় সকলের সম্মুখে মাটির চাঙ্গড়া গুলি ঐ ভাবে উঠিতেছে ও পড়িতেছে; বোধ হইতেছে, তাহারা যেন জীবনীশক্তি, পাইয়াছে। তখন আমার মনে হইল, বালিকাটি মাঠের মধ্যে বসিয়া আছে বলিয়াই মাটির চাঙ্গড়া গুলি বেশী দূরে নিক্ষেপ করিবার শক্তি ভূত মহাশয়ের এখন আর নাই। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেল; স্ত্রীলোকদ্বয় সেখানে আসিবার পর গনেরীর বাড়ীতে মাটির চাঙ্গড়া পড়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

তারপর গনেরীর স্ত্রী ও মেয়েকে লইয়া আমি একখানি ঘরের মধ্যে গেলাম এবং সেখানে আমরা মুখোমুখি হইয়া বসিলাম। বাহিরে যেরূপ আলো, ঘরের মধ্যেও প্রায় সেইরূপ পরিষ্কার আলো ছিল। সেখানে বসিয়া আমি ভূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম যে, তাহার পক্ষে অলৌকিক ব্যাপার দেখাইবার এই ঠিক সময়। এই কথা বলিয়া আমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

উপরে বলিয়াছি গনেরীর স্ত্রী ও মেয়েকে লইয়া আমি ঘরের

মধ্যে বসিয়াছিলাম। আমার পিঠের দিকে দড়ির একটা শিকা টাঙ্গান ছিল; আর তাহার উপর শালপাতার একটা দোনাতে কুর্ত্তির ডাউল ছিল। আমার পশ্চাৎ দিকে খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া আমি ফিরিয়া দেখি, সেই শালপাতার দোনা যেন সেখান হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে! সামান্য চেষ্টা করিয়াই উহা বাহির হইল এবং শূন্যভরে আসিয়া কুর্ত্তির ডাউল গুলি আমার মাথার উপর ঢালিয়া দিল! এই ঘটনাতে আমার একটু স্ফূর্ত্তি হইল বটে, কিন্তু একটু ভয়ও হইল। যাহাহৌক এই ঘটনা দ্বারা বোঝা গেল প্রেতাত্মাটির একটু রসিকতাও আছে। আমিও আমোদ করিয়া বলিলাম,—অ্যাঁ! তুমি আমার মাথাটি অপবিত্র করে দিলে? কিন্তু ভূতমশায় ত কথা বলিতে পারেন না, কাজেই আমার কথার কোন উত্তর পাইলাম না। তবে ২।১ মিনিট পরে আবার সেই দিকে হইতে খস্ খস্ শব্দ আমার কাণে গেল। এবার দেখিলাম, একটী কাঠের বাটি হইতে শব্দ আসিতেছে। এই কাঠের বাটিও সেই শিকাতে বন্দি দশায় রহিয়াছে এবং আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। একটু পরে সে মুক্তিলাভ করিয়াই শূন্যভরে আমার দিকে আসিয়া আমার মাথার উপর লবণ ঢালিয়া দিল! এই হইল ভূত মহাশয়ের দ্বিতীয় কৌতুক। ইহা দেখিয়া বেলা দুই প্রহরের সময় আমরা তিন জন সেখানে বসিয়া হাসিতে লাগিলাম।

এই ঘরের এক কোণে প্রায় চৌদ্দ পোয়া লম্বা এক গাছা বাঁশের লাঠি ছিল। একটু পরে দেখিলাম, লাঠি খানা হঠাৎ নড়িয়া উঠিল, বোধ হইল কেহ যেন উহা নাড়িতেছে। তারপর উহা খাড়া হইল, এবং আস্তে আস্তে লাফাইতে লাফাইতে আমার দিকে আসিতে লাগিল। বোধ হইল কেহ যেন দুই হাত দিয়া উহা ধরিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে! শেষে হঠাৎ মাটীর উপর ভীষণ জোরের সহিত এই

লাঠির আঘাত হইল। আমার পরম সৌভাগ্য যে, কয়েক ইঞ্চি ব্যবধানের জন্য আমার মাথা বাঁচিয়া গেল। এই লাঠি যদি আমার মাথায় সেইরূপ জোরের সহিত পড়িত, তাহা হইলে মাথা ফাটিয়া যাইত। যাহাহৌক তখন আমার মনে হইল, এখান হইতে শীঘ্র আমার চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিয়াই পিশাচ মশায় এইরূপ ভাবে ভয় দেখাইতেছেন।

প্রেতাত্মার সহিত তিন বৎসর

কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুতোষ দাসগুপ্ত কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা সাইকিক্যাল সোসাইটীর একটী অধিবেশনে একটী অত্যাশ্চর্য্য ভৌতিক ঘটনার বিবরণী পাঠ করেন। তিন বৎসরকাল ধরিয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসগৃহে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। অমুতোষবাবু একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। মৃতব্যক্তির আত্মার অস্তিত্ব ও পরলোক সম্বন্ধে তাঁহার আদপে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তিনবৎসর যাবৎ এই ভৌতিক উপদ্রব ভোগ করিয়া শেষে এই সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক ডাঃ তুলসীদাস কর, অধ্যাপক ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, বৌবাজার ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। অমুতোষবাবু যেরূপভাবে ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিতেছি :—

ইংরাজি ১৯২২ সালে আমি সপরিবারে কলিকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সন্নিকট চাঁপাতলায় বাস করিতাম। সেপ্টেম্বরের প্রথমে আমার বাড়ীতে কতকগুলি সামান্য ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্তু আমি সে সব গ্রাহ্য করি নাই। আমার কয়েকটি ছোট মেয়ে নিজেরা খেলাধূলা করিত। তাহারা প্রায়ই বলিত,—কে আসিয়া আমাদের খেলিবার জিনিষগুলি লণ্ডভণ্ড করিয়া রাখে।

ইহার কিছুদিন পরে আমার মেয়েরা একদিন বলিল, ৭।৮ বৎসরের একটী সুন্দর সুশ্রী বালিকা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়াছে। সে আসে, তাহাদের সঙ্গে গল্পগুজব ও খেলাধূলা করে, এবং মাঝে মাঝে চাঙ্গারী চাঙ্গারী খাবারও আনে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, তাহার দিদিমার অনেক টাকাকড়ি আছে। তাঁহার দশ বৎসরের একটি মেয়ে সম্প্রতি মারা গিয়াছে। সে দেখিতে ঠিক আমার দশ বৎসরের মেজ মেয়ে অমিয়র মতন। তাহার জন্যই তিনি ঐ মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দেন। অমিয় বলিত,—সেই মেয়েটির দিদিমার সঙ্গে আমার প্রায় দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়।

আমার স্ত্রী ও আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সেই মেয়েটিকে কোন দিন দেখিতে পাই নাই। আমাদের তখন মনে হইত যে, মেয়েটী অত্যন্ত লাজুক বলিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করে না। কিন্তু মিষ্টান্ন এত বেশী ও এত ঘন ঘন আসিতে লাগিল যে, উহা লইয়া কি করিব তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিতাম না। শেষে সেই অদ্ভুত মেয়েটীর দিদিমাকে অনুরোধ করিয়া একদিন এই ভাবে একখানা পত্র লিখিলাম,—সামান্য কারণে এইরূপ অনর্থক অর্থ ব্যয় [ক]রিয়া আর মিষ্টান্নাদি পাঠাইবেন না। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত [ক]রিলেন না, পূর্ব্বের মতই খাবার আসিতে লাগিল।

আমার বাড়ীতে তাহার প্রেরিত মিষ্টান্ন অনেক জমা হইতে লাগিল; কাজেই আমার বাড়ীতে যে কেহ আসিতেন, তাঁহাকেই পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইতাম। এইরূপ আতিথ্যসৎকারের জন্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে আমাদের এমন সুনাম হইয়াছিল যাহা অনেক অর্থশালী লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন আমরা জানিতে পারিলাম যে, আমাদের টাকাকড়ি হারাইতেছে। এইরূপে প্রত্যহই—এমন কি আমার সুদৃঢ় বাক্স হইতেও—টাকা খোয়া যাইতে লাগিল। তখন আমার মনে হইতে লাগিল, এই বাড়ীতে এমন একটুও স্থান নাই যেখানে সর্ব্বদা পাহারা দিয়াও অর্থাদি নিরাপদে রাখিতে পারি।

২০শে সেপ্টেম্বর আমার মাতাঠাকুরাণী ও আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী গঙ্গাস্নান করিতে কলিকাতায় আসিয়া, কিছুদিন আমার বাড়ীতে রহিলেন। একদিন আমরা গঙ্গাস্নান করিতে যাইব বলিয়া ঘরের দরজা‹ জানালা বন্ধ করিলাম। তাহার পূর্ব্বে—বাড়ীর সকলের অজ্ঞাতসারে—আমার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের একটী টানার কাগজ-পত্রের মধ্যে টাকাকড়ি রাখিয়া, উহা ভাল করিয়া চাবি বন্ধ করিলাম। তখন আমার মনে হইতেছিল, হয় ত আমার অনুপস্থিতির সময় টাকা চুরি যাইবে; এবং সেইজন্য আমি উহা এরূপ সতর্কতার সহিত রাখিলাম যে, কোথায় কি ভাবে রাখা হইল তাহা কেহই জানিতে না পারে। আমি কতকগুলি দশ টাকার নোট রাখিয়াছিলাম, এবং উহার প্রত্যেকখানিতেই আমার নামের রবারষ্ট্যাম্পের ছাপ ছিল। আমরা বাড়ীতে ফিরিয়াই উপরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, আমার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের যে টানা চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা খোলা রহিয়াছে; আর, টানার মধ্যে

যে নোট রাখিয়াছিলাম তাহার কতকগুলি নাই ! যদিও সে অনেকগুলি নোট লইয়াছিল, কিন্তু আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সমস্তগুলি লইয়া যায় নাই। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম চোর মহাশয় বেশ সদ্বিবেচক। তাহার এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম। ক্রমে দেখিলাম সাড়ীর আঁচলের গাঁ'ট ও কাপড়ের ভাঁজের মধ্য হইতেও টাকা চুরি যাইতেছে। তখন মনে হইতে লাগিল, আমি একজন যাদুবিদ্যাবিশারদ ভয়ানক বদমায়েসের খপ্পরে পড়িয়াছি। কিন্তু চোর মহাশয় আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সমস্ত অর্থ অপহরণ করিতেছেন না কেন, ইহা আমি আদপে বুঝিতে পারিলাম না। তখন ভাবিতে লাগিলাম, বাহিরের কোন লোকের পক্ষে এইরূপ ভাবে চুরী করা কি সম্ভবপর হইতে পারে ? আবার মনে হইতে লাগিল, বাড়ীর লোকেই বা এইভাবে চুরি করিবে কেন ? এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহা কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম।

অবশেষে ৮ই অক্টোবর তারিখে পুলিশে জানাইলাম। পুলিশ আসিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কিনারা কিছুই হইল না। ১১ই অক্টোবর তারিখে দিনের বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইলাম, বারান্দায় আমার যে নূতন ধুতি শুখাইতেছিল, তাহা কে ছিঁড়িয়া একেবারে অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। বাড়ীর মেয়েদের ডাকিয়া দেখাইলাম, এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা ইহার কোন খোঁজখবর রাখে কিনা ? কিন্তু খবর রাখা ত দূরের কথা, ইহা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল এবং বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য আমি আর একখানি নূতন কাপড় এত উপরে টাঙ্গাইয়া দিলাম, যেখানে আমার পরিবারস্থ

কেহই উহা স্পর্শ করিতে না পারে। তারপর, পাশের বাড়ী হইতে শোনা যায়, এইরূপ চিৎকার করিয়া আমি সেই অপরিচিত ও অদৃশ্য অনিষ্টকারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—দেখি তোমার কতদূর আস্পর্দ্ধা, এই কাপড় খানি ছেঁড় দেখি? ইহাই বলিয়া, ইহার ফল কি হয় দেখিবার জন্য সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু আমি যতক্ষণ বাড়ীতে ছিলাম তাহার মধ্যে কিছুই হইল না।

আমি বিকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম। রাত্রি নয়টার সময় বাড়ীতে ফিরিবামাত্র সকলে আসিয়া উৎকণ্ঠিত ও উত্তেজিত ভাবে বলিল, প্রথম কাপড়খানির মতন এই খানিও ছিঁড়িয়াছে! শুধু তাহাই নয়, বাড়ীতে যত কাপড় ছিল—এমন কি, তাকের উপর যে সার্ট ও কোট গুলি ছিল—তাহাও ছিঁড়িয়াছে! আমি শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। তখন চাবিবন্ধ ট্রাঙ্কগুলির মধ্যে যে সকল কাপড় জামা ছিল, সে গুলির অবস্থা কি হইয়াছে দেখিবার জন্য—উদ্বিগ্ন চিত্তে ও ভয়ে ভয়ে—কতকগুলি ষ্টীলট্রাঙ্কের চাবি খুলিলাম, এবং দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, বাণ্ডিলে বান্ধা যে সকল সার্ট ও কোট ছিল, তাহার মধ্যে মধ্যে কতকগুলি ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে!—যেন আমার আস্ফালনের জবাব স্বরূপই কেহ ঐরূপ করিয়াছে। যেরূপ ভাবে ছিঁড়িয়াছে তাহা দেখিলেই, ইহা যে টাট্‌কা ছেঁড়া তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার অনুপস্থিতির সময়ে মুহূর্ত্তের জন্যও যে আমার ঐ ঘর লোকশূন্য হয় নাই, অনুসন্ধানে তাহা জানিতে পারিলাম। উপস্থিত লোকদিগের চক্ষুর সম্মুখে কি করিয়া এরূপ একটা ভয়ানক কা— ঘটিল—অথচ সেই ধূর্ত্ত ব্যক্তি ধরা পড়িল না—ইহা আমি ধ.

করিতেই পারিলাম না। গণ্ডগোলের জন্য অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রান্না স্থরু না হওয়ায়, আমি খিঁচুড়ি রান্ধিতে বলিয়া দিলাম।

আহারের পর নীচে আমার বৈঠকখানায় যাইয়া বসিবার দুই মিনিট পরেই জানিতে পারিলাম, যে পাত্রে আমি খিঁচুড়ী খাইয়াছি তাহা কে আমার বিছানার উপর তুলিয়া রাখিয়াছে! যাহাহৌক আমার ভগিনী সেই পাত্র স্থানান্তরিত করিলেন। তখন আমরা ঘরে বসিয়া সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, এমন সময় দেখা গেল সেই পাত্রখানি আমার বালিশের উপর রহিয়াছে! এত লোকের মাঝে কি করিয়া ইহা আবার সেখানে আসিল, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম।

এমন সময় দেখা গেল, আমার বিছানার মাঝখানে একটী পুতুল রহিয়াছে! পুতুলটী এই ঘরের একটী আলমারী হইতে যে আনা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে কখন এবং কি ভাবে কে যে আনিল, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। আমি তখন আলমারীটি তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটু পরে দেখি, আরও দুইটী খেলনা আমার বিছানার উপর রহিয়াছে! একটু পরে আবার একটী—এবং ক্রমে আরও কয়েকটী—পুতুল আমার বিছানায় আসিল। এই পুতুলগুলি সমস্তই যে আমার আলমারী হইতেই আসিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম, অথচ আলমারীটী চাবিবন্ধ রহিয়াছে।

এতক্ষণ পুতুলগুলি কিভাবে যে বিছানার উপর আসিল, তাহা আমরা কেহই দেখিতে পাই নাই বটে, কিন্তু একটু পরে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইলাম, পুতুলগুলি শূন্যভরে নিঃশব্দে চলিয়া

আসিতেছে। বিশেষ সতর্কতার সহিত যাঁহারা এই ঘটনা অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে—আমার কি অপর কাহারও দ্বারা—এইরূপ নিঃশব্দে, এই অল্প সময়ের মধ্যে, এতগুলি পুতুল যে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়, তাহা কাহারও বিশ্বাস হইল না। এই ঘরের এক কোণে লক্ষ্মীর একটী প্রতিমূর্ত্তি ছিল এবং তাহার কাছে শঙ্খ কড়ি ফুল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখা হইয়াছিল। এই কড়ি ও ফুলগুলিও ক্রমে আমার বিছানার উপর আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদিগের শূন্যভরে আসা কেহই দেখিতে পাইল না।

এই সময় আমরা সকলে ঘর হইতে বাহিরে আসিলাম এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। তখন সেই জনমানবশূন্য ঘরে কোন রকম কিছু ঘটে কি না, তাহাই দেখিবার জন্য আমরা ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ৩।৪ মিনিট বাদে প্রথমে আমি—তৎপরে অপর সকলে—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, সেখানে অনেক অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। আলমারীর ভিতর রাধা ও কৃষ্ণের দুইটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি বিভিন্ন স্থানে ছিল। প্রথমতঃ দেখা গেল, সেই মূর্ত্তি দুইটী বাহির করিয়া, ঘরের যে কোণে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ছিল তাহারই পাশে যুগলভাবে রাখা হইয়াছে; এবং কতকগুলি কড়ি ফুল ও খেল্‌না সুন্দররূপে নানা রকম করিয়া মূর্ত্তিগুলির নিকট সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই খেলনাগুলি অবশ্য তালাবদ্ধ আলমারীর মধ্য হইতে বাহির করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যাপার নিবারণ করিবার জন্য আমরা সকলে আপন আপন শয্যায় শয়ন করিলাম। সে রাত্রিতে আর নূতন কিছু ঘটিল না।

পরদিবস আমি মুচিপাড়া থানায় গিয়া ইনেস্পেকটর হামি— সকল কথা জানাইলাম। তিনি স্থিরভাবে মনোযোগের সহিত আ

কথাগুলি শুনিলেন, এবং অনুসন্ধানার্থে দুই জন পুলিশ কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু গোপনে আমাকে বলিলেন যে, আমার এই বিপদ সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ সাহায্যই করিতে পারিবেন না; এবং একজন ভাল ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আনাইয়া আমাদের দেবদেবীকে পূজা দিতে পরামর্শ দিলেন; কারণ আমাদের যদি কোন উপকার হয় তবে ইহা দ্বারাই হইতে পারিবে। তাঁহার এই কথার অর্থ আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তিনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছেন এবং এই কাজে মনোযোগ দিতেছেন না, মনে হওয়ায় আমি দুঃখিত হইলাম। তাঁহাকে একজন সুদক্ষ সাহসী ও বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী বলিয়া সকলেই জানে। আমার মনে হইতেছিল, তিনি নিজে যদি ইহার তদন্তভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বদ্‌মায়েস্ নিশ্চয় ধরা পড়িবে। সুতরাং তদন্তের ভার লইবার জন্য আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি বিনয়নম্রবচনে বলিলেন,—পূজার্চ্চনা ভিন্ন ইহা হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। যাহাহৌক শেষে দুইজন পুলিস কর্ম্মচারীকে লইয়া আমি ঘটনাস্থলে ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহারা বিশেষভাবে তদন্ত করিলেন, শেষে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চলিয়া গেলেন। কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস হইল, এই সম্বন্ধে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারা তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

পরদিবস হইতে দিন দুপুরেও এইরূপ অত্যাশ্চার্য্য ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হয়। তবে সামান্য কয়েকটা বিষয় বলিতেছি। নীচে রান্নাঘরে বসিয়া আমার স্ত্রীর মনে হইল তাঁহার একটা বাটির প্রয়োজন; তৎক্ষণাৎ উপরের ঘর হইতে কে যেন একটা বাটা আনিয়া তাঁহার কাছে রাখিল। আহার করিতে বসিয়া আমার স্ত্রীর কিছু তেঁতুল

আবশ্যক হইল; অমনি কে যেন খানিকটা তেঁতুল আনিয়া তাঁহার থালার উপর ফেলিয়া দিল। বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আমার একটা দেশলাইয়ের বাক্সের আবশ্যক হইল; অমনি একটা দেশলাইয়ের বাক্স আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। কে যে এইরূপ করিতেছে, তাহা আমরা আদপে জানিতে পারিলাম না। আমার মাতাঠাকুরাণী আহার করিতে বসিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি আসিলে তিনি বলিলেন,—এক অদৃশ্য হস্ত এই বাটিটি আমার থালার উপর রাখিতেছে। আমি সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলাম,—মাকে আর বিরক্ত করিও না, উঁহাকে স্থির হইয়া খাইতে দাও। তাহার পরেই উহা বন্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু পরদিবস অত্যাচারের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। আমার মাতাঠাকুরাণী উননের কাছে বসিয়া তাঁহার নিজের ভাত রাঁধিবার জোগাড় করিতেছেন, আগুন তখনও ধরে নাই, হঠাৎ উননটি আশ্চর্য্যভাবে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিরূপে ইহা ঘটিল, তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না। আমরা সমস্ত বাড়ী তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিন্তু উননের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন নানাবিধ উপায়ে তাঁহার রাঁধিবার ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু প্রত্যেকবারই উহা পণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। কাজেই তাঁহাকে সারাদিন উপবাসী থাকিতে হইল। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, ইহা একটী স্মরণীয় দিবস; এই দিনই তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা নোয়াখালীতে মারা গিয়াছিল, এবং সেইজন্য তাঁহাকে কলিকাতায় উপবাসী থাকিতে হয়। সেই দিন বিকালবেলা আমরা উপরের ঘরে বসিয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, এমন সময় কে যেন সেই উননটী অভগ্ন অবস্থায় আনিয়া আস্তে আস্তে আমাদের সম্মুখে নামাইয়া দিল! এইরূপ ভাবে উহার আবির্ভাব হওয়ায় আমরা একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম।

ক্রমে এই সকল ঘটনা আরও ভয়ানক আকার ধারণ করিল, সুতরাং আমাদের মনে আরও অধিকতর আতঙ্ক হইতে লাগিল। দিন দুপুরে বাসন তৈজসপত্র চা'র সরঞ্জাম ইত্যাদি আপনা আপনি জোরের সহিত মেঝের উপর পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। উপরের ঘরে অনবরত এইরূপ তাণ্ডব নৃত্য হইতে থাকায়, আমি পরিবারস্থ সকলকে ঐ ঘর হইতে বাহির করিলাম, এবং উহার সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তবুও ঐ ঘর হইতে দ্রব্যাদি বাহিরে আসিয়া, আমাদের সম্মুখেই নীচের উঠানে জোরে জোরে পড়িয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। আমাদের গৃহস্বামিনী পাশের বাড়ীর ছাদ হইতে এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন,—তোমরা এখনই আমার বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাও, কারণ ইহা ভূতের বাড়ী বলিয়া জানাজানি হইলে আর কোন ভাড়াটে আসিবে না।

একদিন বেলা একটার সময় আমি বিশ্রামের জন্য শয়নগৃহে যাইয়া দেখি, আমার বিছানার উপর রসগোল্লার মত বড় একটা লাড্ডু রহিয়াছে! ইহা সুজি চিনি নারিকেল ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত, এবং ঘৃতে ভাজিয়াই গরম গরম আনা হইয়াছে। আমি উহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম; এই ধরণের লাড্ডু কলিকাতার কোন মিষ্টান্নের দোকানেই বিক্রী হইতে দেখি নাই। এই সময় আর একটী লাড্ডু আসিল, একটু পরে আর একটী, তারপর আরও একটী! তখন মনে হইল গরম গরম লাড্ডু যেন খোলা হইতে উঠাইয়া আনা হইতেছে। ঘরে তখন বাড়ীর সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি সকলের নিষেধ সত্ত্বেও ইহার একটী লাড্ডু খাইলাম। ইহা বেশ সুস্বাদু ও গরম। এই সময় জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইতেই নীচের

বারান্দায় নগেন্দ্র মুখার্জি নামক এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে একটী লাড্ডু দিয়া বলিলাম,—তুমি এখনই অনুসন্ধান করিয়া দেখ, নিকটের কোন দোকানে এইরূপ লাড্ডু পাওয়া যায় কি না। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, ইহাকে 'আনন্দ লাড্ডু' বলে; কলিকাতায় কোন খাবারের দোকানে উহা তৈয়ার হয় না।

পরে জানিতে পারা গিয়াছিল যে, ঐ দিন ঠিক ঐ সময় কলিকাতা হইতে তিনশত মাইল দূরে—আমাদের ঢাকা-জয়দেবপুরের বাড়ীতে—আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী ঐ লাড্ডু তৈয়ার করিতেছিলেন। তাঁহার একটী মেয়ে সেখানে বসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। কিন্তু আমার বৌদিদি লাড্ডু খোলায় ভাজিয়া থালায় রাখিতেছেন, আর উহা কোথায় যাইতেছে; ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহার মেয়েকে বলিলেন,—তুই লাড্ডু গুলি খেয়ে ফেল্‌ছিস্‌ কেন? মেয়ে ত অবাক! সে বলিল,—সে কি! শপথ করে বল্‌ছি আমি একটা লাড্ডুও খাইনি, কে খেয়েছে তাও জানিনে।

অবশ্য আমি বলিতে পারি না যে, তিনশত মাইল ব্যবধানে যে দুইটী ব্যাপার ঠিক একই সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি না; তবে ইহা যে অতি আশ্চর্য্য ঘটনা তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, জয়দেবপুরে যে লাড্ডু অদৃশ্য হইল, তাহাই তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় ছুটিয়া আসিল, তাহা হইলে বায়ুর সহিত সংঘর্ষে যে ইহাতে আগুণ ধরিয়া গেল না, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

আমার বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীরা আমাকে বলিলেন যে, এই ব্যাপার বন্ধ করিবার জন্য ওঝা আনা আবশ্যক। কিন্তু ওঝা অ

বন্ধ না করিয়া, এই ঘটনাবলী বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করাই আমার ইচ্ছা। প্রকৃতই যদি ইহা ভৌতিক কাণ্ড হয়, এবং পরীক্ষা দ্বারা প্রকৃতই তাহা প্রমাণিত হয়, তবে এই নূতন তথ্য জানিবার জন্য, যে কোন রকমের ক্ষতি স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম।

যাহাহৌক শরৎচন্দ্র পাল নামক জনৈক বন্ধু একজন ওঝা আনিলেন। যখন ওঝা আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর আমি তাহার কার্য্যে বাধা দিলাম না। ওঝা তাহার কার্য্য শেষ করিয়া একখানি বাঁশ লইয়া যাইবার সময়, আমাদিগকে ইহাই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়া গেল যে, ভূতকে সে বাঁশের ডগায় বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছে, সুতরাং তাহার দৌরাত্ম্য আমাদের আর ভোগ করিতে হইবে না।

ওঝার আশ্বাস বাক্য সত্ত্বেও আমার বাড়ীর ব্যাপার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল বিষয় আমি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলাম না; কারণ তাহা হইলে আমার বাড়ী দর্শকে ভরিয়া যাইত এবং আমাকে নানা প্রকার বিদ্রূপ ও কটূক্তি ভোগ করিতে হইত। সে সময় কলিকাতায় কোন অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক সভা সমিতির অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমার জানা ছিল না। কাজেই এতদিন নানা অশান্তি ও নৈরাশ্য ভোগ করিয়া, শেষে বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সেক্রেটারী অধ্যাপক ডাঃ তুলসীদাস কর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত আমার কথাবার্ত্তা শুনিলেন এবং এই সম্বন্ধে আমাকে অনেক প্রশ্নও করিলেন। আমিও তাঁহার যথাযথ উত্তর দিলাম। তখন তিনি তিন দিন পরে আমাকে আবার সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন; কারণ তিনি বলিলেন,—সোসাইটীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

এই তিন দিন দৌরাত্ম্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইল। একদিন বাসনাদি ভাঙ্গিবার ভয়ে, একটী থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া উহার মুখ শক্ত দড়ি দিয়া দৃঢ় করিয়া বান্ধিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! থলিয়া যে ভাবে বান্ধা ছিল তাহাই রহিল, অথচ উহাতে কোনরূপ ছিদ্র না করিয়া, থালাবাটীগুলি আপনা হইতেই বাহির হইয়া, ঘরের মেঝের উপর অত্যন্ত জোরের সহিত পড়িতে লাগিল,—বোধ হইল যেন কোন পাগল রাগে অন্ধ হইয়া ঐরূপ করিতেছে।

নিম্নতলে আমার বৈঠকখানা ঘরে একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স থাকিত। একদিন বেলা দুইপ্রহরের সময় আমরা সকলে উপরের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশি শূন্যভরে উপরের ঘরে আসিতেছে এবং আমার সম্মুখে মেঝেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইতেছে। নীচের বৈঠকখানা ঘর হইতে সোজাসুজি উপরের ঘরে শিশি গুলি ছুড়িয়া ফেলা যায় না। বিশেষতঃ নীচের ঘরে তখন কোন লোকও ছিল না। শিশিগুলি যে আমার বৈঠকখানা ঘরের বাক্স হইতে আসিতেছে, তাহা প্যাকিং ও লেবেল দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম।

দিন দুপুরে এইরূপ কাণ্ড দেখিয়া আমার মনে হইল, বৈঠকখানা ঘরে যে ল্যাম্প ও চিম্নি আছে, উহাও ত ঐ প্রকারে ভাঙ্গিতে পারে? এই কথা মনে হইবামাত্র দেখি, চিম্নিটী প্রকৃতই উপরে আসিল এবং আমাদের সম্মুখেই মেঝের উপর জোরে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল! এই সকল ব্যাপার অনবরত দেখিয়া, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা এরূপ অভ্যস্থ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই ঘটনা দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না।

এই ব্যাপার দেখিয়া, আমি আমার বন্ধু বঙ্গবাসী কলেজের

..াপক ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়কে পরামর্শ করিবার জন্য ডাকাইয়াছিলাম। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ও বেশ কীর্ত্তন গাহিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন ডাক বিভাগের শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ এবং আরও তিনটী ভদ্রলোককে আনাইয়াছিলাম। একদিন রাত্রিতে ঐ সকল ভদ্রলোকের সম্মুখে আমার আলমারী হইতে বই ছুড়িয়া ফেলা হইতেছিল। আমি তখন একটী মশারি খাটাইয়া তাহার মধ্যে বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে রাখিলাম। কিন্তু মশারি না ছিঁড়িয়া বা না উঠাইয়া, বাহির হইতে মশারির মধ্যে এই বই পড়িতে লাগিল। কোন শক্ত দ্রব্য অপর কোন শক্ত দ্রব্য ভেদ করিয়া যে যাইতে পারে, তাহাই উহাদিগকে দেখাইবার জন্য আমি মশারি খাটাইয়াছিলাম। ঘরের সমস্ত দরজা ও জানালা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে, অথচ সেই ঘরের দেওয়াল কি দরজা ভেদ করিয়া বাসন কি ছোট ছোট আসবাবাদি বাহিরে আসিতেছে, ইহা তাঁহারা সকলে দেখিয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর ঐ সকল ভদ্রলোকেরা বসিয়া কীর্ত্তন গাহিতে ছিলেন। যতক্ষণ গান হইতেছিল ততক্ষণ কোন গোলযোগ ঘটে নাই, কিন্তু গান থামিবামাত্র আবার গোলমাল আরম্ভ হইল। ইহাতে লালমোহন বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, এই ঘরে চণ্ডীপাঠ হউক। কিন্তু চণ্ডী কোথায় পাওয়া যাইবে? তখন ননীবাবু বলিলেন যে, তাঁহার বাড়ীতে চণ্ডী আছে, এবং উহা আনিবার জন্য ঘরের বাহিরে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার একপাটী জুতা নাই! এই কথা শুনিয়া, উপস্থিত সকল ভদ্রলোকেরা বাহিরে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের সকলেরই একপাটী করিয়া জুতা অদৃশ্য হইয়াছে! ননীবাবু শুধু পায়েই চণ্ডী আনিবার জন্য বাড়ী গেলেন। কিছুকাল ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহার চণ্ডী খুঁজিয়া পাইলেন না।

যাহাহোক আরও কতকগুলি কীর্ত্তন গান করিয়া তাঁহারা বাড়ী গেলেন; যাইবার সময় সকলেই বিশেষ আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া দেখিলেন যে, সকলের জুতাই দুইপাটী করিয়া রহিয়াছে।

অধ্যাপক ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার শ্বশুর (এক্ষণে পরলোকগত) ডাঃ হেমনাথ অধিকারীকে এই ভৌতিক ব্যাপারের বিষয় বলিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ক্যাম্বেল হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন, শেষে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক হন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জামাতা ননীগোপালের সহিত তাঁহার চাঁপাতলার বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন।

একদিন সকালে আটটার সময় তিনি আমার বাড়ীতে আসিলেন। এই ভৌতিক কাণ্ড দেখাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া আমি উপরের ঘরে গেলাম, অপর সকলে চলিয়া গেলেন। ক্রমে ঘরের মধ্যে কার্ণিস হইতে বৃষ্টির ধারার মত ডাউল পড়িতে লাগিল। তিনি দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন; কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ বাহির করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, ইহা যে ভৌতিক কাণ্ড তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপরে, ক্যাম্বেল হাসপাতালে কার্য্যভার গ্রহণের প্রথম অবস্থায়, তিনি যে ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়াছিলেন তাহাই বর্ণনা করিলেন। তিনি এই কাণ্ড দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন এবং পরবর্ত্তী ঘটনা জানিবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে একদিন আমি অধ্যাপক তুলসীদাস করের সহিত অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। মিত্র মহাশয় তিন ঘণ্টাকাল ধৈর্য্য ধরিয়া আমার সমস্ত কথা শুনিলেন; শেষে বলিলেন,—আপনা

ং, ংত এই কাহিনী আমি বেশ বিশ্বাস করি, অনেক পুস্তকে এইরূপ ধরণের অনেক ব্যাপার প্রকাশিত হইয়াছে। শেষে বলিলেন,—আমার মনে হয় কোন আত্মা আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিতে চাহিতেছে। কাজেই তাহার প্রতি কোনরূপ অসন্তোষের ও বিরক্তির ভাব না দেখাইয়া, তাহাকে জানাইয়া দিন যে, তাহার কোন সাহায্য আবশ্যক হইলে, আপনি তাহা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন।

যোগেন্দ্রবাবুর পরামর্শ মত আমি একদিন আমার উপরের ঘরে একখানি কালবোর্ডে একখানা চক্‌পেন্সিল বান্ধিয়া রাখিলাম এবং সেই অদৃশ্য শক্তিকে উদ্দেশ করিয়া তাহার নাম লিখিতে অনুরোধ করিলাম। সেই দিবস বিকালে টেবিলের উপর একটী বোতাম রাখিয়া বলিলাম,—যদি তুমি পুরুষমানুষের আত্মা হও তবে বোতামটী দক্ষিণ দিকে, এবং যদি স্ত্রীলোকের আত্মা হও তবে বামদিকে ফেলিবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বোতামটী বামদিকে গমন করায়, জানা গেল আত্মাটি স্ত্রীলোকের। তারপর বলিলাম,—তুমি যদি কোন আত্মীয়ের আত্মা হও তবে এই ডিবেটী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ফেল। আর যদি আত্মীয় বা স্বজাতির আত্মা না হও, তবে উহা অন্য দিকে নিক্ষেপ কর। ডিবেটী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গমন করায় জানিলাম যে, উহা আমার কোন আত্মীয়ের আত্মা। এই পরীক্ষা আমার বাড়ীর লোকদিগের দ্বারাই হইতেছিল। এইরূপ সুফল পাইয়া আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইল। তখন অলৌকিক কিছু ঘটিতে পারে এইরূপ আশা করিয়া, আমরা উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় উপাসনা ও গৃহদেবতার নৈবেদ্যের মত—অপরিচিত আত্মার উদ্দেশে—পক্কান্ন নিবেদন যথারীতি চলিতে লাগিল। পার্থক্যের মধ্যে দেবতার নৈবেদ্য

অস্পৃষ্ট থাকে, আর আমাদের দেওয়া ভোগ আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সত্যসত্যই গ্রহণ করিতেন। কোন মানুষ বা ইন্দুর বেড়াল যে ইহা অপহরণ করিতে পারিত না ইহা ঠিক। কখন কখন এই ভোগ দেওয়া মাত্রই গৃহীত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, আত্মার অত্যাচারে আমাদের বা বাড়ীর ছেলেপিলেদের মনে বিন্দুমাত্রও ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। ঝড় বৃষ্টি বজ্র ও বিদ্যুতের মত একটা নৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া তাহারা মনে করিতেছে, তাহাদের ভাব দেখিয়া ইহাই মনে হইত। আমি কিন্তু অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইলাম। জনৈক বন্ধু বলিলেন যে, আত্মাকর্ত্তৃক পরিচালিত কোন ব্যক্তি আমাদের অজ্ঞাতসারেও এরূপ কার্য্য করিতে পারে। কাজেই বাড়ীর কেহ ইহা করে কিনা জানিবার জন্য আমি খড়ি দিয়া মেজের উপর মস্ত এক বৃত্ত আঁকিয়া, বাড়ীর সবাইকে তাহার মধ্যে বসাইয়া রাখিলাম, বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলাম; কিন্তু দেখিলাম ব্যাপার যেমন ঘটিতেছিল তেমনি ঘটিতেছে। সকালে উঠিয়াই আমার প্রথম কাজ হইল—কালবোর্ডে কিছু লেখা আছে কিনা দেখা। একদিন উঠিয়া দেখি বোর্ডে খড়ি দিয়া পরিস্কার ভাবে লেখা আছে—আমি পারুল।

এই সমস্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে—অর্থাৎ ১৯২২ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে—নোয়াখালীতে আমার সাত বৎসরের একটি বোন্‌ঝি মারা যায়, তাহারই নাম 'পারুল'। সেইদিন সকালে কীর্ত্তনীয়া বিজয়বাবু (বিজয় ভট্টাচার্য্য) আসিয়া আমাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পারুল নামে আপনার কোন আত্মীয়া ছিলেন কি না? কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বরাত্রে একটি ছোট মেয়ে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলিল,—তোমরা সবাই জান্‌তে চাও—কে আমি? তবে শোন,—আমি পারুল। ইহা বলিয়াই সে অন্তর্হিত হইল। তখন বিজয়বাবুকে আমি

অন্নপূর্ণা

১৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

৬ই আষাঢ় ১৩৩০ সাল

[পৃঃ—৩৩০

লীলা

৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল

অমিয়

১৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

১১ই আষাঢ় ১৩৩০ সাল

[পৃঃ—৩৩১

কালবোর্ডে লেখার কথা বলিলাম। আমার মাতা পারুলের এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল ছাদ হইতে একখানা চিঠি আসিয়া আমাদের কাছে পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল,—আমার জন্য কাঁদিও না, আমি এ জগতে সুখে আছি। তখন ছাদের দিকে চাহিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—যদি তুমি পারুল হও, তবে এরূপ ভাবে আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছ কেন? সম্মুখে আসিয়া দেখা দাও না কেন? আর কলিকাতা বিশেষতঃ এ বাড়ীই বা চিনিলে কেমন করে? কিছুক্ষণের মধ্যেই আর একখানা চিঠি ছাদ হইতে পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল,—মৃত্যুর পরেও যে আমি তোমাদের কাছে আসিয়াছি, এটা যাহাতে তোমরা ভুলিয়া না যাও, এজন্য তোমাদের স্মৃতিপটে এ সম্বন্ধে একটা গভীর রেখাপাত করিবার জন্যই এসব কীর্ত্তি করিয়াছি। ভবিষ্যতে এই সমস্ত ঘটনা স্মরণ করে, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর তোমাদের মনে কোন সন্দেহের উদয় হইবে না। কলিকাতা আসিয়া বাড়ী খুঁজিয়া লইতে আমার কোন কষ্টই হয় নাই।

প্রশ্ন। বাঁচিয়া থাকিতে তুমি তো বেশী লেখাপড়া জানিতে না, এখন এরূপ ভাবে লিখিতে কি করিয়া শিখিলে?

উ। এই নূতন জগতে আসিয়া ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছি।

প্রশ্ন। আমার যে সকল উচ্চশিক্ষিত আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহারা কেন আমাদের কাছে আসেন না বা চিঠি লেখেন না?

উ। যেহেতু তাঁহারা সে শক্তি অর্জ্জন করেন নাই। সেইজন্য এখানে সকলেই চিঠি লিখিতে বা সংবাদ আদান প্রদান করিতে পারেন না। আমি এসম্বন্ধে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছি।

আমার মাতাঠাকুরাণী পারুলকে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার লিখিত উত্তরও পাইলেন। লেখাটা রঙ্গিন পেন্সিলে। একটা পেন্সিল শেষ হইয়া গেলে উহা ছাদ হইতে পড়িয়া যাইত, এবং তখন আর একটা পেন্সিল দিতে হইত। সন্ধ্যার সময় পারুলের আত্মার জন্য একটা রবারের পুতুল কিনিয়া আনিলাম। পুতুলটী টিপিলে বাজিত। ঘরের যে অংশে লক্ষ্মীর আসন ছিল, পুতুলটী সেইখানে রাখিয়া, আমি পারুলের আত্মাকে পুতুলটী লইতে বলিলাম। তখনই পুতুলটী অন্তর্হিত হইল, কিন্তু একটু পরে আবার উহা ছাদ হইতে পড়িয়া গেল। পুতুলটী তুলিয়া লইলাম এবং পারুলকে আমার উপহার স্বরূপ উহা লইতে বলিলাম। এবার পুতুলটী বাজিতে বাজিতে আবার ছাদে উঠিল। তবে কে বাজাইতেছে তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম না। একটু পরে পুতুলটি আবার পড়িয়া গেল, আর সেই সঙ্গে একখানা চিঠিও পাইলাম; তাহাতে লেখা ছিল,—আমি এ পুতুল লইয়া কি করিব? লীলাকে দিন্, সে বাজাবে। লীলা আমার ছোট মেয়ে। পরিচয় দেওয়ার পরেই পারুলের আত্মা তাহার পিণ্ড দিতে বলিয়াছিল। বোর্ডে লিখিয়াছিল,—আমার পিণ্ড দাও। পরলোকগত কুঞ্জমোহন দাশগুপ্ত তখন গয়ার জেলদারোগা ছিলেন; তিনি আমার আত্মীয়। মৃত্যুর সন তারিখ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় জানাইয়া, একটা পাণ্ডা ডাকিয়া মেয়েটীর পিণ্ড দিতে লিখিলাম। মৃত্যুর পর এক বৎসর গত না হইলে পিণ্ড দেওয়া যায় না বলিয়া টাকা ফেরত আসিল।

একদিন বোর্ডে ও দেওয়ালের গায়ে লেখা দেখিলাম,—সম্মুখে বিষম বিপদ, শীঘ্র বাড়ী যান্। ইহাতে ভীত হইয়া পারুলের আত্মাকে অনেক প্রশ্ন করিলাম; উত্তর হইল,—খুব তাড়াতাড়ি

যাইবার দরকার নাই, আর বাড়ীও ছাড়িতে হইবে না; বিপদকে ভয় করিবেন না। তাহার এই কথায় আমাব উৎকণ্ঠা কিছু কমিল। এ সব সংবাদ ছাদ হইতে পড়া চিঠিতে লেখাছিল।

কালীপূজাব দিন আমাব মেয়েদের পবিচিত একটী সুশ্রী ছোট মেয়ে লাল নীল দেশলাই ও কিছু বাজী তাহাদিগকে দেয়। ইহার কয়েক দিন পবে পারুলের বাপ একদিন আমাদের বাসায় আসিলেন এবং কথায় কথায় বলিলেন যে, কালীপূজার দিন সন্ধ্যার সময় তিনি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বেড়াইতে যাইতে ছিলেন, সেই সময় সাড়ী-পরা একটী সুন্দর মেয়ে বলিল,—বাবা, বাজী কিনিতে পয়সা দাও। ঠিক তাঁহার মেয়ে পারুলের মত মেয়েটীব চেহারা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন, এবং তখনি তাহাকে পয়সা দিলেন। পয়সা পাইয়াই বালিকাটী দ্রুতপদে কোথায় চলিয়া গেল।

কি আশ্চর্য্য! সেই দিন সন্ধ্যাব সময়ই আমার মেয়েরা বাজী পাইয়াছিল। পারুলেব আত্মার বিশেষ অনুরোধে তাহার সম্বন্ধে কোন কথা আমি তাহার বাপকে—আমাদের সহিত কিছু দিন থাকা সত্ত্বেও—বলি নাই, কিম্বা তাহাদের বাড়ীতেও কোন চিঠিপত্র লিখি নাই।

পারুলের আত্মাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—সে ভৌতিক-দেহ ধারণ কবিতে পাবে কি না? সে তখনি উত্তর দিল যে, সে বালিকা হইযা প্রত্যহ আমাদেব বাডীতে আসে, এবং আমার মেয়েদের সঙ্গে খেলা করে। কিন্তু চেষ্টা করিয়াও আমি তাহাকে কোন দিন দেখিতে পাই নাই, তবে আমার মেয়েরা রোজই তাহাকে দেখিয়াছে।

তাহারই কথামত ঢাকা জিলার জয়দেবপুরে আমি আমার পরিবারবর্গ লইয়া যাই। রেলগাড়ীতে আমার মেয়েরা পারুলের মূর্ত্তি স্ত্রীলোকদের মধ্যে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। বাড়ীতে

থাকিতে, তাঁহার কাছে পরলোকের এবং আমাদের মৃত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের অনেক খবর পাইয়াছিলাম। আমার মেজ মেয়ে বলিত যে, পারুলের আত্মা যাহা বলে, সে তাহা স্পষ্ট শুনিতে পায়। আমি কিন্তু চেষ্টা করিয়াও কিছু শুনিতে পাই নাই। পরে আমার মেজ মেয়েকে মিডিয়ম (Medium) করিয়া তাহার মুখে পারুলের কথা শুনিতে পাইতাম।

আমরা যখন কলিকাতায় ভৌতিক কাণ্ড লইয়া পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত, সেই সময় নোয়াখালীতে পারুলের মাতার মৃত্যু হয়। কিন্তু আমার মাতার নিকট এই মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল। জয়দেবপুরে যাইয়া মাতাঠাকুরাণী এই সংবাদ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পারুলের আত্মা সেই সময় শূন্যভরে একখানি চিঠি পাঠাইল। তাহাতে লেখা ছিল,—আপনি কাঁদিবেন না, আপনার কন্যার আত্মা এখানে আছেন। আমার মা বলিলেন,—আমাকে ইহার প্রমাণ দাও, আর আমার মেয়েকে বল আমাকে পত্র লিখিতে। পারুলের আত্মা লিখিল,—বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি পত্র লিখিতে পারেন না, কিন্তু শীঘ্রই পত্র লিখিবার মত শক্তি তিনি লাভ করিবেন। ইহাই বলিয়া সে একগাছি পোড়া হাতের 'লোহা' ফেলিয়া দিল, এবং লিখিল যে, নোয়াখালী শশ্মানভূমি হইতে—যেখানে তাহার মাতার মৃতদেহ চিতায় দগ্ধ করা হইয়াছিল—এই 'লোহা' আনিয়াছে। এই 'হাতের লোহা' দেখিয়া মা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এই আত্মা—তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ—তাহাদিগের একান্নভুক্ত পরিবারের—যেখানে সে কয়েক বৎসর মাত্র কাটাইয়াছিল—যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচয় দিয়াছিল, তাহা পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ দিতে পারে না।

একদিন আমি পারুলের আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি যেমন ভাবে আমাদের প্রদত্ত মিষ্টান্ন আহার করিয়া থাক, অপর আত্মারা কি সেইরূপ পারে? সে বলিল,—হাঁ পারে। তখন আমি বলিলাম,—আমার ইচ্ছা পরলোকগত কয়েকটী আত্মাকে আনাইয়া একদিন আহার করাইব। সে বলিল,—কেবল সাতটী আত্মার জন্য যোগাড় কর, আমি তাহাদিগকে আনাইয়া আহার করাইব।

ইহাই সাব্যস্ত করিয়া আমি আমার ভ্রাতৃবধুকে লুচি, কপির ডালনা, বেগুন ভাজা ও ভাল সন্দেশ প্রস্তুত করিতে বলিলাম। ইহা প্রস্তুত হইলে, সাতখানি কলাপাতায় উহা সাজান হইল, সাতটী ঝুড়ি দিয়া উহা ঢাকিলাম এবং ঝুড়িগুলির উপর একখানি খদ্দরের চাদর দিলাম। তখন সেখানে বসিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত পাহারা দিতে লাগিলাম,—একবারও সে স্থান ত্যাগ করিলাম না।

এমন সময় আমার ছোট্ট মেয়ে আসিয়া বলিল যে, নিমন্ত্রিত আত্মারা সকলে আসিয়াছেন। আমি তখন আরও সতর্কতার সহিত পাহারা দিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে পারুলের আত্মা জানাইল যে, আত্মারা আহারান্তে—পাতে কিছু কিছু প্রসাদ রাখিয়া—চলিয়া গিয়াছে। আমরা তখন ঢাকা খুলিয়া দেখিলাম, প্রকৃতই প্রত্যেক পাতে ২।১ খানা করিয়া লুচি ও কিছু সন্দেশ রহিয়াছে। তখন আমাদিগের মনের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইহার পরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৭ই তারিখে আমার কনিষ্ঠা কন্যা লীলা, ৬ই আষাঢ়ে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণা, এবং ১১ই আষাঢ়ে আমার মধ্যমা কন্যা অমিয়ার মৃত্যু হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, পারুলের আত্মার ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট

মৃত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিচয়ের উপায়

নানাপ্রকার অনুসন্ধানের ফলে, পরলোকগত ব্যক্তির আত্মা। আমাদের কথাবার্ত্তার ও ভাবের আদান প্রদানের অনেক গুলি উ বাহির হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটী নিম্নে লিখিতেছি।

(ক) টক্‌টক্‌ শব্দদ্বারা (by rappings)। আমেরিকার ভগিনীরা অদৃশ্য শক্তির সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য প্রথমে এই উ অবলম্বন করেন। স্থির হয় যে, তাঁহারা যে প্রশ্ন করিবেন তাহার উত্তর যদি "না" হয় তবে একটী, যদি "হাঁ" হয় তবে তিনটী, এবং যদি "হাঁ" কিম্বা "না" কিছুই না হয় তাহা হইলে দুইটী টোকা পড়িবে।

এই সঙ্কেত দ্বারা সমস্ত কথার ও ভাবের আদান প্রদান হয় না দেখিয়া, ক্রমে লেখা একটী উপায় বাহির করা হইল। মনে করুন কাহারও নাম জানিতে হইবে। প্রশ্নকর্ত্তা প্রথমে নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার পর ইংরেজি বর্ণমালার অক্ষরগুলি (অর্থাৎ এ বি সি) ধীরে ধীরে পর পর উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 'সি' অক্ষর উচ্চারিত হইবামাত্র টক্‌ করিয়া শব্দ হইল। অমনি এক খানি কাগজে 'সি' লেখা হইল। তারপর পুনরায় প্রথম হইতে বর্ণমালা উচ্চারণ করা হইতে লাগিল। সেবার 'এইচ' বলিবামাত্র টোক্কার শব্দ হইল, এবং 'এইচ' অক্ষরটি 'সি' অক্ষরের পরে কাগজে লেখা হইল। এই প্রকারে— সি, এইচ, এ, আর, এল, ই, এস,—অক্ষরগুলি পর পর পাওয়া গেল ও কাগজে লেখা হইল, এবং এইগুলি একত্র করিয়া 'চার্লস' (Charles)

একদি—য়া গেল। এই প্রকারে অনেক রকম কথাবার্ত্তা চলিতে যেমন ভা কিন্তু এইরূপ সঙ্কেত দ্বারা কথাবার্ত্তা বলিতে হইলে অনেক আত্মারা [illegible]শ্যক হইত। বিশেষতঃ যে সকল ভাষায় যুক্তাক্ষর আছে [illegible] এই উপায়ে কথাবার্ত্তা চলিতে পারে না। সেইজন্য ক্রমে [illegible] উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটী নিম্নে দিতেছি—

(খ) স্লেট বা কাগজে অদৃশ্য হস্তে লেখা। বিলাতের বিখ্যাত মিডিয়ম এগ্‌লিণ্টন ১৮৮১ সালে কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজ ও এদেশীয় লোকদিগের বাটীতে এই প্রকারে অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে অনেক [illegible] ঘটনা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রস্তুত [illegible] ভিন্ন অপর যে সকল উপায়ে মৃতব্যক্তির আত্মার সহিত [illegible]বার্ত্তা বা ভাবের আদান প্রদান চলিতে পারে, তাহাতে একজন [illegible]ধ্যবর্ত্তী লোকের আবশ্যক। এই মধ্যবর্ত্তী লোককে ইংরেজীতে মিডিয়ম [illegible]dium) বলে। মিডিয়ম হইবার শক্তি সকলের আছে কি না ঠিক [illegible] যায় না। তবে সকলের যে সমান শক্তি নাই তাহা প্রমাণিত [illegible]ছে। এরূপ দেখা গিয়াছে, বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও কে[illegible] শৈশবাবধি,—হয় ত জন্মাবধি—এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন [illegible]র কেহবা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। [illegible]হারও কাহারও মতে, যাহারা তুলারাশি ও শান্তপ্রকৃতির লোক বা [illegible]হাদিগের মনঃসংযম করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারাই ভাল মিডিয়ম হইতে পারেন, এবং তাহাদিগকে মৃতব্যক্তির আত্মা সহজে স্ববশে আনিতে সমর্থ হন। এইজন্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই মিডিয়মের সংখ্যা অধিক দেখা যায়।

মৃতব্যক্তির আত্মা মিডিয়মের সাহায্যে কি কি উপায়ে আমাদের [illegible] আলাপাদি করিতে পারেন, তাহা লিখিতেছি—

(গ) প্লানচেটে লেখা (Planchette writing)। ... প্লানচেট তৈয়ারি হয়। ইহা দেখিতে পানের মত। ইহার একদিকে দুইখানি ছোট চাকা এবং অপর দিকে এরূপ ... আছে, যাহার ভিতর কাঠের একটী লেড-পেন্সিল শক্ত ও সম... ...হইতে পারে। প্লানচেট সম্মুখে রাখিয়া এক বা দুই ব্যক্তি দুই ... অঙ্গুলির অগ্রভাগ ... মাত্র উহাতে স্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকিবেন। হাত দুইখানি আদপে নিজের বশে থাকিবে না—একেবারে অবশভাবে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেই হাতের উপর ভর ক... মৃতাত্মা প্লানচেটে লিখিয়া থাকেন। কেবলমাত্র হাতের উপর ... ভর হয় বলিয়া মিডিয়ম আবিষ্ট হন না।

(ঘ) স্বৈরলিপি (Autonatic writing)। চেষ্টা করি... প্লানচেটের সাহায্য না লইয়াও, হাত দিয়া আপনা আপনি লেখা বা... হইতে পারে। কাগজ বা শ্লেটের উপর হাত দিয়া পেন্সিল ধরি... নিশ্চেষ্টভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, হাত দিয়া ...র মত ... বাহির হইয়া ধীরে ... লেখক অনেক সময় বুঝিতে পারেন না ... কোন মৃত ব্যক্তির আত্মা, কিংবা কোন জীবিত ব্যক্তির অদৃশ্য ... অথবা তাঁহার নিজের অন্তরাত্মা,—ইহার মধ্যে কাহার দ্বারা লে... বাহির হইতেছে। কখন এরূপও হয় যে, কি লেখা হইতেছে তাহ... লেখা পাঠ করিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত লেখক জানিতে পারেন না। তবে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এরূপ অবস্থায় মৃতব্যক্তির আত্মা ইহলোকের কোন ব্যক্তির কেবলমাত্র হাতের উপর ভর করিয়া লিখিয়া থাকেন।

সুবিখ্যাত পরলোকতত্ত্বদর্শী ষ্টেড সাহেব তাঁহার সম্পা... বর্ডারল্যাণ্ড (Borderland) নামক সাময়িক পত্রে এই ...

আলোচনা বিশদভাবে করিয়াছেন। কি ভাবে তিনি প্রথমে ইহা লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং কোন্ কোন্ মুক্তাত্মা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের দ্বারা কি কি সংবাদ সংগ্রহ করেন, তাহা তিনি ইহাতে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মিস্ জুলিয়াসের আত্মা তাঁহার হাতের উপর ভর করিয়া যে সকল পারলৌকিক বিষয় লিখিয়াছেন, তাহাও এই সাময়িক পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কিন্তু ষ্টেড সাহেব যে সময় এই স্বৈরলিপি প্রকাশ করেন, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭৩ সালে) সুবিখ্যাত ইংরাজ স্পিরিচুয়ালিষ্ট ডব্লিউ ষ্টেন্‌টন্ মোজেজ (W. Stainton Moses M. A. Oxon) সাহেব এই ধরণের লেখা দ্বারা অনেক অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত Spirit Teaching নামক গ্রন্থখানি জগৎ প্রসিদ্ধ। ইহারও পূর্ব্বে—অর্থাৎ ১৮৬৫ সালে—আমাদের পারিবারিক চক্রে আমার পিতাঠাকুর স্বর্গীয় হেমন্তবাবুর হাত দিয়া এই প্রকার লেখা বাহির হইত। সে সময় তিনি যে কোন মুক্তাত্মা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহা আদপে বুঝা যাইত না। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীর একটী ছেলের হাত দিয়া এইরূপ লেখা বাহির হইত। তাহার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর, তখন হইতে তাহার দেহে এই শক্তি প্রকাশ পায়। তাহার হাত দিয়া এইরূপ লেখা বাহির হইবার এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও সে ইহা জানিতে পারিত না। সে ঘরে বসিয়া খাতায় অঙ্ক কসিতেছে কিম্বা অপর কিছু লিখিতেছে, হঠাৎ তাহার সেই লেখা বন্ধ হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল পরলোকের কথা লেখা চলিতে লাগিল। এই প্রকারে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার জানা গিয়াছে। এক্ষণে তাহার এই শক্তি অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে।

(ঙ) সাধারণ মিডিয়ম (Trance Medium)। এই শ্রেণীর

উপর আত্মার ভর হইলে, কেহ কেহ একেবারে অ-
ড়ন, আবার কাহারও কাহারও অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকে।
একেবারে জ্ঞানশূন্য হন, তাঁহাদের উপরই মুক্তাত্মা সম্পূর্ণরূপে আপন শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তবে সকল স্তরের আত্মা সকল রকম মিডিয়মের উপর ভর করেন না, কখন বা করিতে পারেনও না। যাঁহার উপর কোন আত্মা ভর করিবেন তাঁহারও সেইরূপ শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক, নচেৎ শক্তিশালী আত্মার ভর সকল মিডিয়মের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। সেইরূপ সর্ব্বনিম্নতর আত্মাও অধিক শক্তিশালী মিডিয়মের সংসর্গে আসিতে পারে না।

চক্রে কোন উচ্চস্তরের পবিত্র মুক্তাত্মার আবির্ভাব হইলে, অন্ধকার ঘরের মধ্যেও তাঁহার জ্যোতি ফুটিয়া উঠে এবং উপস্থিত সকলেরই মনে একটা আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়। আবার যে মিডিয়মের উপর তাঁহার ভর হয়, তাঁহার চেতনাশক্তি একেবারে লোপ পায়, চেহারার পরিবর্তন ঘটে, মুখশ্রী জ্যোতির্ম্ময় ও আনন্দপ্রদ হয়, এবং কণ্ঠস্বর হাবভাব এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, তখন মনে হয় মৃতব্যক্তি যেন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। মুক্তাত্মা চলিয়া যাইবামাত্র সেই সঙ্গে জ্যোতি ও আনন্দের ধারা সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া যায়। আবার নিম্নতরস্থ প্রেতাত্মার ভর হইলে, মিডিয়ম হাত পা ছুড়িয়া চীৎকার করিয়া কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিয়া, শেষে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন; তখন তাঁহার কষ্টের একশেষ হইতে থাকে।

(চ) দিব্যদৃষ্টি (Clairvoyance)। কেহ কেহ চক্ষু বুজিয়া পরলোক ও পরলোকবাসীদিগকে দেখিতে পান; কেহবা সেই সঙ্গে মৃতব্যক্তির আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ও ভাবের আদান প্রদান

করিতে পারেন। মেস্‌মেরাইজ করিলে অনেক সময় দিব্যদৃষ্টি লা
আবার কোন স্বচ্ছ বস্তু কালবর্ণের কাপড় কি কাগজের উপর
উজ্জ্বল আলোতে সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে, ক্রমে
প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম প্রথম একদৃষ্টে অধিকক্ষণ চাহিয়া
যায় না, চোখ জলে ভরিয়া যায়। অভ্যাস করিলে ক্রমে এই সময়ের
পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই প্রকারে দিব্যদৃষ্টির ক্ষমতা লাভ হয়।
মেস্‌মেরাইজের অথবা স্বচ্ছপদার্থের সাহায্য ব্যতীতও কেহ কেহ
দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, ইহাও দেখা গিয়াছে। এইরূপ দুইটী
উদয়ের কথা প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

(ছ) আরোগ্যকারী মিডিয়ম (Healing Medium)। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন ভাল আত্মা কোন মিডিয়মের উপর ভর করিয়া এবং তাঁহার সাহায্যে কোন রোগীকে মেস্‌মেরাইজ করিয়া আরোগ্য করেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ও মতিলাল এইরূপ আরোগ্যকারী মিডিয়ম ছিলেন। তাঁহাদের কথা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

কখন কখন এরূপও দেখা যায় যে, কোন ভাল আত্মা ... উপর ভর করেন এবং তাঁহার দ্বারা ঔষধ বা মাদুলী প্র... রোগীকে ব্যাধিমুক্ত করেন। আবার এরূপও ঘটিয়াছে যে, ... শ্রেণীর প্রেতাত্মা ইহজগতের কোন ব্যক্তির অনিষ্ট ক... করিতেছে এবং হয়ত কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছে। ... ব্যক্তির পরলোকগত আত্মীয়ের আত্মা কিংবা অপর কোন ... জানিতে পারিয়া, সেই প্রেতযোনি-প্রাপ্ত আত্মাকে ... তাহার কবল হইতে সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে সমর্থ ... এইরূপ ঘটনাও প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

আবার চিকিৎসক, সাধুসন্ন্যাসী বা অপর কোন ব্যক্তি

...রিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়াছেন, ইহাও দেখা গিয়াছে। আর দেশে রোগীকে ঝাড়িয়া, জলপড়া খাওয়াইয়া কিম্বা তাহার গাত্রে ঐ জল নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ব্যাধিমুক্ত করিতে দেখা যায়।

(জ) আত্মার জড়ীয় মূর্ত্তিধারণ (Materialization)। ...শ্রেণীর মিডিয়ম আছেন, যাঁহারা সিয়ান্সে বসিবামাত্র একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাদিগের দেহ হইতে একপ্রকার নরম পদার্থ নির্গত হয়, ইহাকে ইংরেজিতে এক্টোপ্লাজম্ (Ectoplasm) বলে। এই পদার্থ লইয়া আত্মারা মনুষ্যের বা অপর যে কোনরূপ আকৃতি ও পরণ-পরিচ্ছদ ধারণ করিতে সমর্থ হন। এই দেহধারী আত্মারা আপনাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে অল্প বা অধিকক্ষণ পার্থিব মনুষ্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ও করমর্দ্দনাদি পর্য্যন্ত করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতেরা এই সম্বন্ধে বহু পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের আলোচনার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সি রিচেট্ (C. Richet) এবং সুবিখ্যাত ইংরেজ রসায়ন-বিজ্ঞানবিৎ সার উইলিয়ম ক্রুক্সের (Sir William Crookes) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রুক্স সাহেব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এতৎ সম্বন্ধে গবেষণা দ্বারা ও যন্ত্রাদির সাহায্যে এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যে অসাধারণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, তাহা সার আর্থার কোনান ডয়েল (Sir Arthur Conan Doyle) তাঁহার History of Spiritualism নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে চিত্রের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। ফরাসী বৈজ্ঞানিক রিচেট সাহেব লিখিত গ্রন্থের নাম Thirty Years of Psychical Research. এই দুইখানি গ্রন্থ অতি উপাদেয়।